একাদশ বর্ষ

৪০তম সংখ্যা
১৭শ ইন্টারনেট
সংখ্যা

জয়ঢাক ৪০

সূচিপত্র

	বিষয়	লেখা		লেখক	ছবি/গ্রাফিক্স
১	মলাট				দেবজ্যোতি
২	জয়ঢাকের দলবল				দেবজ্যোতি
৩	আমাদের কথা				দেবজ্যোতি
৪	সম্পাদকীয়	জয়ঢাকি বোল		দেবজ্যোতি	দেবজ্যোতি
৫	কমিক্স	রোজনামচা		মৌসুমী	মৌসুমী
		বরলাভ		অমৃতা রায় (দাস)	অমৃতা রায় (দাস)
		(ক)	বড়মামার টমটম গাড়ি	তরুণ সরখেল	সোমা
৬	গল্প	(খ)	ডাব বাবা	সিদ্ধার্থ সিংহ	অনুপম
		(গ)	এক শালিক	আইভি চ্যাটার্জি	সোমা
		(ঘ)	গ্রাফিনের কেরামতি	জি সি ভট্টাচার্য	সৌভিক
		(ঙ)	ইকিতানি	রতনতনু ঘাটী	মুকুট
		(চ)	হোয়েন আই ওয়জ ডেড	ভিনসেন্ট ও সুলিভ্যান (অনুঃ অমিত দেবনাথ)	সংগৃহীত
		(ছ)	পিঁপড়ে	রানা জামান	সংগৃহীত
৭	ভ্রমণ	ঈশ্বরের নিজের দেশে		ড: পি বি গঙ্গোপাধ্যায়	সংগৃহীত
৮	বিচিত্র দুনিয়া	বেশি খেয়োনা, পেট ফেটে যাবে		অরিন্দম দেবনাথ	সংগৃহীত
৯	বৈজ্ঞানিকের দপ্তর	(ক)	অংকের বিচিত্র জগত	বৈজ্ঞানিক	দেবজ্যোতি
		(খ)	ভারতের বৈজ্ঞানিক	টুপুর	সংগৃহীত
		(গ)	বিচিত্র জীবজগত	বৈজ্ঞানিক	সংগৃহীত
		(ঘ)	টেকনো টুকটাক	বৈজ্ঞানিক	সংগৃহীত
১০	ভারতের বনাঞ্চল		বান্দিপুরা	সংহিতা	সংগৃহীত
১১	ছড়া	(ক)	বন্ধু	আশুতোষ ভট্টাচার্য	সোমা
		(খ)	সুয্যিমামার অনেক নাম	অঞ্জন আচার্য	সংগৃহীত
		(গ)	ফাল্গুনের ছড়া	শেখর রায়	সোমা
		(ঘ)	সে	অচিন্ত্য সুরাল	সংগৃহীত
		(ঙ)	চোর পুলিশ	জ্যোতির্ময় দালাল	অনুপম
		(চ)	খামখেয়ালি রাজা	অমিতাভ প্রামাণিক	সৌভিক
		(ছ)	কোয়েশ্চেন ব্যাংক	বৈষ্ণবী	মুকুট
১২	দেশ ও মানুষ	বীর ছেলের গল্প		উমা ভট্টাচার্য	সংগৃহীত
১৩	ধাঁধা,মজা,রহস্য	(ক)	ধাঁধা	ইন্দ্রশেখর	মৌসুমী
		(খ)	কুইজ	ইন্দ্রশেখর	সংগৃহীত
		(গ)	জানো কি	ইন্দ্রশেখর	সংগৃহীত
		(ঘ)	ড্রুড্‌ল	ইন্দ্রশেখর	সংগৃহীত
		(ঙ)	কীসের ফটো	ইন্দ্রশেখর	দেবজ্যোতি
		(চ)	অবিশ্বাস্য	ইন্দ্রশেখর	সংগৃহীত
		(ছ)	মজার ইন্টারনেট	ইন্দ্রশেখর	সংগৃহীত
		(জ)	হযবরল	ইন্দ্রশেখর	দেবজ্যোতি

		(ঝ)	গত সংখ্যার উত্তর	ইন্দ্রশেখর	দেবজ্যোতি
১৪	ধারাবাহিক উপন্যাস	বগাচি জাতির সন্ধানে		শৌনক হালদার	মৌসুমী
১৫	কাতুকুতু	(ক)	পাগলের পাল্লায়	সংগৃহীত	ইন্দ্রশেখর
		(খ)	হাজির জবাব	সংগৃহীত	
১৬	লিখিব খেলিব আঁকিব সুখে	(ক)	ভোরের পরে সকাল	অরণ্য,পূর্ণিমা,মুকুট	
		(ঙ)	গ্যালারি	সমাদৃতা,রুপসু,বউল,তান	
১৭	পুরাণ কথা	মহোৎকট কথা		সংহিতা	মৌসুমী
১৮	রাশিয়ান গল্প	চাষার বুদ্ধি		মলডোভার লোককথা	সংগৃহীত
১৯	পুরাতনী	নেকড়ের গল্প		যোগীন্দ্রনাথ সরকার	সংগৃহীত
২০	সেই আয়না			সুজয় রায়	মৌসুমী
২১	স্মরণীয় যাঁরা	কৃত্রিম রঙের জনক উইলিয়াম পার্কিন		অমিতাভ প্রামাণিক	সংগৃহীত
২২	সুরঢাক	এসো গান শুনি		প্রদীপ মুখোপাধ্যায়	লেখক
২৩	খেলার রাজা পর্বতারোহণ	এভারেস্ট		এরিক শিপটন। অনুঃবাসব চট্টোপাধ্যায়	সংগৃহীত
২৪	টাইম মেশিন	ঠগীর আত্মকথা		অলবিরুণী	মৌসুমী
২৫	বই পড়া	ভৌতিক র‍্যাগিং		মহাশ্বেতা	সংগৃহীত
২৬	লোককথা	মানুষ কীভাবে এল		মহাশ্বেতা	মৌসুমী
২৭	ট্রেকিং	হিমালয়ের হিমবাহ পরিচিতি ও ট্রেকিং রুট		রাজকুমার রায়চৌধুরী	সংগৃহীত
২৮	বিশ্বের জানালা	সুইডেন		উমা ভট্টাচার্য	সংগৃহীত
২৯	সেই মেয়েরা	সেলমা লেগারলফ		উমা ভট্টাচার্য	সংগৃহীত

জয়ঢাকের এই সংখ্যার দলবল

অক্ষরবিন্যাসে

ফটোগ্রাফার উমাদি

ওয়েবকবি সংহিতা

কবি-পাহাড়ু শান্তনু

তুলিতে, মাউসে, ক্যামেরায়

দ্য হিন্দু-র সৌভিক,

হাজারো কাজের ব্যস্ততার মধ্যেও সময় বের করে তোমাদের জন্য কি বোর্ডে, মাউসে,তুলিতে কি ক্যামেরায়, লেখা কম্পোজ করে, ছবি গড়ে জয়ঢাককে সাজিয়ে তুলেছেন এই বন্ধুরা।

সরকারী কর্মী মৌসুমী

রিজার্ভ ব্যাংকের সোমা, ৫

শিল্পী-এঞ্জিনিয়ার অনুপম

জয়ঢাকের কাজ করতে এগিয়ে এসেছে ইশকুলপড়ুয়ারাও। অক্ষরবিন্যাসে, বুক রিভিউতে এবং ছবি আঁকায়। এইখানে তাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলাম–

মহুল
অক্ষরবিন্যাস

মহাশ্বেতা
শিক্ষানবীশ সমপাদক:
পুরাতনী, বুক রিভিউ
ও স্মরণীয় যাঁরা বিভাগ

মুকুট
ছবি আঁকা

আমাদের কথা

আজ থেকে অনেককাল আগে শুকতারা পত্রিকার শক্তিমান হিরো বাঁটুল দি গ্রেট মাঝে মাঝে হাঙরের রোস্ট দিয়ে ব্রেকফাস্ট করতে করতে একটা খবরের কাগজ পড়ত। তার নাম দৈনিক জয়ঢাক। একবার স্কুলপড়ুয়া তিন বন্ধু মিলে একটা পোস্টকার্ডে শুকতারা দফতরে এই মর্মে চিঠি পাঠিয়েছিলো যে দৈনিক জয়ঢাক পত্রিকার সদস্য হতে চায় তারা। 'পয়সা লাগিলে বাবা দিয়া দেবে।' ডাকবাক্সে চিঠি ফেলে প্রায় ছ'টি মাস অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করবার পরও যখন তার কোনও জবাব পাওয়া গেল না, তখন কাগজওয়ালাদের ওপর রাগ করে তিনজন মিলে ঠিক করল, না পাঠালো তো বয়েই গেল। তারা নিজেরাই তৈরি করে নেবে জয়ঢাক কাগজ।

সেই ঘটনার পঁচিশ বছর পরে ২০০০ সালের ডিসেম্বর মাসে সেই তিন বন্ধু কলেজ স্ট্রিট থেকে ছেপে বের করল জয়ঢাক পত্রিকার প্রথম সংখ্যা। তারপর থেকে এই ত্রৈমাসিক পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে চলেছে। ইন্টারনেট সংস্করণ বের হতে শুরু করল ২০০৮-এর মার্চ থেকে।

কিছুকাল আগে জয়ঢাকের এক বন্ধু হঠাৎ এক বিচিত্র হিসেব নিয়ে এলেন দফতরে। তাতে দেখা যাচ্ছে এক ফুট চওড়া ও চল্লিশ ফুট উঁচু একটা গোটা গাছ দিয়ে যতটা কাগজ তৈরি হয় ততটা কাগজ লাগছে জয়ঢাকের একটা সংখ্যা ছেপে বের করতে। তিনি প্রশ্ন করলেন সাহিত্যসেবা করবার জন্য প্রতি তিন মাসে একটা করে স্বাস্থ্যবান , পুরোন গাছকে মারাটা কি জয়ঢাকিদের উচিৎ হচ্ছে? সেই শুনে ইস্তক এই মুহূর্তে শুধুমাত্র আন্তর্জাল সংস্করণেই বের হচ্ছে জয়ঢাক পত্রিকা। ছাপার বই বেরোন বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

দুটো প্রধান উদদেশ্য নিয়ে কাজ করে এই পত্রিকা। নির্ভেজাল আনন্দ দেবার পাশাপাশি নিজের দেশ ও সংস্কৃতির সঙ্গে কিশোর পাঠকদের গভীর যোগাযোগ ঘটিয়ে দেয়া, আর অন্যদিকে সারা দুনিয়ার নানা আকর্ষণীয় খবর তাদের কাছে এনে হাজির করা। যে শিক্ষা প্রথাগত স্কুলের সিলেবাসে মিলবে না অথচ বড় হয়ে ওঠবার পথে নিতান্তই প্রয়োজন, আনন্দের পাশাপাশি সেই শিক্ষার স্বাদটিও স্কুলপড়ুয়াদের কাছে পৌঁছে দেবার কাজটা সাধ্যমত করছে জয়ঢাক।

কিছু প্রয়োজনীয় তথ্যঃ

সমপাদকমণ্ডলী: দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য , বাসব চট্টোপাধ্যায় (অ: জা:), পার্থ চট্টোপাধ্যায় (পু:নি:)
অলংকরণ নির্দেশনা: মৌসুমী রায়
আন্তর্জাল নির্দেশনা: রোহন কুদদুস।
ডাকযোগাযোগ: জয়ঢাক, প্রযত্নে সুচেতনা প্রকাশন,
১৬এ টেমার লেন। কলিকাতা-৯
মেইল যোগাযোগঃ joydhak@gmail.com

জয়ঢাকি বোল

।১।

বুড়ো জয়ঢাকি দাদা রাত বারোটায়
লেপমুড়ি দিয়ে সুখে অঘোরে ঘুমায়
পুতুলের ঘরে শুনে ধাঁইধুপ রব
জেগে উঠে দাদা ভাবে চোরে নিল সব!

তাড়াতাড়ি চশমাটি এঁটে নাসিকায়
হ্যারিকেন নিয়ে দাদা খেলাঘরে যায়।
গিয়ে দেখে খেলাধুলো জমে গেছে বেশ
পুতুলের ঘর জুড়ে ' অ্যানিম্যাল রেস'

।২।

সারি বেঁধে দাঁড়িয়েছে বাঘ, হাতি,উট,
পিঠে বসে চিনেম্যান, শুরু হবে ছুট।
চিৎকার চেঁচামেচি কান পাতা দায়
দাদা গিয়ে টোকা যেই দেয়া দরজায়
অমনি সবাই চুপ, পুতুলের তাকে
যে যেখানে ছিলো সব স্থির হয়ে থাকে

দেখেশুনে দাদা যেই খিল দিলো দোরে,
ফের খেলা শুরু হলো ধাঁইধুপ করে
দেখেশুনে দাদা শেষে ফন্দি পাকায়
ল্যাপটপ হাতে নিয়ে খেলাঘরে যায়
হাতে ধরা মাউসের একটি খোঁচায়
নেমে এলো ‘জয়ঢাক’ ছোট পর্দায়

গল্প কবিতা ধাঁধা, কতশত ছবি
যা যা তুমি ভালোবাস পাবে তার সবই।
খেলাঘরে থেমে গেল সব কোলাহল
জয়ঢাক পড়ে বসে পুতুলের দল।
এইভাবে মহাসুখে রাত কেটে যায়,
বিছানায় শুয়ে দাদা আরামে ঘুমায়।

ওদের সাথে তোমাদেরও হাতে তুলে দিলাম বসন্তের জয়ঢাক। ভালো থেকো সবাই।

ভালোবাসায়,
তোমাদের জয়ঢাকি দাদারা।

লেখা, ফটোগ্রাফি ও গ্রাফিক্সঃ দেবজ্যোতি

ছবিঃ মৌসুমী

ওহ্‌ রবিবার!
১
স্কুলে যাবো না উঁ উঁ...
সোমবার
২
কথা বোলো না গর্‌র্‌র্‌...
মঙ্গলবার
৩
আর সইতে পারছি না, ও মা !!
বুধবার
৪
হিন্দী ম্যাডাম
অংক স্যর.
বোধহয় মরে গেছি
বৃহস্পতিবার
৫
না: বেঁচে আছি
শুক্রবার
৬
শনিবার
৭
(ফের ১ নং ছবি থেকে দেখো)

বরলাভ

অমৃতা রায়(দাস)

বলি, খালি হাতে ঘরে ফিরছ কেন? ঘরে দানাপানি নেই, কী খাব? হাওয়া?
রাগ কোর না বউ। পোড়া কপাল আমার! আজ একটাও কাঠ পেলাম না। কী আর করি! যাই, চান করে একটু জিরিয়ে নিই। তুমি বরং ঘুমিয়ে পড়ো গে।
হ্যাঁ। তুমি বলো আর আমি ধেই ধেই করে নাচি। ক্ষিধেয় পেটে আগুন জ্বলছে আর উনি বলছেন, ঘুমিয়ে পড়ো!

ক্ষিধের আগুন কমাতে হলে আগে মাথার আগুন কমাও। আর তাতেও না হলে এক ঘটি জল খেয়ে নাও।
তবে আর কী? মিটে গেল ঝামেলা!। ওঃ, ভগবান, তোমার চোখ কি কানা?
ভগবানকে গালি দিও না বউ। তাঁর দয়া হলে তিনি তোমাকে রানিও করে দিতে পারেন।
নতুন করে আর কি রানি করবে? করেছে তো কাঠকুড়াণি।

তামাশা করছো? পুরাণে পড়োনি দেবতার বরে কত লোক রাজা হয়েছে?
ওসব কথা বইতে থাকে। যদি ঠাকুর সত্যি থাকে তো আসুক, এসে বর দিক আমাদের!

একী! ঘরে এত আলো কেন? সর্বনাশ! তোমার কথায় দেবতা রাগ করলেন না তো?
ও মাগো! এবার কী হবে!!

অযথা ভয় পেয়োনা বৎস। আমি লক্ষ্মীদেবী। তোমরা বর চাইছিলে তাই আমি এসেছি। বলো কী বর চাই।
জয় মা
মাগো অপরাধ নিও না
মা, আমি কিছু জানি না। ও বউ তুমি বল না!
ওরে বাবা, আমি কী জানি? মা, আমিও কিছু জানি না।
বেশ, তবে আমি তোমাদের ভাবতে সময় দিলাম। ভেবে তিনটে বর চেয়ে নিও।

বাপরে!দেখলে!এই জন্যই বলি
দেবতা নিয়ে তামাসা কোরো না
হা হা,তবেই বলো আমার জন্যই
তো ফোকোটিয়াএ ৩টে বর পেলে
আবার তামাসা!বারণ করছি বৌ।
এখন ভাব কি বর চাওয়া যায়..
হুম,ঠিক তো।অনেক দিন মাছ
খাই না,মাছ পেলে ভাল হয়।

আরে,বোকা,মাছ খেতে চেয়ে শুধু শুধু একটা বর চলে গেল,এতো শখ তো মাথায় মাছের টুপি পরে থাকো।
না,মানে, আমি..
আরে একি হোলো!
আমায় বলছিলে?দেখ তোমার জন্য আর একটা বর চলে গেল

না,মানে আমি!
আরে,মানে ছাড়ো,এখন এই টুপি খোলো,ওফ্ আমি এটা খুলতে পারছি না
এ সেকি!দেখি দেখি ..
উফঃফঃফঃ....

আহা..ঁকাদো কেন বউ বরে
পাওয়া এ টুপি,মা লক্ষীর
দয়া ছাড়া খোলা যাবে না
ঁএ্যাঃ ঁহু ঁহু..
তবে,এখন কি হবে এঁ.এঁ
আর কি হবে?৩ নং বরটাও চেয়ে
নিই

হে মা লক্ষ্মী,আমার বউ-র মাথার টুপি খুলে দাও মা
খুলে দাও মা দয়া করো
বৎস!নিজেদের বোকামির জন্য তোমরা বরগুলি হারালে,তবু তোমাদের সরলতার জন্য বর দিলামতোমাদের কখনও খাবার অভাব হবে না
জয় মা লক্ষ্মী
মা তুমি মহান

বড়মামার টমটম গাড়ি

তরুণকুমার সরখেল

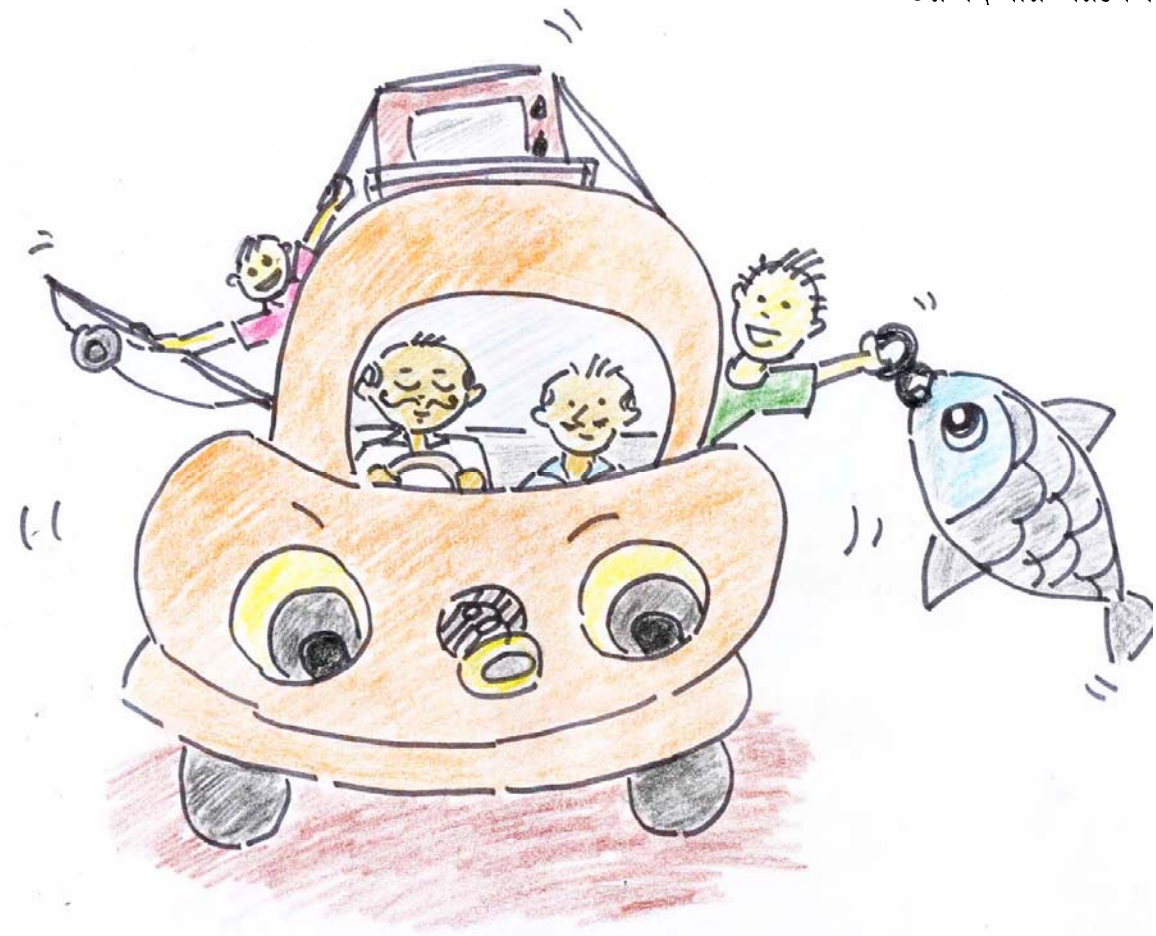

ছোটমামা ভাত-ঘুম থেকে উঠে ছিপ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তার সঙ্গে ব্যাটারি চালিত ছোট্ট যন্ত্রটা বের করে তাতে নতুন ব্যাটারি জুড়ে দিল। এই ছোট্ট যন্ত্রটি ছোট মামা নিজে তৈরি করেছে। বাড়িতে একটা পুরনো সাদা-কালো টিভি পড়েছিল। একদিন চিলেকোঠার ছাদে গিয়ে সেই টিভিটা দেখে মামার নতুন একটা আইডিয়া এসে যায়। অনেক সময় পুকুরে ছিপ ফেলে ফাতনার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে চোখ ব্যথা হয়ে যায়, মাছ আর টোপ খায় না। আসলে মাছের ঝাঁক তখন অন্য কোন দিকে সদলবলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেখানে যদি টোপ ফেলে বসে থাকা যেত তবে আর দেখতে হতনা। টপাটপ করে মাঝ উঠে আসত। এই চিন্তাটা ছোটমামার মনের মধ্যে অনেক দিন থেকেই ছিল। পুরনো টিভিটা পেয়ে মামা একটা ছোট্ট অ্যান্টনা লাগিয়ে তার সঙ্গে বড় একটা তার যোগ করে দিয়েছে। সেই লম্বা তারটি জলে ফেলে দিলেই জলের নীচের দৃশ্য টিভির পর্দায় ভেসে উঠবে। দেখা যাবে মাছের ঝাঁক কোথায় রয়েছে। ছোট্ট যন্ত্রের মধ্যে ব্যাটারি দেওয়া রিমোট আছে। রিমোটের সাহায্যে জলের মধ্যে থাকা গোল মত যন্ত্রটিকে ঘোরানো যায়। মামা এক হাতে রিমোট আর অন্য হাতে ছিপ নিয়ে চুপ করে বসে থাকে আর চোখ রাখে সিসি টিভির দিকে। তবে সবসময় সিগন্যাল ভালো

পাওয়া যায় না। অনেক সময় মাছের বদলে স্ক্রিনে শুধুই জলের ঢেউ দেখা যায়। সেদিন আর মাছ পাওয়া যায় না।

ছোটমামা ছিপ ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি ঘাড়ে করে বেরোতে যাবে তখনই বড়মামা পেছন থেকে হাঁক দিল, "ছোটকা, টমটম রেডি কর। আজ আমিও মাছ শিকারে যাব। তবে তোর মত ঐ চুনোপুঁটি ধরতে নয়। বিশ-ত্রিশ কিলোর মাছ না ধরলে টমটমে করে গিয়ে পোষাবে না।"

টমটম হল বড়মামার আদরের পুরনো দিনের চারচাকার গাড়ি। ছোটমামার মত বড়মামাও স্বঘোষিত ইঞ্জিনিয়ার। বড়মামাও অনেক কিছু তৈরি করেছে তার টমটমের জন্য। এটা দেখলে গাড়িনির্মাতারাও অবাক হয়ে যাবে। গাড়িটির সামনে তিনটি লাইট। গাড়ি চলার সময় একটা লাইটের আলো সামনে না পড়ে একটু তেরছাভাবে পড়ে যাতে করে অন্ধকারে রাস্তায় কেউ ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে থাকলে দেখা যায়। এছাড়া গাড়িতে বসার জন্য ও শুয়ে থাকার জন্য এবং জিনিসপত্র রাখার জন্য আলাদা আলাদা ব্যবস্থা আছে। এসব কিছুই মামার নিজের তৈরি। যাইহোক টমটমের বিবরণ না দিয়ে আসল কথায় ফিরে যাই।

ছোটমামা ছিপ ও অন্যান্য সামগ্রী রেখে টমটমকে স্টার্ট দেবার কাজে লেগে গেল। টমটমকে একবার স্টার্ট করা হলে সহজে আর বন্ধ করা হয়না। গাড়িতে স্টার্ট দিতে হলে কোন উঁচু জায়গায় উল্টোমুখে টেনে নিয়ে যেতে হয়। ঠেলতে আরো দু-তিনজন লোক লাগে। বড়মামা স্টিয়ারিং হাতে বসে থাকে আর সকলে মিলে টমটমকে উঁচু স্থানে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেয়। এরপর ঢালু বেয়ে গাড়ি দ্রুত গতিতে চলতে শুরু করলে মামা একসময় ঘটাং করে গিয়ারে হাত লাগায় আর অমনি গাড়িটা মাটি থেকে কিছুটা উপরে উঠে আবার নীচে লাফিয়ে পড়ে আর তারপরেই গোঁ গোঁ করে আওয়াজ বেরোতে থাকে।

(২)

বড়মামা, ছোটমামা, আমি ও হরেকেষ্ট মিলে বিকেল চারটের সময় পুটিয়ারির ড্যামের দিকে রওনা দিলাম। পুটিয়ারি ড্যামে যেতে পাক্কা এক ঘন্টা লেগে গেল। রাস্তা খুব একটা ভাল নয়। বড়মামার সাধের টমটম গাড়িটা ব্রেকড্যান্স দিতে দিতে এগিয়ে চলল। নাচের চোটে একটি হেডলাইট ভেঙে পড়ল। বড়মামা তবু গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করল না। যাইহোক ড্যামে পৌঁছে মাছের চার তৈরি করে তাতে বেশ কিছু রসুন থেঁতো করে মাখিয়ে কিছু উইপোকা মিশিয়ে জলে ফেলে দেওয়া হল। মামার সাধের সাদা-কালো টিভিটার কোন সাড়াশব্দ নেই। টমটমের লাফানোর ধাক্কায় সেটি একেবারে অচল হয়ে গেছে। তাই ছোটমামা মাছ ধরবার ব্যাপারে যন্ত্রের সাহায্য পেল না।

এরপর মাছের নেশায় সবাই এতটাই মশগুল ছিলাম যে কখন অন্ধকার নেমে এসেছে টেরই পাইনি। বড়মামা বলল, "বানিক যা তো গাড়িতে রাখা টিফিন ক্যারিয়ার দুটো নিয়ে আয়। টিফিনটা সেরে নি। ফিরতে বেশ দেরি হবে মনে হচ্ছে।"

বলাই বাহুল্য তখনো কোন মাছ ধরা পড়েনি। ছোটমামা ও বড়মামার মধ্যে এ নিয়ে বেশ কয়েকবার বাক্ যুদ্ধ হয়ে গেছে। যাইহোক অন্ধকার যখন হয় হয় ঠিক তখনই বড়মামা একটা কেজি দুইয়ের রুই মাছ ডাঙায় এনে তুলল। আর কোন কথা নয়। এরপর বাড়ি ফিরতে হবে। কিন্তু টমটমের আর ট্যাঁ-ফোঁ নেই। নট নড়ন-চড়ন। পাঁচবার তাকে ঠেলেঠুলে উঁচু ঢিপির মাথায় নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেওয়া হল। ঢালু বেয়ে যেতে যেতে যথারীতি গিয়ার মেরে যেতে লাগল। গাড়ি আর স্টার্ট নেয় না। হরেকেষ্ট গায়ের ঘাম মুছতে মুছতে বসে পড়ে বলল, "রাতটা মনে হচ্ছে এখানেই কাটাতে হবে। বাড়ি ফেরা হবে না।"

বড়মামা ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। শেষবারে ঠিক গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে দিল। তবে বিপত্তি হল এটাই যে তিনটি লাইটের মধ্যে দুটি হেড লাইটই বন্ধ হয়ে গেছে। তেরছা ভাবে আলো পড়ে যে লাইট থেকে সেটাই শুধু জ্বলছে। সেই লাইটের ভরসায় আমরা চারজন গাড়িতে চেপে বসলাম। রাস্তা আন্দাজ করে গাড়ি চালাতে হচ্ছে। আলো গিয়ে পড়ছে সোজা রাস্তার একধারে গাছের উপর। জোরে গাড়ি চালানো অসম্ভব। আবার যদি গাড়ি গর্তে পড়ে এই লাইটটাও ফিউজ হয়ে যায় তাহলে ঘোর বিপত্তি। তার চেয়ে ধীরে ধীরে চালানোই ঠিক। এভাবে গাড়ি চলতে চলতে টাটায়াড়া যখন এসেছে তখনই দেখা গেল কেউ রাস্তার মাঝে গাছের গুঁড়ি ফেলে রেখেছে। টাটায়াড়ার জঙ্গলঘেরা রাস্তায় মাঝে মধ্যেই কে বা কারা গাছের গুঁড়ি ফেলে রেখে দিয়ে গাড়ির যাত্রীদের টাকা পয়সা কেড়ে নেয়। বড়মামা স্টিয়ারিং ছেড়ে নিচে নেমে এল। গাড়ি একটানা গোঁ গোঁ করে ফুঁসতে লাগল। ছোটমামা বলল গাড়ির আলো রাস্তায় পুরো পড়ছে না। গাড়ি একটু ঘুরিয়ে তারপর আলো ফেলতে হবে। তাই করা হল। টমটম একটানা গর্জন করে যাচ্ছে। তার যাবার পথ এভাবে আটকে দেওয়াটা সে যেন পছন্দ করে নি। তার সর্বাঙ্গ কেঁপে কেঁপে উঠছে আর তার সঙ্গে হেলে পড়া একটি হেডলাইট বনেটের সঙ্গে অনবরত ধাক্কা মারছে আর গুড় গুড় করে আওয়াজ উঠছে। আমরা চারজনেই পথে নেমে গাছের গুঁড়ি সরাতে লাগলাম। বড়মামা মাঝেমধ্যেই অন্ধকারের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল আর বলতে লাগল, "বন্দুকটা সঙ্গে নিয়ে এলে কত কাজে লাগত। ডাকাত ব্যাটাদের মাথার খুলি উড়িয়ে দিতাম।"

আমি ভয়ে একেবারে জড়সড় হয়ে গেছি। এই বুঝি ডাকাতের দল ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু কোথায় কে! কেউ বাধা দিতে এল না। গাড়ির তেরছা আলো গিয়ে পড়ছে লম্বা লম্বা শালগাছগুলোর উপরে।

একটা লম্বা ছায়ামূর্তি সেই গাছগুলোর উপরে ভেসে উঠেই আবার মিলিয়ে গেল। অনেক সময় গাড়ির হেডলাইটের উপর ফড়িং আটকে গেলেও এরকম বড় ছায়া পড়ে। যাইহোক আমরা আর দেরি না করে গাড়িতে চেপে বসলাম। বড়মামা অনেক কসরৎ করে গাড়ি চালাতে লাগল। হরেকেষ্ট বসে বসে ঢুলতে লাগল। রাত্রি নটার সময় ঘরে ফিরলাম।

(৩)

ছোটমামা তারা ছিপ ও যন্ত্রপাতি নিয়ে নেমে গেল। বড়মামা গাড়িতে শোবার সিটের মধ্যে দু-কেজির রুই মাছটা যত্নের সঙ্গে থলিতে বেঁধে রেখেছিল। সেটা খুঁজতে গিয়ে কোথাও পাওয়া গেলনা। নিচে পড়ে সিটের মধ্যে ঢুকে যায়নিতো! টর্চ লাইটের আলোয় তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল। কোথাও নেই। ঠিক তখনই মনে পড়ল রাস্তায় যখন গাছের গুঁড়ি সরাতে ব্যস্ত ছিলাম তখনই মাছটাকে চোরেরা হাওয়া করে দিয়েছে। চোর গাড়িতে অন্য কিছু না পেয়ে মাছটাকেই নিয়ে গেছে।

বড়মামা ও ছোটমামাতে শেষে এক কিস্তি লড়াই হয়ে গেল। সারাটা বিকেল মাছের জন্য কত যুদ্ধ করা হল অথচ মাছ আর খাওয়া হলনা।

ছবিঃ সোমা

ডাব বাবা

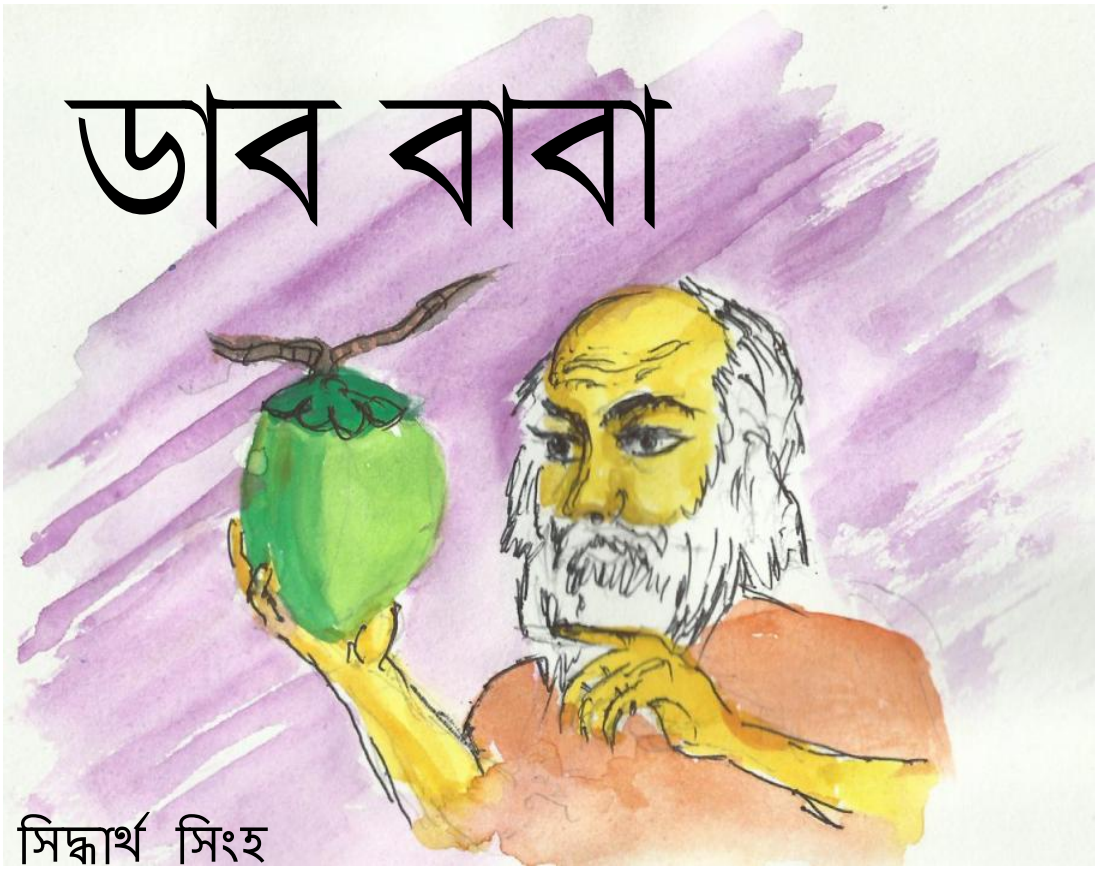

সিদ্ধার্থ সিংহ

তখন মধ্যদুপুর। স্টেশন থেকে বেরিয়েই একটা টাঙা নিয়ে নিয়েছিল অহিতাগ্নি। যত দূর আসা যায় এসে দূরে আঙুল দেখিয়ে টাঙাওয়ালা বলেছিল, এই মাঠের উপর দিয়ে সোজা চলে যান, ডাব বাবার ডেরা পেয়ে যাবেন।

এই ইন্টারনেটের যুগে সারা পৃথিবীতে খবর ছড়াতে যে মাত্র মাত্র কয়েক মুহূর্তই যথেষ্ট, সেটা প্রমাণ হয়ে গেছে বহু বছর আগেই। কোথায় কোন পাথরের গণেশ নাকি দুধ খাচ্ছে, চাউর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চার দিকে গণেশকে দুধ খাওবারার ধুম পড়ে গিয়েছিল। পাড়ায় পাড়ায়, অলিতে গলিতে, যেখানেই গণেশ বাবাজির মূর্তি, সেখানেই দুধ খাওয়ানোর জন্য মা মাসি পিসি ঠাকুমার সে কী লম্বা লাইন! সবাই স্নান- টান করে পাথরের বাটি, কাঁসার বাটি, স্টিলের বাটি, কেউ কেউ আবার কাচের পাত্র করেও দুধ নিয়ে এসে হাজির। যে দেশে লক্ষ লক্ষ শিশু এক ফোঁটা দুধের জন্য ছটফট করে, দুধ জোটাতে না- পেরে বাবা- মায়েরা জঙ্গল থেকে সটি তুলে এনে সেদ্ধ করে খাওয়ায়, সে দেশেই সে দিন যে কত লক্ষ কোটি লিটার দুধ নর্দমা দিয়ে বয়ে গিয়েছিল, তার কোনও হিসেব নেই। তবে জানা গিয়েছিল, শুধু এ দেশেই নয়, পৃথিবীর সর্বত্র-- সে আমেরিকাই হোক, মিশরই হোক বা

আলাস্কাই হোক, যেখানে ভারতীয়, সেখানেই নাকি গণেশকে দুধ খাওয়াবার হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। এবং এখানকার এপাড়া ওপাড়ায় রটার আগেই নাকি সারা বিশ্ব জেনে গিয়েছিল এই খবর। এবং তা জেনেছিল মূলত ইন্টারনেটের মাধ্যমেই।

তবে না। এই ডাব বাবার খবর ইন্টারনেটের মাধ্যমে নয়, অহিতাগ্নি পেয়েছে তার বাড়ির মাসির কাছ থেকে। যেখানে ডাব বাবার আবির্ভাব হয়েছে, তাঁর এক ধর্মভাই নাকি সেই গ্রামেই থাকে। কী একটা দরকারে কলকাতায় এসে তাঁর বাড়িতে দু''দিন ছিল। অত দূর থেকে কলকাতায় এসেছে অথচ কালীঘাটে পুজো দেবে না, চিড়িয়াখানায় ঘুরবে না, অন্তত বাইরে থেকে এক ঝলক ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখবে না, তা হয়?

কথায় কথায় দ্বিতীয় দিন সেই ধর্মভাই কাজের মাসিকে বলেছিলেন এই ডাব বাবার কথা। বাবার নাকি অসীম ক্ষমতা। অসাধ্যসাধন করতে পারেন। যে কোনও অসুখ একদিনে সারিয়ে দিতে পারেন। মামলা মকদ্দমার নিষ্পত্তি করে দিতে পারেন মাত্র ক''দিনেই। যে কোনও বিপদ কাটিয়ে দিতে পারেন মুহূর্তে। মোদ্দা কথা, সব সমস্যা সমাধানের মন্ত্র আছে তাঁর কাছে।

কাজের মাসির কাছে ডাব বাবার কথা শুনে অহিতাগ্নি জিজ্ঞেস করেছিল, ''উনি কি তান্ত্রিক?''

সঙ্গে সঙ্গে জিভ বার করে নিজের নাক- কান মুলে তিনি বলেছিলেন, ''না না, তান্ত্রিক কি গো? উনি তো তান্ত্রিকের বাবা।''

''তান্ত্রিকের বাবা! ও, ওনার ছেলে তান্ত্রিক?''

''না না, আমি তা বলিনি। আমি বলছি, এক হাজার তান্ত্রিক অনেক সাধ্যসাধনার পরও যা করতে পারেন না, উনি তা এক নিমেষেই করে দিতে পারেন। বড় বড় তান্ত্রিকরা তো ওনার পায়ের কাছে হত্যে দিয়ে পড়ে থাকে গো...''

''ও। উনি বুঝি খুব ছোটবেলা থেকেই সাধনা করতেন, না?''

''না না। সাধনা- টাধনা নয়, উনি নাকি ওই গ্রামের একজন খুব সাধারণ মানুষ। কী যেন নাম! কী যেন নাম! ও হ্যাঁ, রাঘব। ওনার নাম রাঘব ঘড়াই। তা, আমার ধর্মভাই তো বলল, উনি নাকি আগে পাতকুয়োর কাজ করতেন। কিন্তু

কুয়োর কাজ তো আর রোজ রোজ পায় না। কাজ না করলে খাবে কী? তাই কারও কোন দামি গয়না, সে গলার হারই হোক বা নাকের নাকছাবি, পুকুর বা কুয়োয় পড়ে গেলে, এক ডুব দিয়ে উনি সেটা ঠিক তুলে নিয়ে আসতেন। এ কাজে ওনার খুব নামডাক ছিল। তাতে উনি যা পেতেন, ওনার সংসার কোনও মতে চলে যেত। সংসার আর কী, বিয়ে- থা তো করেননি। উনি আর ওনার মা।"

"সে ঠিক আছে। কিন্তু উনি ডাব বাবা হয়ে উঠলেন কী করে?"

"সেটাই তো বলছি। একদিন গ্রামের এক গভীর কুয়োতে কার নাকি একটা পেতলের বালতি দড়ি ছিঁড়ে পড়ে গিয়েছিল। যৌতুক হিসেবে বিয়েতে আর যা যা সে পেয়েছিল, রেডিও, সাইকেল, ঘড়ি সবই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। শুধু বেঁচে ছিল ওটা। তাই ওটার জন্য তার যত না আফশোস, তাঁর বউয়ের আফশোস তার দ্বিগুণ। সে তো কেঁদেকেটে একশা। বলে, একে একে সবই গেছে। কিছুই তো আর অবশিষ্ট নেই। যে ভাবেই হোক, তুমি আমাকে ওটা তুলে এনে দাও। ওটা আমার মায়ের শেষ স্মৃতিচিহ্ন।

"কিন্তু তুলে এনে দাও বললেই তো আর তুলে এনে দেওয়া যায় না। অত গভীর কুয়োয় নামবে কে? অগত্যা ডাক পড়ল সেই রাঘব ঘড়াইয়ের। যে কোনও হারানো জিনিস এক ডুব দিয়েই যিনি তুলে আনতে পারেন। তিনি ওই কুয়োতে যে দিন নামলেন, সে দিন যেন উঠতেই চান না। অনেকক্ষণ পর যখন উঠলেন, তখন ওই বালতি তো আনলেনই, সঙ্গে আনলেন বালতি ভর্তি করে হিরে, জহরত, মণিমাণিক্য, সোনাদানা। যাঁরা কুয়োর পাড়ে দাঁড়িয়ে ভিড় করে মজা দেখছিলেন, তাঁরা তো একেবারে থ। তাঁদের মধ্যে থেকেই কে যেন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এগুলি কোথা থেকে পেলে?

"না। উনি নাকি কোনও উত্তর দেননি। বালতিটা দিয়ে পারিশ্রমিকও নেননি। সোনাদানা হিরে জহরত গামছায় বেঁধে চুপচাপ বাড়ি চলে গিয়েছিলেন।

"লোকটাকে অত হিরে জহরত কুয়ো থেকে তুলতে দেখে পাড়ে দাঁড়ানো অনেকেরই চোখ চকচক করে উঠেছিল। কারও কারও মনে হয়েছিল, বালতি ভরে যখন নিয়ে এসেছে, তার মানে ওখানে আরও আছে। তাই অন্য কেউ ঝাঁপিয়ে পড়ার আগেই তারক নামে গ্রামের এক মাতব্বর নাকি সঙ্গে সঙ্গে দড়ি বেয়ে ঝটপট কুয়োয় নেমে গিয়েছিল। দশ মিনিট গেল, পনেরো মিনিট গেল, আধ ঘন্টাও পার

হয়ে গেল, কিন্তু কুয়ো থেকে তাকে উঠতে না দেখে আশপাশের লোকেরা ভয় পেয়ে গেল। ফের খবর দেওয়া হল রাঘবকে। তিনি যখন কুয়ো থেকে তাকে তুললেন, তার সারা গায়ে সবুজ শ্যাওলা আর ঝাঁঝরি গাছে মোড়া। পেট ফুলে ঢোল। কোনও হুঁশ নেই। এ আসে। ও আসে। সে আসে। নানা পরামর্শ দেয়। টোটকা বলে। কিন্তু কিছুতেই আর জ্ঞান ফেরে না তার। তখন রাঘবই নিজে থেকে বললেন, একটা ডাব আনো তো দেখি...

"সঙ্গে সঙ্গে তারকের বড় ছেলে তরতর করে গাছে উঠে একটা ডাব পেড়ে

আনল। ডাবটার মুখ কেটে দিল একজন। রাঘব সেই ডাবের মুখের কাছে মুখ নিয়ে

বিড়বিড় করে কী একটা বলে, বাঁ হাতে একটু ডাবের জল ঢেলে, ডাবটা উপুড় করে বাকি জলটা কুয়োর মধ্যে ফেলে দিলেন। তার পর বাঁ হাতের সেই জল তারকের মুখে ছিটিয়ে দিতেই কয়েক পলকের মিধ্যে সে চোখ মেলে তাকাল। আস্তে করে বলল, আমি কোথায়? এত লোক ভিড় করে আমাকে দেখছে কেন? কী হয়েছে আমার?

"সে সব প্রশ্নের উত্তর কেউ দিল না। সবাই ধন্য ধন্য করতে লাগল। ছোট্ট একটা ডাব দিয়ে যিনি মরণাপন্ন লোকের জীবন ফিরিয়ে দিতে পারেন, তিনি তো যে সে লোক নন! তাঁর বিশাল ক্ষমতা।

"অনেক সাধুবাবা দেখেছি জীবনে, কিন্তু এরকম ডাব বাবা এই প্রথম দেখলাম। কথাটা কে যেন বলেছিল কে জানে, তার পর থেকেই রাঘবকে সবাই ডাব বাবা বলে ডাকতে শুরু করল। শুধু ডাব নয়, ডাবের সঙ্গে কুয়োরও একটা সম্পর্ক আছে, তাই মৃত্যুর একেবারে দোরগোড়া থেকে ফিরে আসা তারক আর তার ছেলের উদ্যোগেই চাঁদা তুলে কুয়োর পাশে দরমা- টরমা দিয়ে একটা চালাঘরও বানিয়ে দিল গ্রামের লোকেরা। উনি এখন সেখানেই থাকেন। কারও কোনও সমস্যা হলেই, একটা ডাব নিয়ে চলে আসে তাঁর কাছে। উনি সেই একইভাবে মন্ত্র পড়ে বাঁ হাতে একটু ডাবের জল নিয়ে বাকি জলটা উপুড় করে ঢেলে দেন কুয়োয়, তারপর ছিটিয়ে দেন রোগীর মুখে, ব্যাস।

"শুধু এ গ্রামেই নয়, আশপাশের সব গ্রামে তো বটেই, বহু দূরে দূরেও ছড়িয়ে পড়ল এ খবর। প্রথম প্রথম শনি- মঙ্গলবার, অমাবস্যা পূর্ণিমায় উনি বসতেন। এখন প্রত্যেক দিন এত ভিড় হচ্ছে যে, সামাল দেওয়া যাচ্ছে না। রোজই বসতে হচ্ছে। নিজের জন্য আর সময় পাচ্ছেন না তিনি। তাই সকাল আর সন্ধ্যায় টাইম বেঁধে দিয়েছেন। এত ডাব লাগছে যে, এলাকায় আর কোন গাছে ডাব নেই। মুচি হতে না- হতেই ডাব বাবার কাছে চলে আসছে। আমদানি করতে হচ্ছে বাইরে থেকে। সেগুলোরও দাম আকাশ ছোঁয়া।

"লোকেরা বলছে, এমনি রোগ তো কোন ছার, ডাক্তার- কবিরাজ ফেল পড়ে গেছে, সে রোগও ভাল হয়ে যাচ্ছে। ডাক্তার জবাব দিয়ে দেওয়া মৃত্যুপথযাত্রীও এখানকার মন্ত্রপূত ডাবের জলের ছিটে নেওয়ার পরই, ব্লাড টেস্ট, এক্সরে, আল্ট্রাসোনোগ্রাফি, এমনকি বায়োপসি করেও দেখেছে, ক'দিন আগে টেস্ট করা

রিপোর্টের সঙ্গে কিছুই মিলছে না। সব কিছুই নাকি ঠিকঠাক আছে। পুরো সুস্থ। নতুন রিপোর্ট দেখে ডাক্তাররাও থ। অনেকেই বলছেন, এখানে যখন কোনও চাকরিপ্রার্থীর মুখে ডাব বাবা ডাবের জলের ছিটে দেন, তখন নাকি কোনও না কোন কোম্পানিতে তার নামে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার লেখা হতে থাকে। কেউ কেউ বলে, এখানকার ডাবের জলের ছিটেয় নাকি ভাঙা সংসার শুধু জোড়াই লাগে না, সুখে-শান্তিতে ভরে ওঠে।''

কাজের মাসি এসব গল্প করলেও অহিতাগ্নির যেন কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিল না। আজকের দিনে আবার এরকম হয় নাকি! তাই ডাব বাবার কেরামতি দেখার জন্য সে উশখুশ করতে লাগল। কী ভাবে ডাব বাবার কাছে যাওয়া যায়! কাজের মাসির কাছে বলতেই, তাঁর ধর্মভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে সেই গ্রামে যাওয়া এবং থাকার সব ব্যাবস্থা করে দিলেন তিনি। সেই সুবাদেই তার এখানে আসা।

ফাঁকা ধূ ধূ মাঠ। যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। হু হু করে হাওয়া দিচ্ছে। তালগাছের শুকনো পাতা একটার সঙ্গে একটার ঘসা লেগে খড়খড় খড়খড় আওয়াজ হচ্ছে। উড়তে উড়তে ডাক দিয়ে যাচ্ছে এক-আধটা নাম না জানা পাখি। আলপথের দু''ধারের সদ্য ধান কাটা মাঠে ঘুঘুপাখিরা কী যেন খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। ক''হাত দূর দূর এ পাশে ও পাশে ছোট ছোট ডোবা। হঠাৎই এ পাশ থেকে আলপথের ও পাশে এঁকেবেঁকে চলে গেল একটা মস্ত বড় দাঁড়াস সাপ।

কতটা এসেছে সে, খেয়াল নেই। দূর থেকেই চোখে পড়ল ডাবের পাহাড়। এখানে এত ডাব আসবে কোত্থেকে! না। ওগুলো নিশ্চয়ই ডাব নয়। ডাবের খোলা। তার মানে সে ঠিক জায়গাতেই এসে পড়েছে। হ্যাঁ, ওই তো সেই চালাঘর। যে চালাঘরের কথা সে তার কাজের মাসির কাছে শুনেছিল। পায়ে পায়ে কাছে গিয়ে দেখে, চালাঘরের দরজা হাট করে খোলা। উঁকি মেরে দেখে, ভিতরে একটা চৌকির ওপরে একজন প্রৌঢ় বসে আছেন। ওর বুঝতে অসুবিধে হল না, ইনিই সেই ডাব বাবা। ও মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, ''ভেতরে আসব বাবা?''

''কে?''

''আমি।''

''আমি কে?''

“অহিতাগ্নি।”

“অহিতাগ্নি কী?”

“পুরকায়েত।”

“কী চাই?”

“আপনার সঙ্গে একটু দরকার ছিল।”

“আমি এ সময় কারও সঙ্গে কথা বলি না। এখন আমার বিশ্রামের সময়। সন্ধের পরে কিংবা কাল সকালে এসো।”

“আমি বহু দূর থেকে এসেছি বাবা।”

“তো? আমি কী করব?”

“রোদের মধ্যে অনেকটা পথ হেঁটে এসেছি বাবা, ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে। একটু জল পাওয়া যাবে?”

“জল? জল তো আমি খাই না।”

“তা হলে কী খান?”

“ডাবের জল।”

“তাই দিন।”

“ঠিক আছে, দাঁড়া।” বলেই, খাটের ও দিকে একটু ঝুঁকে নিচ থেকে একটা ডাব বার করে আনলেন তিনি। মুখটা কাটা। চামচের পেছনের দিকটা গায়ের জোরে গেঁথে দিয়ে এক পাক ঘোরাতেই খানিকটা চলকা উঠে এল। তার পর ডাবটা অহিতাগ্নির দিকে এগিয়ে দিলেন তিনি। অহিতাগ্নি বলল, “দিলেনই যখন, একটু মন্ত্র পড়ে দিন না... ”

“মন্ত্র? ও বুঝেছি। তুইও নিশ্চয়ই কোনও মনোবাঞ্ছা নিয়ে এসেছিস, না?”

“আপনার কাছে কী আর লুকোবো বাবা? আপনি তো অন্তর্যামী।”

“আমি কেউ নই রে, আমি কেউ নই। সব তেনারা...”

তেনারা! বড় খটকা লাগল অহিতাগ্নির। তেনারা আবার কী! লোকেরা তো বললে বলে, আমি কেউ নই রে, সব তিনি। তিনি মানে ঈশ্বর। দেবতা। ভগবান। আর ভূত- পেত্নির গল্প পড়তে পড়তে ও যতটা জেনেছে, তাতে তো তেনারা মানে- ভূত। তবে কি ওনার যা ক্ষমতা, তার মূলে রয়েছে ভূত! সবটাই ভৌতিক!

মাথার মধ্যে হাজার রকম প্রশ্ন জট পাকাতে লাগল অহিতাগ্নির। কী জট, ডাব বাবা জানেন না। তিনি বললেন, “আশা করে যখন এসেছিস, চল বেটা, চল। তোর মুখে যখন ডাবের জল ছেটাব, তুই যা চাস, সেটা মনে মনে চাইবি, কেমন? তা হলেই হবে, চল বেটা, চল।”

ঘর থেকে বেরিয়েই ডান হাতে কুয়ো। বুক অবধি পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। তার সামনে দাঁড়িয়ে ডাবের কাটা মুখের কাছে মুখ নিয়ে বিড়বিড় করে কী সব বললেন ডাব বাবা। তার পরে কাত করে বাঁ হাতের তালুতে একটুখানি ডাবের জল নিয়ে, বাকি জলটা উপুড় করে ঢেলে দিলেন কুয়োয়। খালি খোলটা পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে জমে থাকা খোলগুলির দিকে ছুঁড়ে ফেললেন। তার পরে অহিতাগ্নির মুখে জলের ছিটে দিতেই অহিতাগ্নি মনে মনে বলল, কুয়োয় নামার পর এমন কী ঘটেছিল যে, একজন অতি সাধারণ ছাপোষা মানুষ রাঘব থেকে ডাব বাবা হয়ে উঠলেন, সেটা আমার এক্ষুণি জানতে ইচ্ছে করছে বাবা।

ডাব বাবা ওর মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বললেন, “এসো। ভিতরে এসো।” বলে, নড়বড়ে একটা টুল

এগিয়ে দিলেন তিনি। বললেন, "বোসো।" ও তাতে বসল। উনি উঠে গেলেন চৌকির ওপরে। আসনপিঁড়ি করে বসে, দু'মিনিট চোখ বন্ধ করে বললেন, "এতই যখন জানার ইচ্ছে, তা হলে শোনো-- সে দিন কুয়োর দেয়ালের খাঁজে পা রেখে রেখে নামছি। বুঝতে পারিনি, নীচের দিকের দেওয়ালে এত শ্যাওলা ছিল। হঠাৎ পা হড়কে পড়ে গেলাম নীচে। ছপাৎ করে উঠল জল। কোমরে খুব জোর লাগল। বুঝতে পারলাম, এই কুয়োর জল তলানিতে এসে ঠেকেছে। দাঁড়িয়ে দেখি, হাঁটুর নিচে জল।

মাথার উপরে তখন চিঁ চিঁ করে ডানা ঝাপটাচ্ছে ঝাঁক ঝাঁক চামচিকে। একেতেই অন্ধকার। যেটুকু আলোর রেশ আসছিল, সেটুকুও ওদের ডানায় ঢেকে গেল। তারই মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে যখন ওই লোকটার পেতলের বালতিটা খুঁজছি, কে যেন নাকি সুরে বলে উঠল, 'বাঁলতি নিঁচ্ছ নাঁও। জঁল কিঁন্তু এঁক ফোঁটাও নিঁও নাঁ।'

"আমি ভূত- প্রেতে বিশ্বাস করি না। মুহূর্তের জন্য মনে হল, কেউ বুঝি মশকরা করছে। কিন্তু তার পরেই আবার মনে হল, এখানে, এই কুয়োর মধ্যে মস্করা করতে আসবে কে! তাই বললাম, 'কুয়ো থেকে লোকে জল নেবে না তো কি মণিমানিক্য নেবে?'

"ফের সেই গলা নাকি সুরে বলল, 'কেঁন? নিঁলে অঁপরাঁধ কোঁথায়? মণিঁমাঁনিক্য যাঁ চাঁও দিঁতে পাঁরি। কিঁন্তু বাঁপু, এঁক ফোঁটাও জঁল দিঁতে পাঁরব নাঁ। আঁমাদেঁর এঁখানে এইঁটুকুনিই আঁছে।'

" 'তার মানে, তোমাদের এখানেও জলের অভাব?'

" 'অঁভাব মাঁনে? মঁহাঅঁভাব। কেঁউ যঁদি আঁমাদেঁর এঁক কাঁপ কঁরেও রোঁজ জঁল দেঁয়, তাঁ হঁলে তাঁকে আঁমরা সোঁনাদাঁনা দিঁয়ে মুঁড়ে রাঁখতে পাঁরি।'

" 'সোনা দিয়ে?' চমকে উঠলাম আমি। হঠাৎ আর একটি গলা পাশ দিয়ে বলে উঠল, 'শুঁধু সোঁনা কেঁন? সোঁনাদাঁনা হিঁরে- জঁহরত মঁণিমাঁনিক্য যাঁ চাঁইবে, তাঁই দিঁতে পাঁরি। আঁমাদেঁর শুঁধু এঁকটু জঁলের ব্যাঁবস্থা কঁরে দাঁও। জঁলের জঁন্য আঁমাদেঁর বুঁক শুঁকিয়ে যাঁচ্ছে। গঁলা শুঁকিয়ে যাঁচ্ছে। জিঁভ শুঁকিয়ে কাঁঠ। জাঁনি নাঁ, আঁর কঁ'দিঁন পঁরে কীঁ হঁবে ...'

“তার কথা শেষ হওয়ার আগেই আর একটি গলা ভেসে এল, ‘সেঁ এঁকবার খেঁয়েছিঁলাম বঁটে, ডাঁবের জঁল। আঁমার মাঁসতুঁতো বোঁনপো থাঁকত ডাঁব গাঁছের মাঁথায়। আঁমাদেঁর এঁখানে বেঁড়াতে আঁসার সঁময় কঁ’টাঁ ডাঁব নিঁয়ে এঁসেছিঁল। আঁহা, কীঁ তাঁর স্বাঁদ! কীঁ তাঁর গঁন্ধ। এঁখনও যেঁন জিঁভে লেঁগে আঁছে।’

“ ‘ডাবের জল! হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। যে ভাবে গ্রামগঞ্জেও পলিউশন ছড়িয়েছে, তাতে ওটাই এখন একমাত্র পরিশুদ্ধ জল!’

“ ‘নাঁ নাঁ নাঁ। সেঁ আঁগে ছিঁল। আঁজ থেঁকে কঁয়েক দঁশক আঁগেও ছিঁল। কিঁন্তু তোঁমাদের মোঁবাইল আঁর ইঁন্টারনেঁটের ঠেঁলায় সেঁটাও গেঁছে।আঁগের মঁতো সঁবুজ মঁসৃণ গাঁ- ওঁয়ালা ডাঁব কিঁ আঁর এঁকটাও দেঁখতে পাঁও?

দেঁখবে, মাঁথা কুঁটলেও পাঁবে নাঁ। সঁব কঁটার গাঁয়েই কেঁমন জ্বঁলে যাঁওয়া পোঁড়া পোঁড়া দাঁগ।’

“ ‘হ্যাঁ, তাই তো!’

“‘তঁবু, ওঁটা মঁন্দের ভাঁল। ওঁই জঁল যঁদি দিঁতে পাঁরো, তাঁ হঁলে তুঁমি যাঁ চাঁইবে, সঁব দেঁবো, সঁব।’

“আমি বললাম, ‘সব নিয়ে আমি কী করব! আমার তো ছেলেপুলে নেই। সংসার বলতে আমি আর আমার মা। দুজনের জন্য আর কত কী লাগে?’ কথা শেষ হল না। আবার সেই নাকি সুরে কথা ভেসে এল, ‘কেঁন? তোঁমার গাঁয়ের লোঁকেরা বুঁঝি তোঁমার আঁপনজঁন নঁয়? প্রিঁয় লোঁক নঁয়?’

“ আমি বললাম, ‘কিন্তু তাদের জন্য আমি কী করতে পারি?’

“ ‘যাঁরা রোঁগে ভোঁগে তাঁদের রোঁগ দূঁর কঁরতে পাঁরো। যাঁদের অঁভাব অঁনটঁন আঁছে, তাঁদের অঁভাব মেঁটাতে পাঁরো। যাঁরা দুঁখী, তাঁদের মুঁখে হাঁসি ফোঁটাতে পাঁরো ...’

“আরও অনেক কিছু বলে যাচ্ছিল ওরা। আমি বললাম, ‘কী ভাবে?’

“তখন ওদের মধ্যে থেকেই একজন বলল, ‘এঁকটা কাঁজ কঁরো, যাঁরা তোঁমার কাঁছে সঁমস্যা নিঁয়ে আঁসবে, তুঁমি তাঁদের এঁকটা কঁরে ডাঁব আঁনতে বঁলবে। সেঁই ডাঁবের মুঁখ কেঁটে, তাঁর কাঁছে মুঁখ নিঁয়ে তুঁমি শুঁধু এঁকটা মঁন্ত্রই উঁচ্চারণ কঁরবে--

হেঁ, ভূঁত বাবা, এঁ যাঁ চাঁয়, সেঁটা যেঁন পাঁয়। বঁলেই, ডাঁবের জঁলটা বাঁ হাঁতের তাঁলুতে দুঁ- তিঁন ফোঁটা ঢেঁলে নিঁয়ে, বাঁকি জঁলটা আঁমাদেঁর কুঁয়োর ওঁপরে উঁপুড় করে ঢেঁলে দেঁবে। তাঁর পঁর বাঁ হাঁতের জঁলটা তাঁর মুঁখে ছিঁটিয়ে দেঁবে, ব্যাঁস। তাঁ হঁলে তুঁমিও তোঁমার প্রঁতিবেঁশী, আঁত্মীয়স্বঁজনদের সেঁবা কঁরতে পাঁরবে আঁর আঁমরাঁও ডাঁবের জঁল পেঁয়ে তৃঁপ্ত হঁব...’

“বলেই, উধাও হয়ে গেল ওরা। বালতি তুলতে গিয়ে দেখি, সোনাদানা, হিরে, জহরতে ভর্তি। ওরা ভালবেসে দিয়েছে, আমি তো ফেলে দিতে পারি না। তাই নিয়ে এলাম। আসার সময় ওদের কাউকে দেখতে পেলাম না। তবু ওদের শুনিয়েই চিৎকার করে বলে এলাম, যা দিয়েছ, দিয়েছ। আমাকে আর কখনও এ সব দিয়ো না। তোমরা যে মন্ত্র আজকে আমাকে দিলে, তা যদি সত্যিই কাজ করে, তা হলে গোটা পৃথিবীর সব ধনরত্ন এক জায়গায় জড়ো করলেও তার কাছে নস্যি হয়ে যাবে ...”

“সে হিরে- জহরতগুলি কোথায়?”

“ওগুলো দিয়ে আমি কী করব! তা ছাড়া ওগুলো বাড়িতে থাকলে সারাক্ষণ ভয়ে ভয়ে থাকতে হবে। কখন চোর আসে, ডাকাত আসে। দু’’দণ্ডের জন্য নিশ্চিন্ত হতে পারি না। তাই পর দিন খুব ভোরে কাক-পক্ষী ওঠার আগেই আমি ওগুলি সেই কুয়োতেই ফেলে দিয়ে এসেছিলাম। যাতে কেউ টের না পায়। পেলেই গন্ডগোল। ফেলার পর সে কী শান্তি!’’

“তার পর?’’

“তার আবার পর কী? ওই ভাবেই চলছে।’’

“আর কত দিন চলবে?’’

মাথা নামিয়ে ধীরে ধীরে ডাব বাবা বললেন, “আর একদিনও নয়। আজই সব শেষ হয়ে গেল।’’

“সব শেষ হয়ে গেল মানে?’’

“ওরা বলেছিল, এই ঘটনাটা যাতে আমি কাউকে না বলি। বললেই নাকি, আমার এই মন্ত্রের গুণ সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হয়ে যাবে।’’

“তা হলে বললেন কেন?’’

“কোনও উপায় ছিল না।’’

“মানে?’’

“ওদের সঙ্গে কথা হয়েছিল, আমি যখন ডাবের কাটা মুখের কাছে মুখ নিয়ে বলব, ‘হে ভূতরাজ, এ যা চায়, সেটা যেন পায়।’ তার পর ডাবের জল কুয়োয় ঢেলেই যার মুখের উপরে বাঁ হাতে রাখা ডাবের জলটা ছিটিয়ে দেব, সে তখন মনে মনে যা চাইবে, তা-ই পাবে। এমনকি আমার মৃত্যু কামনা করলে, আমার মৃত্যুই ঘটবে। আর তুমি তো জানতে চেয়েছিলে, কুয়োয় নামার পর এমন কী ঘটেছিল যে, একজন অতি সাধারণ ছাপোষা মানুষ রাঘব থেকে ডাব বাবা হয়ে উঠলেন। তাই না? ফলে বলতে বাধ্য হলাম।’’

“তা হলে এখন কী হবে?”

“ও কুয়োয় শুধু ডাবের জল কেন? ঝর্ণার জল, তালশাঁসের জল, মিছরির জল, এমনকী ঘড়া ঘড়া লস্যি ঢাললেও আর কোনও দিন কোনও কাজ হবে না। আমাকে মেরে ফেললেও না। তোমাকে বলার সঙ্গে সঙ্গে আমার যাবতীয় কেরামতি নষ্ট হয়ে গেছে।”

কথাগুলি বলার সময় ছলছল করে উঠল ডাব বাবার চোখ। এ রকম যে হতে পারে, তা কল্পনাও করতে পারেনি অহিতাগ্নি। একদম বাকরুদ্ধ হয়ে গেল সে। মনে মনে বলল, এ কী করলাম আমি! এ কী করলাম!

ছবিঃ অনুপম

বুবাই আর পিপলির খুব ঝগড়া হয়েছে। সকাল সকাল এমনিই ঘুম থেকে উঠে স্কুলভ্যানে ওঠা পর্যন্ত কত ঝামেলা। মাম এমন তাড়া দেয়! 'এই বুবাই, ব্রাশ হল?' 'বুবাই, তাড়াতাড়ি চান করে নাও।' 'ইস, বুবাই, জুতো পড়া হয়নি এখনো?'

একটু যে বারান্দায় দাড়িয়ে সকাল দেখবে বুবাই তার উপায় নেই। মামের বারান্দা-বাগানে পাম, ক্রোটোন, অ্যালকেশিয়া, সপ্তপর্ণী। গরমে বেলি, জুঁই, রজনীগন্ধা। বর্ষায় মোসান্ডা, রঙ্গন। শীতে চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া, গাঁদা। সারা বছরই নানা রঙের গোলাপ। এছাড়া টগর, জবা, নয়নতারা, অপরাজিতা।

বাবি রাগ করে, 'একটু দাঁড়াবার জায়গা নেই, গাছে গাছে এইটুকু বারান্দা ভরিয়ে দিয়েছে তোর মাম।'

মাম বলে, 'বাড়িতে সবুজ না থাকলে চলে? সবুজের টানে কত পাখি, কত প্রজাপতি আসে আমাদের বাড়িতে। না বুবাই?'

তা অবশ্য ঠিক। বারান্দার নিচের কার্নিশে রোজ সকালে মা চাল ডাল ছড়িয়ে দেয়। আর অমনি কোথা থেকে পায়রার দল এসে বসে। চড়াই আসে, শালিখ আসে। কাক তো আসেই। খুব

মজা হয় তখন। সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠলে এই মজাগুলো হয়। নইলে মাম বারান্দার দিকে যেতেই দেবে না।

আজ সেইরকম হয়েছিল। বারান্দায় গিয়ে পাখিদের খাওয়ানো হয়নি। এমনিই মন ভালো ছিল না, তার ওপর আজ স্কুলভ্যানে উঠতেই পিপলি বলল, 'তোরা পাখিদের কী খাওয়াস রে বুবাই? পাখিগুলো আমাদের ব্যালকনিটা কত নোংরা করে দেয় জানিস?'

'মোটেই পাখিরা তোদের বারান্দা নোংরা করে না। ওই দ্যাখ ওরা সবাই আমাদের বাড়ির কাছে উড়ছে।' বুবাই হাত বাড়িয়ে দেখাল। আর ঠিক সে সময় বাগান থেকে উড়ে এল একটা শালিখ পাখি। অমনি প্রিয়াঙ্কা-অহনা-শ্রেয়া-ঐন্দ্রিলা সবাই বুবাইকে বকতে লাগল, 'সকাল সকাল ওয়ান ফর সরো দেখালি আমাদের?' পিপলি রীতিমতো ঝগড়া করতে লাগল, 'দেখলি তো? ওদের বাগানের জন্য রোজ আমায় এক শালিখ দেখতে হয়।' বুবাইয়েরই বা রাগ হবে না কেন?

মেয়েগুলো তো এমনিই করে। বুবাই সোহম-অনিরুদ্ধ-সায়নদের দিকে তাকিয়েছিল। সোহম বলল, 'না রে, সিদ্ধার্থ। অনন্যা ঠিকই বলেছে। আজ আমার টেস্ট আছে। একটা অন্তত টু ফর জয় দেখতেই হবে। এক শালিখ দেখলে ওয়ান ফর সরো। কিছু না কিছু দু:খের ঘটনা হবেই। দুটো শালিখ দেখলে নিশ্চিন্ত। টু ফর জয় বলে হাতের আঙুলে একবার ঠোট ছুঁয়ে নিতে হবে ব্যস, সব খুশি খুশি ঘটনা হবে তখন।'

মিনিদিদি শিখিয়েছিল বুবাইকে। মিনিদিদি তো কত্ত বড়ো হয়ে গেছে, তবুও সব নিয়ম মানে। একদিন বিকেলে পার্কে যাবার সময় একটা বিড়াল সামনে দিয়ে রাস্তা পার হল। সেই দেখে 'বিড়াল রাস্তা কেটেছে, আজ আর পার্কে যাব না রে বুবাই' বলে বাড়ি চলে এল।

সেদিন মনীষা ম্যাম বললেন, 'বুধবার শুভদিন।'

সোহমের মা প্রতি শনিবার কাজলের টিপ পড়িয়ে দেয়। মহুয়ামাসির ছোটো বেবিকে দেখতে গেছিল মামের সঙ্গে। 'নজর লেগেছে ওর,' বলে মহুয়ামাসি লাল লাল লঙ্কা পুড়িয়ে কীসব করছিল না? কাশতে কাশতে চোখে জল এসে গেছিল সেদিন।

ঠাম্মি বলে, ডান চোখ কাঁপা খারাপ। কালো বিড়াল দেখতে নেই। তেরো তারিখটা অশুভ। বাড়ি থেকে বেরোবার সময় কলা দেখলে অযাত্রা। হাঁচি হলে একটু বসে তারপর বেরোতে হবে। ঠাম্মির এমন অনেক নিয়ম আছে।

মাম রাগ করে, 'এইসব কুসংস্কার অন্ধবিশ্বাস মনকে দুর্বল করে দেয়। এসব কথায় বিশ্বাস করবি না বুবাই। ওইভাবে শুভ অশুভ বলে কিছু হয় না। বড়ো হলে বুঝবি কত ভুল জিনিস শেখানো হয় ছোটোবেলায়।' বারবার বলে মাম। বলে, 'নিয়ম মানা ভালো, কিন্তু নীতি আরো জরুরি। কোন নিয়মগুলো মানলে নৈতিক শিক্ষা হয় সেটা জানতে হবে।'

কিন্তু বন্ধুরা সবাই দু শালিখ দেখলে 'টু ফর জয়' করে।

'আমার শালিখ দেখলেই রাগ হয়, ঘেন্না হয়,' পিপলি বলে।

‘সবাইকে ভালোবাসতে হয়, কাউকে ঘেন্না করতে নেই,’ মাম বলে, ‘এই এক-শালিখ, দু-শালিখ এসব আসলে কুসংস্কার। এসবে একদম বিশ্বাস করবি না বুবাই।’

তবে বুবাই নিজের মতো করে একটা রাস্তা বার করে নিয়েছে। দু-শালিখ দেখলে বন্ধুদের সঙ্গে বুবাইও ‘টু ফর জয়’ করে নেয়। মামকে বলেনি, মাম রাগ করে যদি!

ঠাম্মি খুব খুশি, ‘সংস্কার আর কুসংস্কার কে ঠিক করে দেবে বল? যে নিয়মগুলো মানলে কারো ক্ষতি নেই, মনটায় জোর পাওয়া যায়, মানলেই বা কি? তোর মা রাগ করে কিন্তু আমি তো এই সব মেনে এত বড়ো জীবন কাটিয়ে দিলাম, বল বুবাই?’

সংস্কার-কুসংস্কার বিশ্বাস-অন্ধবিশ্বাস নিয়ে খুব ধন্দে আছে বুবাই। কিন্তু ঠাম্মির কথাটাও মনে ধরেছে। যদি এইসব নিয়ম মানলে কারো ক্ষতি না হয়, তবে? যদি এইসব নিয়মগুলো মানলে পরীক্ষার রেজাল্ট ভালো হয়, স্কুলে সোহম-অবিনাশদের হারিয়ে দেওয়া যায়, তবে?

মাম বলে, ‘ক্ষতিটা সাদা চোখে দেখা যায় না বুবাই। এইসব কুসংস্কার মনকে দুর্বল করে দেয়। অন্ধবিশ্বাস থাকলে মন আর প্রশ্ন করতে শেখে না। এ যে কতখানি ক্ষতি, সবাই বোঝে না। একটা শালিখ পাখি। কী সুন্দর হলদে ঠোঁট, গাঢ় খয়েরি পালক। ওকে দেখলেই ভালোবাসতে ইচ্ছে হবে না?’

বাবি বুবাইয়ের পক্ষ নেয়। মামকে বলে, ‘এখনই এত তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই। বড় হলে নিজে নিজেই সব বুঝতে পারবে বুবাই। তুমি ওকে সংস্কার কুসংস্কার নিয়ে এত চাপ দিও না।’

তখন মামের মুখটা দেখে কষ্ট হয়।

আজ বিকেলে খেলতে যেতে পারেনি বুবাই। খুব ঝড় উঠেছিল একটু আগে। ঠাম্মি বলল কালবোশেখী। গাছে গাছে যত শুকনো পাতা, সব মাটিতে পড়ার আগেই ঘূর্ণি হাওয়ায় ঘুরতে থাকল। এদিক ওদিক থেকে জানলার কাচ ভাঙার শব্দ। মোড়ের চায়ের দোকানের একটা চাল উড়ে দূরে চলে গেল। সোহমদের বারান্দা থেকে বড়ো চাদরটা উড়ে গিয়ে রাস্তায় পড়ল। বড়ো বড়ো গাছের ডালগুলো এমন জোরে জোরে নড়ছে যেন এখুনি গাছটা শিকড় ছেড়ে বেড়িয়ে আসবে।

ঝড় কমে ঝমঝম করে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখছিল বুবাই।

বারান্দার কোনাকুনি পাঁচিল ঘেঁষে একটা বড়ো অশ্বত্থ গাছ। গাছের ডালে ডালে অনেক পাখির বাসা। পাখিগুলো ঝড়ের সময় হুটোপুটি করছিল। এখন চুপ করে বসে আছে। হঠাৎ একটা পাখির বাসা ধুপ করে নিচে পড়ে গেল। ঝমঝমে বৃষ্টির জলে ভালো করে দেখা গেল না। কিন্তু মনে হল, বাসায় অনেকগুলো পাখি আছে। বুবাই মাকে ডেকে দেখালো তখন।

‘আহা রে, ছোটো ছোটো শালিখের বাচ্চা। নীচে পড়ে থাকলে হয় কেউ মাড়িয়ে দিয়ে চলে যাবে, নয় কুকুর বিড়াল খেয়ে ফেলবে।’

বৃষ্টির মধ্যেই ছাতা মাথায় দিয়ে সাবিত্রীমাসি বেরিয়ে গেল। একটা বড়ো পাতা করে তুলে নিয়ে এল বাসাটা। চারটে ছোটো ছোটো শালিখ-ছানা। এখনো চোখ ফোটেনি, পালক গজায়নি, সবে

গায়ে রোঁয়া বেরিয়েছে। হলদে ঠোঁট ফাঁক করে তারা খাবার জন্য আকুলি বিকুলি করতে লাগল। কী যে খাওয়ানো যায়! ওরা তো পোকামাকড় খায়। কী করেই বা তা জোগাড় হবে, কে খাওয়াবে?

'আহা, ওদের মা বাবা এসে খুঁজবে। বৃষ্টি থামলে ওদের বরং গাছে তুলে দিয়ে এসো।' মাম বলল।

তাই হল। বৃষ্টি থামার পর সাবিত্রীমাসি গাছের একটা নিচু ডালে বাসাটা তুলে দিয়ে এল।

একটু পরেই মা শালিখ এসে গাছটা ঘিরে উড়ে বেড়াতে লাগল। কিন্তু কিছুতেই নতুন জায়গায় বাসাটা দেখতে পেল না। যে ডালে আগে বাসাটা ছিল, তার কাছাকাছি উড়তে লাগলো শুধু। কিছুতেই এদিকে দেখতে পেল না। এতো বোকা পাখিটা!

'কাল সকালে ঠিক খুঁজে নেবে। ভাবিস না বুবাই,' মাম বলল।

সকালে উঠে আর এক কাণ্ড। বাসাটা আবার মাটিতে পড়ে গেছে। কে জানে কখন পড়ে গেছে। কুকুর বিড়াল ঠিক দেখতে পেয়ে গেছে। গাছের নিচে ছেঁড়া পালক। দুটো কাক বসে সেইগুলো কুটুরো কুটুরো করে ঠুকরোচ্ছে।

কেঁদে ফেলেছে বুবাই। মাম তক্ষুনি দেখতে গেল। তারপর একটা ছানাকে পাতায় করে তুলে নিয়ে এল। কী করে যেন ও বেঁচে গেছে। খুব ভয় পেয়েছে। কেমন নির্জীব হয়ে আছে। নড়াচড়া নেই।

'বেঁচে আছে। দেখি কী করা যায়,' মাম শালিখের পায়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল, তারপর তুলো দিয়ে দিয়ে ভিজিয়ে দুধ খাইয়ে দিল।

'ওকে দুধ দিও না বউমা, হজম হবে না,' ঠাম্মি বলল। মাম তখন বিস্কুট ভিজিয়ে নরম করে আস্তে আস্তে খাইয়ে দিল ওকে।

খেলনার ঝুড়িটায় তুলো বিছিয়ে তার ওপর নরম কাপড় দিয়ে পাখিটাকে রাখল মা, ' ওকে গরম রাখতে হবে রে বুবাই, দেখছিস ঠাণ্ডায় কেমন কাঁপছে। খড়কুটোর মধ্যে গরম থাকা অভ্যেস। ভয়ও পেয়েছে বোধহয়।' সবিত্রীমাসি টেবিলল্যাম্পটা জেলে দিল পাশে। গরম হবে।

মা-শালিখ ওর খোঁজ নিতেও আসেনি আর। সেই থেকে শালিখ বুবাইয়ের বাড়িতে আছে। ওর নাম হয়েছে টুবাই। এখনো উড়তে শেখেনি, হাঁটি হাঁটি পায়ে আজকাল সারা বাড়ি ঘুরে বেড়ায়।

রোজ সকালে বুবাই স্কুলে যাবার সময় ডানা ঝেড়ে ঝেড়ে টা টা করে টুবাই। আর রোজ টুবাইকে দেখে গিয়েও কী করে বুবাই সব সাবজেক্টে এ-প্লাস পায় তাই দেখে শুনে সবাই অবাক।

'ওয়ান ফর সরো' বলে কিছু হয় না, সবাই বুঝতে পেরেছে।

আজকাল বিকেলে বন্ধুরা এসে টুবাইয়ের সঙ্গে খেলা করে। পিপলি যে পিপলি, সে পর্যন্ত এক শালিখ নিয়ে ঝামেলা করে না। ওইটুকু একটা পাখি, ওকে ভালো না বেসে পারা যায় নাকি?

মেঘা বলে, 'টুবাই আমার জন্যে লাকি। টুবাইকে দেখে গেলে আমার পরীক্ষা ভালো হয়।'

মামকে বলে দিতে হয়নি। নিজেনিজেই সব বুঝতে পেরেছে বুবাই। কুসংস্কার নিয়ে বসে থাকলে টুবাইকে সেদিন বাঁচানো হত না। বিপন্নকে রক্ষা করা শুভ কাজ। তাছাড়া কত পাখি, কত প্রাণিই তো একলা একলা এদিক সেদিক ঘুরে বেড়ায়। বেচারি শালিখের কপালেই এই দুর্নাম কেন? আহা টুবাই! ও কি আর ইচ্ছে করে একলা হয়েছে?

তবে একদিক দিয়ে টুবাইয়ের জন্যে 'ওয়ান ফর সরো' টা সত্যি। ওর ভাইবোনগুলো সব মরে গেল, মা বাবা কোথায় হারিয়ে গেল।

মাম বলেছে, একদিন ও উড়ে যাবে আর ঠিক নিজের মাকে খুঁজে নেবে।

টুবাই উড়ে চলে গেলে বুবাইয়ের খুব কষ্ট হবে, কিন্তু সেই ভালো। আহা তাই যেন হয়। তখন আর টুবাইকে একলা থাকতে হবে না। তখন মা-শালিখ আর টুবাই মিলে সত্যি সত্যি 'টু ফর জয়' হয়ে যাবে।

ছবি: সোমা

গ্রাফিনের কেরামতি

অধ্যাপক জি সি ভট্টাচার্য

‘বলুন মি. গোমেশ, কি করতে পারি আমরা আপনার জন্যে’?

‘আরে বসুন, আমার ভাগ্য যে আপনারা আজ আমাদের স্টলে এসেছেন, নইলে কী যে হত, ভাবতেও পারি না’। ইংরাজিতে কথা হচ্ছিল।

অগত্যা বসতে হলো আমাদের।

বেল বাজালেন মি. গোমেশ আবার এবং বেয়ারা আসতেই ভাঙা হিন্দিতে বললেন, ‘কফি লে আও জলদি, ইস বচ্চে কে লিয়ে দুধ আউর চকলেট।’

‘আবার কফি কী হবে? আমরা যেতে চাই তাড়াতাড়ি. ব্যাপারটা কী যদি বলতেন। যা ঠান্ডা এবারে দিল্লিতে পড়েছে, আমাদের যেতে ও হবে সেই পাহাড়গঞ্জে, সুতরাং- - ’

‘বলছি, তবে কফিটা আসুক না, আপনারা তো বই কিনতে এসেছেন ও কিনেওছেন, তাই- - ’

‘তাই কী? দাম ও পেমেন্ট করা হয়ে গেছে, এমনি পালাচ্ছি না চুরি করে ।’

‘আরে ছি ছি কী যে বলেন ! চুরি আপনারা করবেন কেন? আপনারা তো চোর ধরবেন। ’

মি. গোমেশ যে আমাদের একটা জটিল ব্যাপারে জড়াচ্ছেন তা বুঝতে পারছিলাম আমি, তাই সতর্ক হয়ে বললুম, ‘কাল কথা বললে হয় না? আজ আমরা খুব টায়ার্ড, সারাদিন সায়েন্স কংগ্রেসের ঝামেলা গেছে।’

‘আপনারা ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসের জন্য দিল্লি এসেছেন । তাই বলুন, তা আসবেনই তো, আপনারা না এলে কে আসবে? নিন, কফি এসে গেছে। মি. লিটল বন্ড, তুমি চকলেট দুধ নাও, তারপর কথা হবে।’

ব্যাপারটা একটু খুলে বলি এবার।

প্রত্যেক বারের মতন এবারও আমি সায়েন্স কংগ্রেসে রিসার্চ পেপার পাঠিয়েছিলুম এবং তা এ্যাকসেপ্ট হতে দিল্লিতে যাবার ব্যবস্থা করছিলুম।

আমার ভাইপো চঞ্চল শীতের ছুটিতে বাবা মায়ের সাথে বেড়াতে গিয়েছিল মৈসূর, তাই একার জন্যই টিকিটের ব্যবস্থা করব ভাবছিলুম, তখন ভাগ্য প্রসন্ন হল। চঞ্চলের একমাত্র বন্ধু, আমার আর এক ভাইপো, কুশাগ্র বুদ্ধি ছেলে বাদলকে পেয়ে গেলুম অযাচিত ভাবে। বাদলের মায়ের এক আত্মীয়ের শ্রাদ্ধবাসরে যাবার কথা হতেই তিনি বাদলকে এনে আমার কাছে রেখে গেলেন। শ্রাদ্ধবাড়িতে বাচ্চা ছেলে নিয়ে যেতে তিনি নারাজ। অকল্যাণ হয় নাকি তাতে। আমার তো ভালোই হল। একলা যেতে হল না আর ট্রেনে। ল্যাপটপে ইন্টারনেট চালিয়ে আমার আই আর সি টি সির এ্যাকাউন্টে সেই রাতেই নিজের সাথে তেরো বছরের ছেলে বাদলের জন্যও একটা টিকিট কাটতে বসলুম। ভেবেছিলুম এই ঠান্ডাতে দিল্লির বার্থ পেতে কষ্ট হবে না। ওরে বাবা, সেটি হবার যো নেই। ৩১ ডিসেম্বরে যাব, টিকিট কাটছি ১৫ নভেম্বরে, তখনি লম্বা ওয়েট লিস্ট এ সি থ্রি টিয়ার ক্লাসে। টু টিয়ার এসিতে ও সেই এক অবস্থা।

আমি বিলক্ষণ শীতকাতুরে জীব। বাদল তা খুব ভালো করেই জানে। সন্ধ্যাবেলায় কম্বল মুড়ি দিয়ে বসেছিলুম আমি। এত শীত করছিলো যে কী বলবো কেননা সেবার তখনই বেনারসে এমন ঠান্ডা পড়েছিল যে কহতব্য নয়।খানিক বাদে বাদল বলল, ‘কাকু,তুমি দাও আমাকে। সেকেন্ড ক্লাস স্লিপার তো দেখই নি তুমি! আমি কাটছি টিকিট এক্ষুনি। ’

আমি অমনি কি বোর্ড, মাউস সব ফেলে কম্বল জড়ালুম ভালকরে।

‘দেখো কাকু,পুরো তিরিশখানা বার্থ খালি স্লিপারের, দেখো তুমি শুধু! বেনারসে সব্বাই বড়লোক হয়ে গেছে মনে হয়, তাই এই অবস্থা। কাকু,কাটবে টিকিট?’

‘ওরে বাবা, এই ঠান্ডায় স্লিপার ক্লাস। উঃ। নামেই আমার গায়ে জ্বর আসছে যে!’

‘তবে কী করবে, কাকু?’

‘তুমি এ সি ফার্স্ট ক্লাশে দেখ তো। ’

‘সে তো অনেক ভাড়া পড়বে কাকু। আমারও ফুল টিকিট লাগবে যে! তেরো বছর বয়স হয়ে গেছে। চোদ্দো শুরু আমার! ’

‘তা হও গিয়ে তুমি বড়। আমি ছাড়ছি না তোমাকে। আমার বাদলকে নিয়েই যাব সঙ্গে। ’

‘ও কাকু, নাও। মাত্র দুটো বার্থই আছে খালি এ সি ফার্স্টক্লাসে। ’

‘জয় মা ভগবতী, তবে তো মার দিয়া কেল্লা! কট করে কেটে ফেল দুটোই। আপদ চুকে যাক। আর সব বড়লোকেরা যাক গিয়ে তখন স্লিপারে। ঠাণ্ডাতে হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে। ’

বাদল টাইপ করে প্যাসেঞ্জার ডিটেলস লিখছে ফর্মে তখন। আমার তখন বেশ তন্দ্রার আমেজ এসে গেছে, তা বাদল একটু আরাম আমাকে করতে দিলে তো! বলল, ‘নাও কাকু, এস বি আই পেমেন্ট গেটওয়ে এসে গেছে, ডেবিট কার্ড্ নম্বর,কবে থেকে ভ্যালিড, পিন নম্বর সব দিতে হবে বলছে। কাকু, কম্বল থেকে হাত যদি তুমি না বের করো নেহাৎ, তবে আমাকেই বলে দাও, টাইপ করছি। ’

তাই বললুম। কয়েক মিনিট পরে ই- টিকিট এসে গেল। যাওয়া আসা দুটো টিকিটেরই কপির ডবল প্রিন্ট নিয়ে বললুম, ‘বাঁচলুম, এবারে আমি নিশ্চিত বলতে পারি যে আমরা দিল্লি যাচ্ছি। ’

বাদল বলল, ‘ও কাকু, আজ যত রাত হচ্ছে তত যেন ঠান্ডা বাড়ছে। তুমি যদি একটু সময়ের জন্য আমাকে ছাড়তে, তবে রাতের খাবার আমি তৈরি করে আনতুম। আর রুমহিটারও চালিয়ে দিতুম।’

‘তুমি পারো রান্না করতে?’

‘সামান্য পারি। মায়ের রান্না করা দেখে শিখেছি। আলু পোস্তর তরকারি আর লুচি করে আনছি চটপট করে। হবে তো?’

‘যথা লাভ। তথাস্তু’।

দিল্লি যেতে দেড় মাস বাকি তখন। মাসীমা অবশ্য আমার প্রচুর খরচ হবে বাদলের জন্য তাই বলে আপত্তি করেছিলেন। কিছু টাকাও দিতে চেয়েছিলেন, আমি শুনিও নি, নিইওনি কিছু।

সে যাক গিয়ে, বচ্ছর শেষের দিনে আমরা কাশী বিশ্বনাথ এক্সপ্রেস ট্রেনে উঠে পড়লুম বেনারস ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে গিয়ে । বেলা দুটোতে যখন গাড়ি ছাড়লো, তখনো ও সুয্যিমামার দেখা নেই। মেঘ ও কুয়াশায় চারিদিক আছন্ন হয়ে আছে আর তেমনি দারুণ বরফের মতন ঠান্ডা হওয়া চলছে ।

গাড়ি ছাড়তে বাদল বললো, 'ও কাকু, আমার বিজ্ঞানের গল্পের বই এনেছো তো? ট্রেনে কী পড়বো?'

কোনো বিজ্ঞানের বই আনা হয়নি দেখে খাবার প্যাক করে আনা হিন্দি খবরের 'আজ' কাগজখানা নিয়েই পড়তে বসলো।তা সে পুরনো কাগজ তো কি! ১৮ জুলাই ১৯৯৬ সনের পুরনো কাগজের বিজ্ঞানের পাতাটা নিয়ে মেতে গেলো ছেলেটা আর আমাকে খালি প্রশ্ন করে অস্থির করে তুললো । জিনিয়াস ছেলের যে কত ঝামেলা তা বোঝা গেলো বেশ করে। খালি প্রশ্ন, 'ও কাকু, দেখ না কি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কথা ছেপেছে কাগজে, পড়ে দেখ না! ট্যাগেক্স সিস্টেম কী? ইলেক্ট্রো ম্যাগনেটিক ওয়েভ কী? লি কোম্পানি কোথায়? তুমি তো বিজ্ঞানী। বলো না!'

কোথায় যে একখানা কমিকস্ এনেছি তাই পড়বে বসে ছেলে তা নয়, চঞ্চল হলে এই ঝামেলা হত না। পাতাটা পড়ে আমি যা বুঝলুম কিছু বুঝিয়ে দিলুম, তবে সিস্টেমটা নতুন বলে সবকিছু আমিও জানতুম না ।

রাতে আহার নিদ্রা ভালই হলো তবে সকাল ছ'টার জায়গায় আটটাতে দিল্লিতে নেমে দেখি চিত্তির। কুয়াশাতে সব ঢাকা। সাদা স্টেশন, রাস্তা। কিছুটি দেখা যায় না। টেম্পোও খুব কম আছে। যা আছে তারা ভাড়া চাইছে ডবল। পাহাড়গঞ্জের হোটেল নিউ গনেশ প্যালেস অব্দি যেতেই তিরিশ টাকা নিলো।

কোনমতে শীতে কাঁপতে কাঁপতে তিনতলার ঘরে ঢুকেই বিছানায় গিয়ে শুয়ে কম্বল মুড়ি দিলুম আমি। যা ঠান্ডা! বাদল তাতে রাজি নয়। আমাকে খালি তাড়া দিতে লাগলো, 'ও কাকু, ওঠো না, এই সকালবেলায় কি কেউ শুয়ে থাকে নাকি?। হাত মুখ ধোবে না? কখন তুমি যাবে সায়েন্স কংগ্রেসে?'

'আরে বাবা সে তো কাল। আজ কেন উঠবো এই বরফের মতন ঠাণ্ডার মধ্যে শুনি!'

তা এ তেমন ছেলেই নয়! লেগে গেলো ইমারশান হিটার আর আমার ছোট রুম হিটার বার করতে। ঘরটা এ সি নয়, তাই রুম হিটার এনেছিলাম সাথে। কী করবো? এ সি ঘর হাজার, এগারোশোর নিচে নেই সাধারণ হোটেলেই।

আধঘন্টা পরে ঘর একটু বেশ গরম হলো, জলও গরম করে নিলো বাদল। তখন আমাকে তুলে ছাড়লো বিছানা থেকে সে। খালি ডাক, 'নাও এবার ওঠো তো তুমি কাকু,

দেখো ঘর বেশ গরম হয়েছে আর জল ও বরফের মতন নেই । মুখ হাত ধুয়ে আগে জলখাবার কী আছে দেখি । খাবে তো ! ওঠো না!'

রাগ করে বললুম,' এ তো ভালো মুশকিল হলো আমার, এ ছেলে তো দেখি খালিই ডাকে এই ঠাণ্ডাতে। দেবো এইবার উঠে ঠাণ্ডা জলেতে চান করিয়ে ছেলেকে এখুনি ।'

তা শুনে সে ছেলেটা খালি হাসে । বলে, 'ও কাকু, সে তো করতেই হবে চান। দিল্লির শীত বলে বুঝি –'

না:, এমন হলে কি কিছু করা চলে? বাদলের সাথে পারবার জো টি নেই, দুর্গা বলে উঠতেই হলো আমাকে তখন সেই বিষম শীতের সাথে লড়াই করতে। চান, খাওয়া সব তো করতেই হবে। নতুন বছরে কি উপোস দেবো? বরং খান কয়েক কেক আনিয়ে নিলুম হোটেলের রুম সার্ভিসকে ডেকে।

পরদিন যেতে হলো সায়েন্স কংগ্রেস প্যাভিলিয়নে। প্রথমেই রেজিস্ট্রেশন। ওরে বাবা, দারুণ ঠান্ডার মধ্যে খোলা জায়গাতে সে কি লম্বা লাইন! লাইটও নেই আবার সেদিন। কম্পিউটার অচল। ম্যানুয়াল কাজ হচ্ছে। উ:, দেখেই আমার হয়ে গেছে। তবে বাদল নির্বিকার। একটা প্লাস্টিকের চেয়ার টেনে এনে আমাকে বসিয়ে লাইনে লেগে গেলো ছেলে, পরে চিল্ড্রেন সায়েন্স কংগ্রেসে নিজেরও করিয়ে নিলো রেজিস্ট্রেশন।

বিকেল চারটে বেজে গেলো এই করতে আর তখনি যেন অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। সেখানের ডিনার মাথায় থাক বলে চট করে আমাদের হোটেলে ফিরে আসাও কষ্টকর হলো, এত ঠান্ডা । বাপ রে বাপ, এসেই শুয়ে না পড়লেই নয় মনে হলো আমার, হোটেলেও দেখি লাইট নেই, ঘর গরম হবার ও আশা নেই। বাদল এসেই খাবার দাবার পাঠিয়ে দিতে বলে দিলো আটটার সময়, তারপরে ঠান্ডা জলেই হাত মুখ ধুতে লাগলো ওই দুরন্ত ছেলে। উ:, দেখেই তো আমার হাত পা ঠান্ডা। তা প্রায় রাত দশটার পরে লাইট এলো সেদিন। হিটার চলতে তবে উঠে খাবারের সদগতি করা সম্ভব হলো আমার পক্ষে। খেয়েই শুয়ে ঘুম ।

পরদিন ৩ জানুয়ারি। উদঘাটন হলো সায়েন্স কংগ্রেসের। প্রধানমন্ত্রী এসে গাউন পরে ভাষণ দিয়ে গেলেন সকাল ন'টাতে। আমাদের দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে সাড়ে সাতটাতে বেরোতে হলো ঘন কুয়াশার মধ্যে।

তার পরদিন আমার পেপার ছিলো সেকশনাল সেশানে। পোস্টার প্রেজেনটেশন বলে দেরি হলো না বেশি, পার্টিসিপ্যান্ট অনেকেই আসেননি দেখা গেলো ।

রেহাই পেয়ে হোটেলে ফিরলুম আমরা। ভাবলুম এবার আর যাচ্ছি না, সাত তারিখ পর্যন্ত ছুটি। শেষের দিন গিয়ে সার্টিফিকেট নিলেই হবে। তখন কংগ্রেস চলতো ৮ তারিখ অবধি। তা বাদল কি তাই শোনবার মতন ছেলে নাকি একটা! বলে, 'ও কাকু, চলো দিল্লি বই মেলা দেখে আসি আজ, প্রগতি ময়দানে হচ্ছে, দেখবার মতন জিনিস ।'

আমি কই কম্ম কাবার, এ ছেলেতেই করলো সাবাড়। এই ঠান্ডাতে রাতে আমাকে বলে কিনা ময়দানে যাও! ওরে বাবা, কী করে যাব, প্রগতি ময়দান কি এখেনে! কি গেরো! দরকারটা কী রে বাবা? না, 'সায়েন্সের বই কিনবো। চলো না কাকু!' জিনিয়াস ছেলের না নিকুচি করেছে, আমার রূপকুমার চঞ্চলই ভালো!

যতই রাগ করি, যেতেই হলো। আর সেই গিয়েই এই ঝামেলা ।

টেম্পো ধরে প্রায় চল্লিশ মিনিট ঠান্ডাতে কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে হাজির হলুম

আমরা বিরাট বড় মেলাতে। দারুণ শীত ও হইচই। নিয়নের আলো, লোকজনে ঝলমল করছে সব স্টল। নানান স্টল থেকে বাদল অনেকগুলো মাগ্যাজিন,কমিক্স সব কিনলো।

শেষমেষ ম্যাকগ্র হিল বুক কোম্পানি। খুব বড় পাবলিশার। রাজকীয় স্টল দেখে ঢুকে পড়লুম। বিদেশী কোম্পানি,সব বিষয়েরই বই ছাপে ও বিক্রি করে।

গেট পেরিয়ে কাচের দরজা ঠেলে ঢুকেই লম্বা করিডোর ও হলঘর। নরম সবুজ কার্পেট পাতা। দারুণ সাজানো পুরো এ সি করা হল। কে বলবে দেখে যে মাঠের মধ্যে প্লাইউড দিয়ে তৈরি! একেবারে রাজকীয় প্যালেসের লাইব্রেরি যেন, কাউন্টার পার হয়ে দ্বিতীয় দরজা দিয়ে ঢুকেই সারি সারি কাচ লাগানো আলমারি ডবল তাকের। বিষয় লেখা প্ল্যাকার্ড লাগানো – অর্থনীতি ,রাজনীতি, গণিত,রসায়ন, ভূগোল, শিক্ষা, মনোবিজ্ঞান এইসব নানা বিষয়।

আমি বই বাছতে লেগে গেলুম, তবে সেখানে কোনো পাহারা নেই, যে যার ইচ্ছে মতন বই দেখছে, বেছে নিচ্ছে। মনে হলো কি ব্যাপার, এদের কি বই চুরি যাবার ভয় ও নেই, এত সব দামি বই রয়েছে, দিল্লি কি বিলেত হয়ে উঠেছে নাকি? কে জানে বাবা ..

এজুকেশনাল টেকনোলজি ও সাইকোলজির খান তিনেক বই নিয়ে দেখি দাম প্রায় দেড় হাজার টাকা, দাম লেখা জায়গাতে লাল বর্ডারের চৌকো চকচকে টেপ লাগানো, তাতে দাম ছাপা আছে। নির্ঘাত দাম বাড়াবার জন্যে এই কাণ্ড করা হয়েছে।

এখন করি কি?বই গুলো ছাড়তেও ইচ্ছে নেই আর সঙ্গে আছে মাত্র এক হাজার টাকা । তখন বাদল এসে বললো, ‘ও কাকু, দেখো কয়েকটা ভালো বই পেয়েছি বিজ্ঞানের, তবে সব ইংরিজিতে লেখা, তা তুমি পড়ে আমাকে সব বুঝিয়ে দিও, দাম ও কম। এই দেখো বর্ডার দেওয়া লাল টেপ আটকে দাম লিখে রেখেছে, এটা একশো আর এটা নব্বই আর এটা শুধুই পঞ্চাশ আর শেষেরটা একশো পঞ্চাশ মানে হলো গিয়ে তিনশো নব্বই।’

‘ওরে বাবা, তবে তো সব মিলিয়ে হলো আঠারশো নব্বই। অত টাকা তো আমি আনিনি সঙ্গে।’

বাদল বললো,‘ তুমি এস না কাকু। আমি তো আছি । সেলস্ কাউন্টার এদিকে’ ।

আমার হাত ধরে বাদল নিয়ে এলো সেদিকে। সেখানে দু’জন খুব সুন্দরী ও স্মার্ট মহিলা বসে কম্পুতে কাজ করছিলেন।

‘আসুন স্যার।’

‘এই বই গুলো প্যাক করে মেমো দিন,’ গম্ভীর মুখে বাদল বললো।

‘ও, শিওর স্যার।’

প্রথমজন বইগুলো নিয়ে কম্পুটারে নাম, লেখকের নাম, দাম সব এন্ট্রি করে দ্বিতীয় জনকে দিলেন। তিনি এক এক করে বইগুলো খুলে দাম লেখা টেপ লাগানো দিকটা ঘুরিয়ে ধরে একটা চৌকো মতন যন্ত্রের সামনে ঢুকিয়ে দিতে লাগলেন। লিভারে চাপ দিতেই টক করে শব্দ হতে লাগলো। তারপর তিনি সেগুলোকে অন্য একটা মেশিনে ঢুকিয়ে লিভার টেনে দিলেন, দু’মিনিটেতে পলিথিন প্যাক হয়ে বই এসে গেলো।

কম্পুটার নিয়ে যিনি কাজ করছিলেন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ,‘কী নাম লিখবো স্যার?’

আমি অবাক হয়ে তাদের কাজ ও মেশিন দেখছি দেখে বাদল বললো,‘লিখুন বাদল কুমার।’

শুনেই তিনি যেন একটু চমকে উঠলেন বলে মনে হলো। একটু পরেই তিনি বললেন,‘স্যার, জানতে পারি কি কোন বাদল কুমার? ডিটেকটিভ কি?’

‘হ্যাঁ, মাদাম।’

কথাগুলো সবই ইংরাজিতে হচ্ছিলো অবশ্য। প্যাকেট দুটো দিয়ে তিনি এক্সকিউজ মি বলে চলে গেলেন কোথায় যেন।

অন্য জন বললো,‘স্যার,পনেরশো বারো টাকা হয়েছে দাম।’

‘সে কী, এত কম?’

‘কম নয় স্যার, আমরা সব বইয়ে বিশ পার্সেন্ট করে ছাড় দিই মেলাতে, তাই ।’

মনে মনে বললাম, ‘তা আর দেবে না কেন? দাম তো আগেই বাড়িয়ে রেখে দেওয়া হয়েছে এখন ছাড়ও দিলে। বেশ কাণ্ডকারখানা বটে এদের। ’

ততক্ষণে বাদল পকেট থেকে ষোলোশো টাকা বার করে দিয়ে দিয়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম,‘ বাদল তুমি টাকা কোথায় পেলে?’

হেসে ছেলে বলল, ‘কেন কাকু, সেবার যে আমি মুক্তোর হার খুঁজে দিয়ে অত পুরস্কার পেয়েছিলাম, তার টাকাটা তো সব পড়েই আছে। তুমি তো নিলেই না।

খটাং করে অটোমেটিক মেশিনে ছাপ মারলো একটা, ক্যাশ মেমোতে – পেড। বাকি টাকা ও মেমো নিয়ে বাদল এগিয়ে যেতে আমি বই তুলে নিলাম। বাদল বলল,‘এই রে, সরি কাকু, এদের স্টাইল দেখাতে গিয়ে ভুল হয়ে গেছে। আমাকে মাফ কর কাকু, দাও বই আমি নিচ্ছি।’

‘তাতে আর কী হয়েছে, চল না!’

‘না না, আমার পাপ হবে খুব। তুমি কেন নেবে আমি থাকতে সাথে? দাও দাও— ’ এক হাতে বই নিয়ে অন্য হাতে সে আমার হাত ধরে চললো।

সবে মেন গেটের কাছে গিয়েছি আমরা, পেছনে ডাক শুনে থামতে হলো, ‘ স্যার ।স্যার।’

‘কে?’

তকমা আঁটা উর্দি পরা এক বেয়ারা ছুটে আসছে। কী ব্যাপার রে বাবা? আমরা কি পয়সা না দিয়ে চুরি করে পালাচ্ছি নাকি? এভাবে তাড়া করবার মানে? কি জ্বালা এই বিদেশী স্টলে রে! এমন জানলে কে আসতো?

‘স্যার, এক মিনিট স্যার, ম্যানেজার সাহেব একবার দেখা করতে চান আপনাদের সাথে।’

‘কেন? কী জন্যে শুনি? আমাদের অত সময় নেই। এই দেখো ক্যাশ মেমো। টাকা দেওয়া হয়ে গেছে। চুরি করে পালাচ্ছি না যে ম্যানেজারের সাথে দেখা করতে হবে।’

‘না না, সে কি ? আপনারা তো চোর ধরেন স্যার। ডিটেকটিভ। রিটা দিদিমণি এইমাত্র গিয়ে সাহেবকে সব বললেন। তাই তো সাহেব ডেকে পাঠালেন। না হয় সাহেবকেই ডেকে আনছি আমি এখানে।’

এই সেরেছে! যতই হোক, এদের এখানে এসে এদেরই সাহেবকে তলব করা অভদ্রতা হয়ে যায় বেশি। তাই হতাশ হয়ে বললুম, ‘না তার দরকার নেই, চলো যাই।’

না বাদলকে আমি নাম বলতে দিই তখন, না এই ক্যাঁচাকলে পড়তে হয়। সেই যে বলে না, দেখো যা থাকে কপালে, খন্ডন না হয় গো তাহা গোলকধামে গেলে। এও তাই।

বেয়ারা নিয়ে এসে হাজির করলো এক এসি করা ঘরে, বিরাট বড় কাচে ঢাকা অর্ধচন্দ্রাকৃতি সেক্রেটারিয়েট টেবলের সামনে। উল্টো দিকে রিভলভিং চেয়ারে যিনি সুট বুট,কোট,টাই পরে বসে ছিলেন তিনি হাত বাড়িয়ে উঠে দাড়ালেন দশাসই বপু নিয়ে –

'মোস্ত ওয়েলকাম স্যার,গুড ইভনিং।'

বুঝলুম, ইনিই হলেন কোম্পানির জবরদস্ত ম্যানেজার।

আমাকেও বলতেই হলো, 'ইভনিং'।

'প্লিজ, বি শিতেদ স্যার, মি গোমেশ স্যার। পিতার গোমেশ, এ ভেরি স্মল ম্যান য়্যান্ড ইউ আর বিগ দিতেকতিভ। আই নো, ইউ কেম হিয়ার ইন দিল্লি তু আওয়ার স্তল..ইত ইজ গ্রেত লাক ফর মি। বিগ অপরচুনিতি- - ' সে আর থামেই না।

তারপর কফি এলো।

'কেন ডাকলেন আমাদের এবার তাই বলুন- - '

'বলছি স্যার, রিতা এসে যেই বললো যে মাস্টার লিটল বন্ড বাদলকুমার এসেছে আজ, হাতে হেভেন পেলুম যেন স্যার। স্যার, চুরি হচ্ছে আমাদের স্টলে রোজ।'

'তা আমরা কী করবো? পাহারা বসান।'

'আছে স্যার, তাও আছে জবরদস্ত ।আপনারা তো বই কিনেছেন না?'

'হ্যাঁ, পেমেন্টও হয়ে গেছে ।'

'আপনারা কি দামের টেপটা একটু দেখেছিলেন?'

'কেন দেখবো না? সব বইতেই তো টেপ আটকে দাম বাড়িয়ে বসে আছেন আপনারা, কোথায় মেলাতে দাম কমাবেন তা নয় উল্টে- - '

'না না, দাম বাড়াই নি। উল্টে বিশ পার্সেন্ট ছাড় দিচ্ছি সবাইকে।'

'তবে টেপ লাগিয়েছেন কেন?'

'ওই তো, ওটাই তো আমাদের পাহারাদার স্যার! কী করবো , এত বড় স্টলেতে পঞ্চাশ ষাটটা আলমারি, পাহারা দেবার মতন লোক নেই আমাদের, আর সেটা আমাদের দেশে অভদ্রতাও, তাই অনেক খরচ করে ওই ব্যবস্থা করেছিলাম । অন্য দেশে এতে শপ লিফটিং আটকেছিও, তবে এখানে দেখছি সব বৈজ্ঞানিক চোর, গত সাত দিনে দশ হাজার টাকার বই চুরি গেছে আমাদের, পুলিশও কিছু করতে পারছে না। আমরা ডুবে যাবো। আমার চাকরি চলে যাবে স্যার। আপনাদের কিছু করতেই হবে স্যার, প্লিজ।'

খালি স্যার স্যারের ঠ্যালায় অস্থির হয়ে বাদল বলল,'আপনাদের সিস্টেমটা একটু আগে বলবেন কি আপনি?'

'বলছি স্যার, এই টেপটা কিন্তু সাধারণ দামের চেপি বা স্টিকার নয় ভাই, ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক টেপ। ব্রিটিশ প্যাকেজিং কোম্পানি জনসন অ্যান্ড লির নাম শুনছেন কি?'

'হ্যাঁ। '

'ট্যাগেক্স সিস্টেমে অটোমেটিক মেশিনের সহায়তায় প্রতিটি বইতে এমনভাবে ওই টেপ আটকে দেওয়া হয়েছে যে কেউ ব্লেড দিয়ে চেঁছে বা কেটেও তুলে ফেলতে পারবে না। এই সিস্টেমে ২৫০০০ মিটার লম্বা ও ৬ মিমি চওড়া টেপের বান্ডিল, ডিসপেন্সার আর আটকে দেবার উপকরণ থাকে, সেই একবান্ডিল টেপেতে তিন লাখ বইতে চেপি বা স্টিকার লাগানো হয়ে যায়, খরচ পড়ে হাজার ডলার। বই বাইন্ডিং করাবার সময়েই এটা আমরা করিয়ে নিই। মেশিনে একঘন্টাতে প্রায় ২৫০০০ বইয়েতে স্টিকার আটকে দেওয়া হয়ে যায় অটোমেটিকভাবে। কিছু বুঝতে পারছেন, স্যার?'

বাদল বলল- 'হুঁ, আমি জানি'।

'স্টলে রাখবার আগে আমরা শুধু টেপটাকে সক্রিয় করে দিই ইলেকট্রনিক মেশিনে ঢুকিয়ে দিয়ে, তার ফলে টেপ থেকে অদৃশ্য বিদুৎচুম্বকিয় তরঙ্গ বেরোতে থাকে। আমাদের মেনগেটে এমন একটা সেন্সেটিভ উপকরণ লাগানো আছে, যা সঙ্গে সঙ্গে তাকে বিদুৎ তরঙ্গে বদলে দিতে সক্ষম। তাই গেটের অ্যালার্ম বেজে উঠবে কেউ অ্যাকটিভ টেপের বই নিয়ে গেটের কাছে গেলেই। বিক্রি করবার সময় টেপটাকে নিষ্ক্রিয় করে দিই আমরা আবার মেশিনে ঢুকিয়ে। তাই তখন আর ঘন্টি বাজে না'।

'এতই যদি বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা করেছেন,তবে চুরি হয় কী করে?' আমি জানতে চাইলুম।

'সেইটাই আপনাদের খুঁজে দেখতে হবে স্যার, আমাদের কোন মেশিন খারাপ হয়ে যায় নি কোথাও। আমি খবর পেয়েছি, আজ যে দামী মেডিসিনের বইগুলো নতুন এসেছে, সেগুলো ও দু'তিন দিনের মধ্যেই চুরি হবে, আটকাতে না পারলে কয়েক লাখ টাকার লোকসান হয়ে যাবে আমাদের। কেননা সব ডলারে দাম।'

'যা করতে বলব আপনি করতে পারবেন কি? চুরি যে কিভাবে যে হচ্ছে তা তো বোঝা যাচ্ছে স্পষ্টই,' বাদল বলল।

'কি বলছ তুমি মাস্টার বন্ড্? তুমি সত্যি বলছ?'

'হ্যাঁ, খুব সহজ কাজ চুরি করা, তবে আপনাকে তা আটকাতে হলে কয়েকটা ন্যানো টেকনোলজিক্যাল ইক্যুইপমেন্ট আনাতে হবে কিন্তু।'

‘হয়ে যাবে, ইউ নেম ইট অ্যান্ড উই গেট ইট। আমাদের কোম্পানির মিস্টার গ্যারিফিল্ড আসছেন কাল, আমি যা বলব সব নিয়ে আসবেন, খুব বড় বৈজ্ঞানিকের ল্যাবে কাজ করেন তিনি পেনসিলভ্যানিয়াতে তো! তুমি বল।’

‘একটা কাগজ দিন, লিখে দিয়ে যাই। কাজ হয়ে যাবে আপনার এতেই মনে হয়। ’

কাগজ আসতে তাত খসখস করে কিছু লিখে দিয়ে বাদল বলল, ‘হয়েছে, নিন। আমরা এবারে যাই। রাত হয়ে গেল অনেক তো’।

‘যদি কিছু মনে না করেন তো একটা কথা বলি?’

‘বলুন। ’

‘আমার ড্রাইভার যদি আপনাদের পৌঁছে দিয়ে আসে! অটো এখন পাওয়া মুশকিল হবে আর খোলা অটোতে যেতে কষ্টও হবে আপনাদের খুব। ’

‘অর্থাৎ জানতে চাইছেন আমরা ওইখানেই আছি কি না? ঠিক আছে।’

দামি এসি কারে চড়ে ফিরলুম আমরা যখন, রাত দশটা বেজে গেছে। রাতে খেয়ে দেয়েই ঘুম। বই আর খুলে দেখাও হ’ল না।

পরের দিন আবার যদি পিটার এসে পেটায়, এই ভয়ে কংগ্রেসের আসরেই চলে গেলুম। ন্যানোটেকনোলজির ওপর আরো একটা প্লেনারি সেশান ছিল, লেকচারগুলো শুনলুম বটে, তবে অতি জটিল ব্যাপার। সহজে বোধগম্য হবার নয় বলে মনে হ’ল। সন্ধ্যাতে হোটেলে ফিরে শুনি তিনবার ফোন করেছিল পিটার সাহেব। জ্বালাতন আর কাকে বলে? আজ আর আমি কোথাও যাচ্ছি না এক পা’ও বাইরে। বাদলও বইগুলো পড়ুক ঘরে বসে।

তা একটু আরাম করা আমার কপালে থাকলে তো ! গরমজলে হাত পা ধুয়ে সবে একটু কম্বল মুড়ি দিয়ে বসেছি, এক বেয়ারা এসে হাজির,‘সা’ব, আপকা ফোন আয়া হ্যায়। ’

‘ফোনের না নিকুচি কিয়া হ্যায়। যাব না ধরতে, যাও। ঘরে নেই কেন ফোনের এক্সটেনশান?’

বাদল ছুটল তখনই ফোন ধরতে। বাবা রে বাবা, ছেলে না কাঠবেড়ালি একটা, কে জানে?

ফিরল দশ মিনিট পরে। হাসতে হাসতে বলল,‘কাকু, তোমার কম্বল ফেলো, গরম ড্রেসিং গাউন জড়াও, পিটার সাহেব আসছেন একবার দেখা করতে। আমি কফি ও স্ন্যাক্স পাঠিয়ে দিতে বলে এসেছি তিনি এলেই। ’

‘নাঃ, এবারে আমি দেশত্যাগী হব নির্ঘাৎ এই পিটারের পিটুনি খেয়েই দেখছি। রাতে ফিরেও রেহাই তো নেই দেখি। কি গেরো রে বাবা। ’

আধঘন্টা পরেই উদয় হলেন তিনি। এসেই প্রশ্ন, ‘ হ্যালো স্যার, হাউ আর ইয়ু? এ কী রকম হোটেলে আছেন আপনারা? এখানে আপনাদের মানায় না। চলুন এখুনি। আমি হোটেল অশোকে স্যুট বুক করে দিচ্ছি।

‘থাক, আপনার খবর বলুন ।আগে কফি খেয়ে নিন । এই রাতে আমি কোথাও যেতে রাজি নই জানবেন। ’

‘আমাদের দরকারি জিনিসপত্র সব সকালে এসে গেছে, দিনভোর কাজও চলেছে, স্টল রিজুভিনেট হচ্ছে, নতুন প্রপার্টি কাউন্টার তৈরি হচ্ছে। কাল রেজাল্ট জানা যাবে। আপনারা ক্লান্ত তাই আমিই চলে এলুম স্যার। ’

‘কেতাথথ করলেন। মানে দয়া করে যে আপনি এলেন তাতেই আমি ধন্য। ’

আরও খানিক বকে বিদেয় হলেন তিনি। আমার প্রাণটা যেন বাঁচল। এখন মানে মানে ৮ তারিখটা এলে যেন বাঁচা যায়।

পরদিন আবার তিনি যে এসে হামলা করবেন, তা নির্ঘাৎ কথা। হলোও তাই। বিকেল বিকেলই ফিরে এসেছিলুম সেদিন ঠাণ্ডার ভয়ে। ঠাণ্ডা আরও বেড়েছে সেদিন। তাপমাত্রা মাত্র তিন ডিগ্রি।

তা সেদিন তিনি এসেই আমাদের নিয়ে চললেন অশোক হোটেলে। বললেন, ‘আজ আমার দিন স্যার, সকাল বিকেল দু’বেলা হয়েছে অ্যাটেম্পট। সাকুল্যে চারজন ধরা পড়ে থানায় আটক হয়েছে তারা। প্রায় হাজার ডলারের বই নিয়ে হাওয়া হচ্ছিল। সকালের দু’জনকে তখনই দিইনি পুলিশে। বেঁধে আমার ঘরেই ফেলে রেখে দিয়েছিলাম আমি, যাতে খবরটা গোপন থাকে।

‘অ্যালার্ম বেজেছিল?’

‘হ্যাঁ, মেটাল ডিটেক্টারও সেই সাথে। চোরেরা তো আর ফ্রি প্রপার্টি কাউন্টারে সব কিছু জমা দিয়ে ঢুকবে না । আপনারা ৮ তারিখে ফিরবেনতো! ততদিন আমার কার রইলো ড্রাইভার সমেত আপনাদের জন্য স্যার। ডোমেস্টিক এয়ারপোর্টে সকাল আটটাতে আপনাদেরকে পৌঁছে দিয়ে ফিরে যাবে। এই নিন ফ্লাইটের টিকিট। গুড নাইট, স্যার। ’

তিনি চলে গেলে প্লেনের টিকিটের প্ল্যাস্টিকের ব্যাগটা খুলে দেখি, এয়ার ইন্ডিয়ার দু’টো টিকিটের সাথে একটা তিনলাখ টাকার ব্যাংক ড্রাফট। আমার নামে, ওরিয়েন্টাল ব্যাংকের। কি কাণ্ড!

‘ব্যাপারটা কি হলো,বাদল?’

‘খুব সোজা কাকু, চোরেরা সাথে করে নিয়ে আসত বিশেষ কোন কেমিক্যাল লাগানো ধাতুর পাত, সেঁটে দিত চেপির ওপরে, ব্যস, ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ বন্ধ, অ্যালার্ম ও আর বাজতো না। তাই আমি বলেছিলুম গ্র্যাফিন লাগাতে।’

‘সেটা আবার কী?’

‘ন্যানোটেকনোলোজির ওপর প্লেনারি সেশানে সেদিন যে লেকচার হ’ল তাতে শোন নি কাকু? গ্র্যাফিনের পরমাণু বিন্যাসের স্লাইড ও তো দেখিয়েছিলেন বৈজ্ঞানিক উইলিয়ামস। ছটা করে কার্বন পরমাণু পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে (স্ক্যানিং টানেলিং মাইক্রোস্কোপ ব্যবহার করে) এক পাতলা শক্ত পর্দা তৈরি করা হয়েছে জার্মানির ম্যাক্স প্ল্যাংক প্রতিষ্ঠান ও ইংল্যান্ডের ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানিদের যৌথ উদ্যোগে আজ থেকে বেশ কয়েক বছর আগে। এখন ইউরোপ, ব্রিটেন সর্বত্র ট্রানজিস্টার তৈরির জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে গ্র্যাফিন যা ২০০১ সালে জাপানে তৈরি হয়েছে কার্বন ন্যানোটিউব থেকে। এই পর্দা এত পাতলা যে দু’লক্ষ পর্দা পরপর বসালে তবে তা একটা মোটা চুলের মতন হবে মাত্র। এই গ্র্যাফিন হল দারুণ বিদ্যুৎ পরিবাহী,সুতরাং আমার আইডিয়া ছিল যে যদি এর একটা পর্দা কভারের পিছনের পুরো পাতাটায় বসিয়ে দেওয়া হয় দামের চেপির ওপর দিয়ে, তখন মাত্র তার ওপরে কিছু আটকে দিলেও বিদ্যুৎ চুম্বকিয় তরঙ্গ আটকানো তাইতে আর সম্ভব হবে না, পুরো পাতাটাই না ব্লক করলে। আর এই পর্দা খালি চোখে দেখা ও তো যাবে না যে কেউ বুঝতে পারবে আগেভাগেই আর সেইমতন পাতার জায়গা ব্লক করবে। হিঃ হিঃ হিঃ। কেমন ফন্দি বলো না কাকু? সঙ্গে মেটাল ডিটেক্টার ও অবশ্য লাগানো হয়েছিল আসা যাওয়ার প্রবেশ পথে’।

‘দামি ফন্দি। যার দাম তিন লাখ টাকা আর এই জামাই আদরে রাজকীয় স্যুটে থাকা,এসি কারে চড়ে বেড়ানো, ইচ্ছেমতন দামি খাওয়াদাওয়া করা আর প্লেনে চড়ে বাড়ি ফেরা । ’

হোটেল অশোকের বিশাল ঘরে তখন তিনটে ভার্টিক্যাল হিটার জ্বলছে আর হট এয়ার কনভেক্টার মেশিনের ফ্যান গরমভাব ছড়িয়ে দিচ্ছে আমাদের গায়েতে আরামের উষ্ণ পরশের মতন। পরদিন তাপমাত্রা নেমেছিল দু’ডিগ্রিতে কিন্তু আমার শীতের কষ্ট আর ছিলো না।

জয় হোক ন্যানোটেকনোলজির।

ছবিঃ সৌভিক

ইকিতানি

রতনতনু ঘাটী

নতুন বাড়ি করে এ পাড়ায় আসার পর অনুপমবাবুদের একটাই সমস্যা হয়েছিল। যখন কেউ বাড়িতে আসে, দুমদুম করে দরজায় ধাক্কা দেয়। বাড়িতে একটা ডোরবেল থাকলে ভালো হয়। নানা ঝামেলায় অনুপমবাবু ডোরবেলটা কিনে উঠতে পারেন নি। একদিন একটা ব্যাটারি দেওয়া ডোরবেল কিনে এনে দরজায় লাগিয়েও নিলেন। আর তার কয়েকদিন পরে তাঁদের প্রথম ছেলে হল।

সুখবর পেয়ে পাড়ার লোকেরা ছেলেকে দেখতে আসতে লাগল। সবাই এসে ডোরবেল বাজায়। আর কী সুন্দর ডিং- ডং বেজে ওঠে বেলটা। পাড়ার লোকজন একদিন অনুপমবাবুকে বলল, "আপনার ছেলের নাম রাখুন ডিং- ডং।"

কেউ কেউ মুখ টিপে হাসলেও , ওই ডিং- ডং নামটাই কেমন করে যেন ওর ডাকনাম হয়ে গেল। যেমন হইচই করতে ভালোবাসে ডিং- ডং, পড়াশোনায়ও তেমনই ভালো। এখন ওর মাথায় মজার- মজার নানা বিদ্যে খেলে বেড়ায়। মাঝে-মাঝে আজব ভাষায় কথাও বলে।

সেদিন মণিমাসি এলেন সার্কাস দেখতে যাওয়ার জন্য ডাকতে। ডিং- ডং মাকে বলল, সে যাবে মণিমাসির সঙ্গে। মা'র হাতে কী সব যেন কাজ আছে, তাই মা যেতে পারবেন না। হঠাৎ ডিং- ডং বলে উঠলো, "সার্কাসে তাকামিচি আছে না মা?"

মা আর মণিমাসি এমন ভাষা কখনও শোনেননি। বললেন, "সে আবার কী?"

ডিং- ডং বলে উঠলো, " ও মা! তোমরা তা- ও জানো না? তাকামিচি মানে তো হরিণ!"

স্কুলে ওর নিচু ক্লাসের এক ছাত্রকে একদিন ডিং- ডং বলল, "ইতিমাচু খাবি?"

সে তো এমন ভাষা শুনে একেবারে হাঁ। ডিং- ডং বেশ একচোট হেসে বলল, "কি রে বুঝলি না? ইতিমাচু মানে তো ফুচকা!"

ক্লাসে সেদিন দিদিমণি ডিং- ডংকে বললেন, "বলো তো, ২০০৬ সালটা লিপইয়ার কি না?"

ডিং- ডং চটপট উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "মাকাটিলি।"

দিদিমণি এরকম আজব উত্তর শুনে তো গোটা ক্লাসটাই ওকে নিলডাউন করে রাখলেন। ছুটির পর বাড়ি ফিরতে- ফিরতে ডিং- ডং বিতানকে বলল, "দিদিমণি তো আমার কথাটাই বুঝতে পারলেন না। মাকাটিলি মানে তো লিপইয়ার।"

স্কুলে সেবার বার্ষিক উৎসব। আবৃত্তিতে নাম দিয়েছে ডিং- ডং। ও ভালো কবিতা আবৃত্তি করতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বীরপুরুষ কবিতাটা আবৃত্তি করল।

তারপর ডিং- ডং বলল, "ইকিতানি।"

হেডমাস্টারমশাই পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর রাগী চোখে চোখ পড়তেই ডিং- ডং শ্রোতাদের উদ্দেশে বলল, "আপনারা হয়তো সকলে জানেন না, ইকিতানি মানে নমস্কার!"

ছবিঃ ঋত্বিক

অনুবাদ গল্প

হোয়েন আই ওয়জ ডেড

অমিত দেবনাথ

আমি যেখানে থাকি, সেই রেভেলাল প্রাসাদের এটাই মুশকিল। বাড়িটা আদ্যিকালের। লম্বা লম্বা প্যাসেজ, আলোবাতাস ঢোকে না যেখানে। ঘরগুলো ছাতাপড়া আর স্যাঁতসেতে, এমনকি দেওয়ালে টাঙানো ছবিগুলোর অবস্থা পর্যন্ত খুবই সঙ্গীন। কাজেই এটা আশ্চর্য নয় যে যখন শীতের আগে আগে বাতাস বার বার শনশন করে, গাছের পাতা ঝরে ঝরে পড়ে, প্রবলবেগে জানলার কাচের ওপর আছড়ে পড়ে বাদলধারা, তখন এ বাড়িতে থাকতে অনেকেরই ধাত ছেড়ে যায়। ঝলমলে রোদ্দুরে নৌকাবিহার বেশ মজার। সেই মজাটাই মিলিয়ে যেতে পারে রেভেলাল প্রাসাদে এলে। আর ঐ চা- চক্র! মানে সবাই মিলে একসঙ্গে চা খাওয়ার কথাই বলছি আরকি। সেখানে যদি আলোচনা হয় যে তোমার ঠাকুর্দা একবার ভূত দেখেছিল কিন্তু ভয় পায়নি, যদিও সেই ভূতের গপ্পো শুনে তুমি তখন কাঁপতে শুরু

করেছ, চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, ঝুলে পড়েছে মুখ, আর তোমার তখনকার চেহারা দেখে সেখানে যদি কোন ভূতের আসার ইচ্ছেও থাকে, সেই ইচ্ছেটা মুলতুবি রেখে সে বেচারাও সেখান থেকে তখন লম্বা দিয়েছে। সুতরাং আর বেশি ভনিতা না করে এটা বলাই সমীচীন হবে যে ঐ চা খাওয়ার আড্ডাটাই কাল করেছে আমার পরিচিতদের এখানে থাকতে। এমনকি উইলভার্ন অবধি। যে কিনা ওরকম একটা শক্তসমর্থ মানুষ আর তুখোড় পোলো খেলোয়াড়, সেও কিনা এখানে টিঁকতে পারল না! দোষের মধ্যে আমি শুধু ওকে আমার থিওরিটা বোঝাচ্ছিলাম যে যদি কেউ তার সামনে কয়েকফোঁটা রক্ত, অবশ্যই মনুষ্যরক্ত নিয়ে বসে এবং গভীরভাবে মনসংযোগ করে, তবে সে অচিরেই দেখতে পাবে তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা কোন পুরুষ বা মহিলাকে, যে কিনা সারারাত তাকে সঙ্গ দেবে অথবা দিনের বেলাতেও, যেখানে তাকে দেখা যাওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই, সেখানেও দেখা দিতে পারে। আমার দোষের মধ্যে আমি শুধু আমার এই ধারণাটাই তাকে ভাল করে বোঝাচ্ছিলাম, ও ফট করে আলটপকা একটা মন্তব্য করে বসল। বলে, "অ্যালিস্টেয়ার, আমার মনে হয় এ বাড়িটা ছেড়ে তোমার শহরে গিয়ে থাকা দরকার। তোমার ভালোর জন্য।"

আমি ওর দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম জুলজুল করে। তারপর বললাম, "আমার ভালর জন্য। বটেই তো! শহরে যাব, হোটেলের অখাদ্য খাব, ক্লাবে গিয়ে গুলতানি করব যতরাজ্যের আজেবাজে ব্যাপারে। স-ব আমার ভালর জন্য। না ভাই, তোমার কথা রাখতে পারলাম না। বরং এটা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে তোমার মতলব সম্বন্ধেই আমার সন্দেহ হচ্ছে।"

"সে তুমি যা ভাল বুঝবে করবে, তাতে আমার কিছু বলার নেই, " মেঝেতে পা ঠুকতে ঠুকতে বলল সে, "তবে আমি কালকেই কাটছি- - এখানে আর বেশিদিন থাকলে আমি পাগল হয়ে যাব।"

আমার বাড়িতে শেষ এসেছিল ঐ উইলভার্নই। তারপর কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আর কেউ আসেনি। তো একদিন আমি লাইব্রেরি ঘরে বসে, আমার সামনে কয়েক ফোঁটা রক্ত নিয়ে মনসংযোগ করছি, করছি তো করছিই, এমনকি প্রায় সফল হয়েছিও বলা যায়, এমন সময় একটা ঘটনা ঘটল।

সামনে একটা মূর্তিকে দেখলাম। এক মহিলার মূর্তি। এই মূর্তিকে আমি আগেও দেখেছি। এক বৃদ্ধা, মাথার চুল মাঝখান দিয়ে দুভাগ হয়ে দুপাশের কাঁধে ছড়িয়ে পড়েছে, যার একদিকটা সাদা, অন্যদিকটা কালো। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মহিলার চোখদুটো নেই, ও জায়গাদুটো ফাঁকা। আমি এর আগেও যখন এই মূর্তিকে দেখতাম, তখনই চেষ্টা করতাম চোখের জায়গাদুটো ভরাট করার। কিন্তু সে চেষ্টার মনোসংযোগ করতে গেলেই মহিলার ছায়ামূর্তিটা ভেঙেচুরে হারিয়ে যেত। কিন্তু আজ যখন আমি প্রাণপণ চেষ্টা করছি চোখের জায়গাদুটো ভরাট করার, প্রায় সফলও হয়েছি, তখনই এক ভয়াবহ আওয়াজ শুনলাম, যেন বাইরে কোন ভারী জিনিস পড়ে

গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল দুই কাজের মহিলা, তারা একেবারে আমার চেয়ারের কাছে এসে মেঝের কার্পেটের দিকে ঝুঁকে পড়ল। যেন কিছু দেখছে। কী যে দেখল ওরা, ভগবানই জানেন, কিন্তু যখন ওরা সোজা হয়ে দাঁড়াল, দেখলাম দুজনের মুখই ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেছে এবং দুজনেই হাউ হাউ করে ভগবানের নাম করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

"কী ব্যাপার? তোমরা আমাকে না জিজ্ঞেস করে এ ঘরে ঢুকলে কেন? সাহস বেড়ে গেছে নাকি?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। কেউ কোন উত্তরই দিল না। উল্টে দেখলাম, যত চাকরবাকর ছিল, সবাই এসে প্যাসেজের সামনে জড়ো হয়েছে।

বাড়ির হাউসকিপার হলো মিসেস পেবল। তাকে ডেকে বললাম, "মিসেস পেবল, কাল সকালেই ও দুটোকে বিদায় করবেন আর একজন ভালো কাজের লোক দেখেশুনে রাখবেন।"

দুঃখের বিষয়, আমার এই কথাতেও মহিলা গা করল না। দেখলাম মহিলার মুখটা ভয়ে সাদা হয়ে গেছে। সে বলল, "একি সব্বনেশে কান্ড হল বল দেখি! চল, আমরা সবাই মিলে লাইব্রেরি ঘরে যাই!"

কেউ আমাকে দেখল বা শুনল বলে মনে হল না। কাজেই আমাকেই ওদের পেছন পেছন যেতে হল। যেতে যেতে আমি ওদের কঠোর ভাষায় বলছিলাম লাইব্রেরি ঘরে না ঢোকার জন্য। কিন্তু ওরা তো শুনলই না, বরং সবাই মিলে ঘরে ঢুকে কার্পেটের একটা বিশেষ জায়গা ঘিরে দাঁড়াল। তারপর তিন-চারজন মিলে এমনভাবে টানাটানি শুরু করল, যেন ওরা কোন লাশ তুলছে। অতি কষ্টেই যেন

সেটাকে ওরা তুলে সোফায় নিয়ে ফেলল। সামনে দাঁড়িয়ছিল আমার অনেকদিনের পুরনো বাটলার সোমস। সে হঠাৎ ফোঁপাতে শুরু করল, “বাবুকে আমি খোকা বয়স থেকে দেখছি, আর আজ তার এই হল! মৃত্যু! এত কম বয়সে!”

এবার আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না। সোজা গিয়ে সোমসের কাঁধ ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে চিৎকার বললাম, “কী হচ্ছে কি, সোমস? আমি মরিনি! বেঁচে আছি! শুনতে পাচ্ছ? এই যে আমি!”

তাতেও ওর কোন হেলদোল নেই দেখে ঘাবড়ে গিয়ে বললাম, “সোমস! কী হচ্ছে এসব? তুমি না আমার সঙ্গে কত খেলেছ, আমার ছোটবেলায়? প্লিজ সোমস। একবার বল, আমি বেঁচে আছি!”

সোমস ঝুঁকে পড়ে সোফায় কাকে যেন আদর করল। মিসেস পেবল বললেন, “সোমস, এক্ষুনি কাউকে পাঠাও, ডাক্তার ডেকে আনুক।”

যে ডাক্তারকে ওরা ডাকতে গেল, সেটা একটা গাধা। ব্যাটা একইসঙ্গে ভগবানে বিশ্বাস করে, আবার নিজেকে বলে ‘ম্যান অব সায়েন্স’। সে কারণেই আমি একবার ওকে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছিলাম। কাজেই, এখন যখন ওরা আবার সেই ডাক্তারকেই ডাকতে গেল, তখন আমি মিসেস পেবলের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে ওকে আসতে নিষেধ করে যেতে লাগলাম। কিন্তু সেই চিৎকার, সেই আদেশ বিন্দুমাত্রও ওর কানে ঢুকল বলে মনে হল না।

ডাক্তারকে লাইব্রেরিতে ঢুকতে দেখে আমি ওর গাল টিপে বললাম, “কি

হে, আবার কোন প্রার্থনা শেখাতে এলে নাকি?”

ভ্রূক্ষেপ না করে ডাক্তার সোজা সোফার সামনে হাঁটু গেঁড়ে বসল। কীসব যেন দেখল। তারপর বলল, “মাথার ভিতরের শিরা ছিঁড়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। বেশ কয়েকঘন্টা আগেই মারা গেছে। বেচারা! তোমরা বরং ওর বোনকে আসতে বলে টেলিগ্রাম করে দাও। আমি লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি, বডি গোরস্থানে নিয়ে যাবে।”

“ব্যাটা মিথ্যুক!” আমি চিৎকার করে বললাম, “আমি তোর সামনে দাঁড়িয়ে আছি, আর তুই বলে যাচ্ছিস আমি মরে গেছি।”

মিসেস পেবল আর সোমসকে নিয়ে ডাক্তার বেরিয়ে চলে গেল ঘর ছেড়ে, আমার দিকে একবার ফিরে চাইল না পর্যন্ত।

সারারাত আমি লাইব্রেরি ঘরেই বসে রইলাম। আশ্চর্য ব্যাপার আমার খিদে ঘুম কিছুই পেল না। সকাল হল। লোকজন ঘরে ঢুকল। আমি তাদের বেরিয়ে যেতে বললেও তারা সেসব না শুনে কীসব যেন করতে লাগল, যার কিছুই আমি দেখতে বা বুঝতে পারলাম না। কি আর করা, সারাটা দিন আমি লাইব্রেরি আর সারা বাড়িটা ঘুরে ঘুরেই কাটিয়ে দিলাম। রাত্তিরে দেখি সেই লোকগুলো আবার এসেছে, সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে একটা কফিন। সেটা ঘরে রেখেই ওরা চলে গেল। কাণ্ড খানা দেখে একটু হাসিই পেয়ে গেল আমার। তারপর ভাবলাম এত সুন্দর একটা কফিন খালি পড়ে থাকবে, তার চেয়ে আমিই ওটার মধ্যে শুয়ে ঘুমোই না কেন! তাই করলাম এবং সত্যি বলছি, ঘুমটা যা হল, সে আর বলার নয়। সারা জীবনেও বোধহয় আমি এত গভীর, স্বপ্নহীন ঘুম ঘুমোইনি। সকালেও যখন আমি ওর ভেতরেই শুয়ে আছি, তখন একটা লোক এসে আমার দাড়ি কামিয়ে দিয়ে গেল। আশ্চর্য লোক বটে!

বিকেলের দিকে, আমি যখন সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামছি, নিচের হলঘরে কিছু জিনিসপত্র রাখা দেখে বুঝতে পারলাম আমার বোন এসেছে। ওর বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর ওকে আমি আর দেখিনি। বোন হতে পারে, কিন্তু ওকে আমার কোনদিনও পছন্দ হত না। সুন্দরী তো, খুবই সুন্দরী, সেই গর্বেই ওর পা মাটিতে পড়ত না, খালি সাজগোজ আর পরচর্চা করে সময় কাটাত। আর চাইত, সবাই শুধু ওকেই দেখুক, ওকে নিয়েই আলোচনা করুক। যাই হোক, রাত সাড়ে নটা নাগাদ আমার বোন ঘরে ঢুকল খুব সুন্দর একটা পোশাক পরে, এবং আমি দেখলাম, ও- ও অন্যদের মতোই আমার উপস্থিতি একেবারেই টের পাচ্ছে না। ও যখন কফিনের সামনে- - আমার কফিনের সামনে বসে বালিশে চুমু খেল, তখন আমি আর রাগ সামলাতে পারলাম না। টেবিলে রাখা ছিল একটা সুতো কাটার ছুরি, আমি সেটা তুলে সোজা বসিয়ে দিলাম ওর গলায়।

ও চিৎকার করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে বাইরে দাঁড়াল, “কে কোথায় আছ, শিগগির এস, ” ওর গলায় আতঙ্কের সুর, “মড়ার নাক দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে!”

আমি পাগলের মত ওকে গালি দিতে লাগলাম।

তিনদিনের দিন সকালে প্রবল তুষারপাত শুরু হল। এগারোটা নাগাদ, খেয়াল করলাম, গ্রামের যত লোকসব শোকের কালো পোশাক পরে হলঘরে এসে জুটেছে। এরা নাকি সব শবযাত্রায় যাবে। আমি যথারীতি লাইব্রেরি ঘরে বসে বসে মজা দেখতে লাগলাম। তারপর সবাই এসে কফিনের ঢাকনা বন্ধ করে কফিনটা কাঁধে তুলে নিল। আমি যদিও তখনও বসেই ছিলাম, কিন্তু মনে হল আমার কি একটা যেন ওরা নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেটা যে কী, সেটা বুঝতে পারলাম না। প্রায় আধঘন্টাটাক হবে বোধহয়- - আমি একটা ঘোরের মধ্যে রইলাম। তারপর ভেসে ভেসে হলঘরের দরজার সামনে গেলাম। কোথাও শেষযাত্রার কোন চিহ্ন নেই, তারপর দেখতে পেলাম সাদা বরফের মধ্যে কালো একটা মিছিল এঁকেবেঁকে এগোচ্ছে।

"আমি মরিনি!" আমি গোঙাতে লাগলাম, জমাট, খাঁটি তুষারের মধ্যে মুখ ঘষতে লাগলাম। ছড়িয়ে দিতে লাগলাম সেই তুষার আমার গলায়, ঘাড়ে, চুলে। "ওঃ ঈশ্বর! আমি মরিনি! আমি বেঁচে আছি! বেঁচে আছি!"

[ভিনসেন্ট ও "সুলিভ্যান রচিত "হোয়েন আই ওয়াজ ডেড"অবলম্বনে।]

সপ্তম শ্রেণীর শ্রেণীশিক্ষক জাহিদ হাসান সাহেব শ্রেণীকক্ষে ঢুকে জিজ্ঞেস করলেন, “সবাই হাজির?”

সবাই সমস্বরে জবাব দিল, “হাজির স্যার।”

“গুড! আজ তোমাদের পুঁচকে এক প্রাণীর গল্প শোনাবো। বলতে পারো কেউ ওই প্রাণীটার কী নাম?”

কয়েকজন সমস্বরে বলল, “মাকড়শা স্যার!”

অন্যদের মধ্য থেকে কয়েকজন বলল, “না না মশা স্যার।”

একজন বলল, “উকুন!”

জাহিদ হাসান সাহেব বললেন, “হচ্ছে না, তবে কাছাকাছি হচ্ছে। আরেকটু ভেবে বলো।”

এক মেয়ে বলল, “চিনিখেকো পিঁপড়ে!”

“ভেরি গুড! কে বললো?”

সুমি দাঁড়িয়ে বলল, “আমি স্যার।”

“উত্তর ঠিক হয়েছে। তবে চিনিখেকো বললে কেন?”

“চিনির গন্ধ পেলেই ঝাঁকে ঝাঁকে পিঁপড়ে চলে আসে স্যার। চিনি রাখাই যায় না পিঁপড়ের জন্য। পৃথিবীতে পিঁপড়ের কোন দরকার নেই। ওদের সমূলে মেরে ফেলা দরকার স্যার।”

“চিনি রক্ষা করার জন্য? ”

“জি স্যার।”

“ভুল ধারণা তোমাদের। পিঁপড়ে কখনো চিনি খায় না।”

বিস্মিত সবাই প্রায় একসাথে বলল, “কী বলছেন স্যার! ”

“আমি ঠিক কথাই বলছি। পিঁপড়ে এক ধরনের ছত্রাক খায় যা ওরা নিজেরাই চাষ করে উৎপাদন করে। আর গন্ধ শুঁকে চিনির কাছে যায় শুধু, খায় না। তোমাদের পিঁপড়ে সম্পর্কে অবাক করার মতো দুটো গল্প শোনাব। সুমি বসো।”

সুমি বসলো।

জাহিদ হাসান সাহেব গল্প বলতে লাগলেন। প্রথম গল্পটা এই রকম:

“পিঁপড়েরা গাছের পাতা জড়ো করে বাসা বানানোর সময় খুবই পরিশ্রম করে এবং ত্যাগ স্বীকার করে। আর সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হল প্রয়োগকৃত প্রকৌশল। অবাক করার মতো প্রকৌশলগত প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে ওরা বাসা বানানোর সময়। পিঁপড়েগুলো বাসা বানানোর জন্য ঘন পাতাসমৃদ্ধ ডাল বেছে নেয়। বাসার আয়তনের ওপর ভিত্তি করে পাতার সংখ্যা বেছে নেয় ওরা। পাতা বেছে নেবার পর দুই দলে ভাগ হয়ে যায়। একদল ভেতরের দিকে একদল বাইরের দিকে কাজ করে। অত:পর ওরা পাতাগুলোর প্রান্ত কাছাকাছি আনতে থাকে। এরপর চলে সেলাইয়ের কাজ। বলতে পারো কীভাবে পাতার প্রান্ত সেলাই করে পিঁপড়েগুলো?”

সবাই একসাথে জবাব দিলো, “লালা দিয়ে।”

“গুড! তবে পিঁপড়ের লালা দিয়ে নয়। লার্ভার লালা দিয়ে। সেলাইয়ের পদ্ধতিটাও অবাক করার মতো। বাইরের পিঁপড়েগুলো লার্ভা মুখে নিয়ে দুই পাতার প্রান্ত যেখানে মিশেছে সেখানে আড়াআড়ি ভাবে ঘসতে থাকে। লার্ভার মুখ থেকে নি:সৃত সুতো জাতীয় পদার্থ দ্বারা পাতার প্রান্ত সেলাই হতে থাকে। এখানেই ত্যাগের ব্যাপারটা ঘটে থাকে।

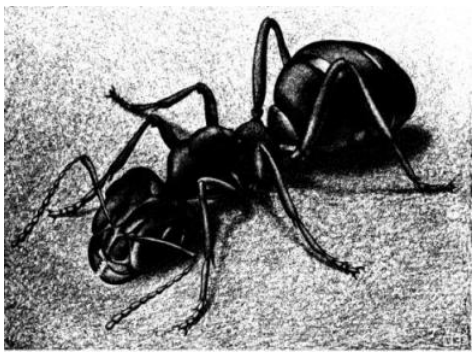

লার্ভাগুলো অজান্তেই এই ত্যাগ স্বীকার করে থাকে। ওদের লালা দিয়ে বাসা সেলাই করায় ওরা স্বাভাবিকভাবে বাড়তে পারে না। তাই বলে পিঁপড়েকূল ওদের ফেলে দেয় না বা মেরে ফেলে না। ওরা আজীবন ওদের লালন পালন করে থাকে। কেমন লাগলো তোমাদের প্রথম গল্পটা?”

সবাই একযোগে বলল, “খুব ভালো স্যর।”

জাহিদ হাসান সাহেব জিজ্ঞেস করলেন,

“তোমরা কি কখনো দেখেছো পিঁপড়ের বাসা?”

ওরা এবারও একত্রে বলল, “না স্যার।”

জাহিদ হাসান সাহেব বললেন, “কীভাবে দেখবে? ঢাকায় কি গাছ আছে নাকি যে পিঁপড়ে বাসা বাঁধবে! এবার শিক্ষাসফরে তোমাদের মধুপুর গড়ে নিয়ে যাবো। বৈচিত্রময় জঙ্গল ওটা। বিভিন্ন ধরণের গাছের সমাহার ওই জঙ্গল। ওখানে তোমাদের পিঁপড়ের বাসা দেখাবো।”

রকিব দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, “পিঁপড়ের বাসা তৈরিতে প্রকৌশলের কথা বলছিলেন স্যার। কিন্তু কোথায় প্রকৌশলগত কাজ করে তা বলেননি স্যার।”

জাহিদ হাসান সাহেব হাসিমুখে বললেন, “বলিনি বুঝি! বাসা তৈরির সময় ওরা লার্ভার লালা দিয়ে যে কাজটা করে সেটাই প্রকৌশলগত কাজ। পাতার প্রান্তসমূহ সেলাই করাটা তুমি আমি পারব না। খুব ভেবেচিন্তে ওরা এই পদ্ধতিটা বের করেছে এবং খুবই সূক্ষ্মভাবে ওরা কাজটা করে থাকে। কোন ফাঁক থাকে না সেলাইয়ে। প্রচন্ড ঝড়ে পুরো বাসা ভেঙে পড়লেও সেলাই খুলে যয় না কখনো। এর প্রধান কারণ হল ওরা কখনো কাজে ফাঁকি দেয় না। ওরা খাদ্য খাওয়ার সময় একে অপরকে ভাগ দেয়। আর তোমরা জানো

পিঁপড়ে নিজের ওজনের কয়েকগুণ বেশি ওজনের বোঝা অনায়াসে বহন করতে পারে।”

“জি স্যার।”

জাহিদ হাসান সাহেব বললেন, “এবার দ্বিতীয় গল্পটা বলি শোন। পিঁপড়ে নিজেরাই চাষাবাদ করে খাদ্য উৎপাদন করে থাকে। ঝুমা বিশ্বাস করতে না পেরে দাঁড়িয়ে বলল, কী বলছেন স্যার! পিঁপড়ে চাষাবাদ করবে কীভাবে? ওরা লাঙ্গল পাবে কোথায়?”

“রকিব বলল, চাষ করতে জমি লাগে, নিড়ানি দিতে হয়।”

জাহিদ হাসান সাহেব একবার হেসে বললেন, “তোমাদের প্রশ্নগুলো ঠিক আছে। তবে চাষ করতে সবসময় জমি লাগে না, লাঙল লাগে না, নিড়ানিও লাগে না। ওরা চাষাবাদের সময় দল বেধে গাছের পাতা ছোটো ছোটো করে কেটে বাসায় নিয়ে আসে। পাতার টুকরোগুলোকে পাশাপাশি সাজিয়ে রাখে। ওরা এক ধরণের ছত্রাকের বীজ সংগ্রহ করে আনে। এই বীজগুলো ওই পাতার ওপর ফেলে রাখে। কিছুদিন পর ওই বীজ থেকে ছত্রাকেরা জন্ম নেয়। ছত্রাকগুলো বড়ো হলে পিঁপড়েগুলো খেতে শুরু করে। পিঁপড়ে কখনো একা বা কাউকে বঞ্চিত করে খাদ্য খায় না। যারা অসুস্থ থাকে বা খাদ্য গ্রহণে অক্ষম থাকে, ওদেরও খাদ্যের ভাগ দিয়ে থাকে। ছত্রাক খাওয়া শেষ হলে বাসা পরিষ্কারে লেগে যায়। পাতার টুকরো এবং ছত্রাকের অবশিষ্টাংশ বাসার বাইরে এনে ফেলে দেয়।”

জাহিদ হাসান সাহেব সবাইকে একবার দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, “কেমন লাগল গল্পদুটো তোমাদের?”

ঝুমা বলল, “খুবই আশ্চর্য লাগছে স্যার।”

“আশ্চর্য লাগার মতোই গল্প দুটো। তবে গল্প দুটো সত্য এবং এ গল্প থেকে অমাদের শেখার বিষয় আছে। কী শেখার আছে বলতে পারো তোমরা?”

রাজীব দাঁড়িয়ে বললো, “পিঁপড়ে খুব পরিশ্রমী।”

“গুড। তুমি বস। আরেকজন আরেকটা বল।”

ঝুমা বলল, “ওরা দলবদ্ধ ভাবে কাজ করে এবং সবসময় একে অপরকে সাহায্য করে।”

“ভেরি গুড! আর কেউ কিছু বলবে?”

রকিব বলল, “আর কিছু খুঁজে পাচ্ছি না স্যার।”

“ওরা চাষাবাদ করে নিজেদের খাদ্য নিজেরাই প্রস্তুত করতে পারে এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। আজ এ পর্যন্তই।”

ছবিঃ সংগৃহীত

ঈশ্বরের নিজের দেশে

২৩/১১/১০

তিনদিবসীয় সফর শেষ করে পেরিয়ারের পথে রওয়ানা হলাম। চার ঘন্টার রাস্তা। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার মধ্যে দিয়ে এক মনোহারি পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে যাত্রা। মুন্নারের থেকে পেরিয়ার ১১০ কিলোমিটার কিন্তু পুরো রাস্তাটাই পাহাড়ি বলে অতটা সময় লাগে।

দুপুরে পেরিয়ার পৌঁছে টাইগার বাংলো নামে বনবিভাগের রেস্টহাউসে থাকবার ব্যবস্থা ছিল। দুপুরের খাওয়া সেরে প্রথমে গাভি নামে একটা ইকো পর্যটনকেন্দ্র দেখতে বেরোলাম। থেকাডি থেকে গাড়িতে প্রায় দু ঘন্টা লাগে। গাভি একটা জলবিদ্যুৎ পরিযোজনা। তার জন্য এখানে একটা বিরাট জলাশয় নির্মিত হয়েছে। পেরিয়ার টাইগার রিজার্ভের লাগোয়া এই এলাকা বন্যপ্রাণীর দিক থেকে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এখানে পর্যটকদের জন্য কেরালা বনবিকাশ নিগম অনেকরকমের প্যাকেজ বানিয়েছেন। তার মধ্যে প্রধান হল স্টে প্যাকেজ এবং ডে প্যাকেজ। ডে প্যাকেজে পর্যটক সকাল সাড়ে আটটার মধ্যে গাভি পৌঁছে যাবেন। সেখানে অভিজ্ঞ গাইড তাঁদের বন, বন্যপ্রাণী, মশলা প্ল্যান্টেশন সব ঘুরিয়ে দেখিয়ে বুঝিয়ে দেবেন। বন্যপ্রাণীর দেখাও মিলতে পারে। দুপুরে ফিরে

এসে লাঞ্চ। তারপর নৌকাবিহার। বিকেলে চা ও স্ন্যাক্স খেয়ে বিদায়। সব মিলিয়ে মাথাপিছু খরচ ন'শো টাকা।

যাঁরা রাতে থাকতে চান তাঁদের জন্য দিনের প্রোগ্রামের পরে গ্রিন কটেজ- এ থাকবার ব্যবস্থা আছে। সন্ধেবেলা এবং সকালবেলা জিপ সাফারিতে জংলি জানোয়ার দেখবার সুযোগ আছে। আরও আছে শবরিমালা মন্দিরের ভিউ পয়েন্ট। পরদিন সকাল আটটায় তাঁদের প্রোগ্রাম শেষ। এই প্যাকেজে মাথাপিছু আরো নশো টাকা অতিরিক্ত অর্থাৎ মাথাপিছু মোট ১৮০০ টাকা খরচ। স্থানীয় আমলারা বললেন যে, পেরিয়ার আসবার পরে পর্যটকরা একদিনের সফরে গাভি আসতে শুরু করেছেন এবং এখন এই ইকো পর্যটন স্থানটির জনপ্রিয়তা বেড়েই চলেছে।

সন্ধ্যাবেলা গাভি থেকে থেকাডি ফেরৎ এলাম। দশ কিলোমিটার রাস্তা টাইগার রিজার্ভের মধ্যে দিয়ে। কয়েকটি জংলি জানোয়ারের দেখাও মিলল।

থেকাডি, পেরিয়ার টাইগার রিজার্ভের হেড কোয়ার্টার। এর সঙ্গে লাগোয়া কুমিলা শহর এবং থেকাডি মিলিয়ে অনেকগুলো হোটেল আর গেস্ট হাউস আছে। আছে বনবাংলো এবং কেরালা টুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের অরণ্য নিবাস। থেকাডিতে আসবার সময় হল আগস্ট থেকে

মে। অধিক বর্ষার জন্য জুন জুলাইতে না আসাই ভালো, যদিও পার্ক বন্ধ হয় না।

আগের সংখ্যায় পেরিয়ারের ইতিহাসের কথা বলবো বলেছিলাম তোমাদের। এবারে সেই কথা শোন। একাদশ শতকে এটি পাণ্ড্য রাজাদের অধীন ছিল। কালান্তরে হাত বদল হয়ে ১৭৭২-এর পরে ত্রিবাংকুরের মহারাজার অধীনে আসে। ১৮৯৫ সালে মাল্লাপেরিয়ার বাঁধ তৈরি হয়। ১৮৯৯ তে পেরিয়ার হ্রদ সংরক্ষিত ঘোষিত হয়। ২৬০০ হেক্টর এলাকা জুড়ে থাকা এই বিশাল জলাশয় আজও পেরিয়ার টাইগার রিজার্ভের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। ৭৭৭ বর্গকিলোমিটার পেরিয়ার টাইগার রিজার্ভের মাত্র ৪৪ বর্গকিলোমিটার পর্যটকদের জন্য খোলা। পর্যটকদের গাড়িতে ঘোরার অনুমতি নেই। তবে হ্যাঁ, নৌকোয় চেপে লেকের বুক থেকে দু'দিকের অরণ্যে বন্যপ্রাণীর অবাধ দর্শন মেলে। হাতি, বাইসন, উদবিড়াল, হরিণ ও ভাগ্যে থাকলে বাঘেরও দেখা মিলে যেতে পারে।

পেরিয়ার টাইগার রিজার্ভের চুয়াত্তর শতাংশ জায়গা জুড়ে চিরহরিৎ বর্ষণ বন, যার ফলে এর শোভা সারা বছরই মনোহারী। এছাড়া বিভিন্ন প্রজাতির পাখি, প্রজাপতি, অর্কিড পর্যটকদের মন ভুলিয়ে দেয়।

পেরিয়ারের আর এক সম্পদ হল এর চারদিকের গ্রামের বাসিন্দা ছয় আদিবাসী সম্প্রদায়। জীবনধারণের জন্য এঁরা পার্কের ওপর নির্ভরশীল।

পার্কের তরফ থেকে ইকোবিকাশ সমিতির মাধ্যমে এঁদের বন্যপ্রাণী সুরক্ষা এবং ইকো পর্যটনের গাইডের কাজে লাগানো হয়েছে।

রাত্রে টাইগার রিজার্ভের বাংলোতে বেশ ভালো কাটলো।

২৪/১১/১০

সকাল সাতটায় তৈরি হয়ে নিলাম। সাড়ে সাতটা থেকে বোট রাইড শুরু হল। পেরিয়ার লেকের ১৪০০ হেক্টর এলাকা জুড়ে পর্যটন জোন। নৌকা বেশ বড়। প্রায় একশোজন যাত্রী যেতে পারেন। লেকের দুপাশে ঘন জঙ্গল। জলের পাড়ে কিছুটা খোলা জায়গা। সেখানে বাইসন, বুনো শুয়োর এবং সম্বর হরিণ দেখা গেল। টিপটিপ বৃষ্টি হওয়ার ফলে সেদিন জংলি জানোয়ার কম বেরিয়েছে। সারে ন'টা পর্যন্ত নৌকাবিহার করে ফিরে এলাম। ব্রেকফাস্ট সেরে কোট্টায়ামের পথে রওয়ানা হলাম বেলা এগারোটায়। চার ঘন্টার পথ। বিকেলবেলা তিনটের সময় কোট্টায়াম হয়ে আরও কুড়ি কিলোমিটার দূরে কুমারাকম পৌঁছে গেলাম। এখানে বিম্বনাদ নামে এক বিশাল লেক। আসলে সমুদ্রের ব্যাকওয়াটারের সঙ্গে এর যোগ আছে। এই লেককে ঘিরে অসংখ্য হোটেল, রিসর্ট এবং হাউজবোট আছে। আমাদের জন্য কেরালা পর্যটন বিকাশ নিগমের হোটেলে আগে থেকে ঘর বুক করে রাখা ছিল।

হোটেলের পরিবেশ সম্পূর্ণ সবুজ। সব কটেজগুলো চার ফুট উঁচু উঁচু পিলারের ওপরে তৈরি এবং তার নিচে জলের আনাগোণা। রুমে যাবার পর আর কোথাও যাবার ইচ্ছে হল না। ঘরে বসে লেকের শোভা দেখে এবং বিশ্রাম করে সময় কাটলো।

২৫/১১/১০

আজ সকালে উঠে বিম্বনাদ লেকে মোটর বোটে করে ঘোরা হল। লেক-এর সঙ্গে যুক্ত একটি ক্যানাল-এ ঢুকে পড়ে দেখি দুদিকে সারি সারি হাউসবোট দাঁড়ানো। এক একটি হাউসবোটে দুটো কি তিনটে করে কামরা। একটি বড়ো পরিবার বা তিনটে ছোট পরিবার একত্রে থাকতে পারে। ভাড়া প্রতিরাত্রে বারো থেকে পনেরো হাজার টাকা। এক একটি কামরার ভাড়া গড়ে পাঁচ হাজার পর্যন্ত।

কুমারকমের কছে নৌকো ভাড়া করে পক্ষিনিবাস দেখতে যাওয়া যায়। সময় কম থাকায় আমাদের যাওয়া হয় নি। দুপুরে খাবার পরে কোচিনের পথে রওনা হলাম। ৪৫ কিলোমিটার দূর কিন্তু রাস্তা খুবই ভালো। কোচিন শহরও একটু ঘুরে নেয়া গেল। বিকেল সাড়ে পাঁচটায় পৌঁছে গেলাম এয়ারপোর্টে। শেষ হল এবারের কেরালা যাত্রা।

শেষ হল ঈশ্বরের নিজের দেশে ভ্রমণের গল্প। এই লেখার প্রকাশ চলতে চলতেই ঈশ্বরের কাছে চিরতরে চলে গিয়েছেন ড: গঙ্গোপাধ্যায়। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি। কিন্তু ভ্রমণ থেমে থাকে না। ভারতের দূর দক্ষিণের কেরলদেশের পর আগামি সংখা থেকে দেবতাত্মা হিমালয়ের পথে পথে ঘুরে বেড়াবার দারুণ সব রোমাঞ্চকর গল্পের ঝাঁপি খুলে আসবেন—কে? নামটা এখন বলবো না। পরের সংখ্যাতেই দেখে নিও।

ছবিঃ সংগৃহীত

বেশি খেয়োনা পেট ফেটে যাবে

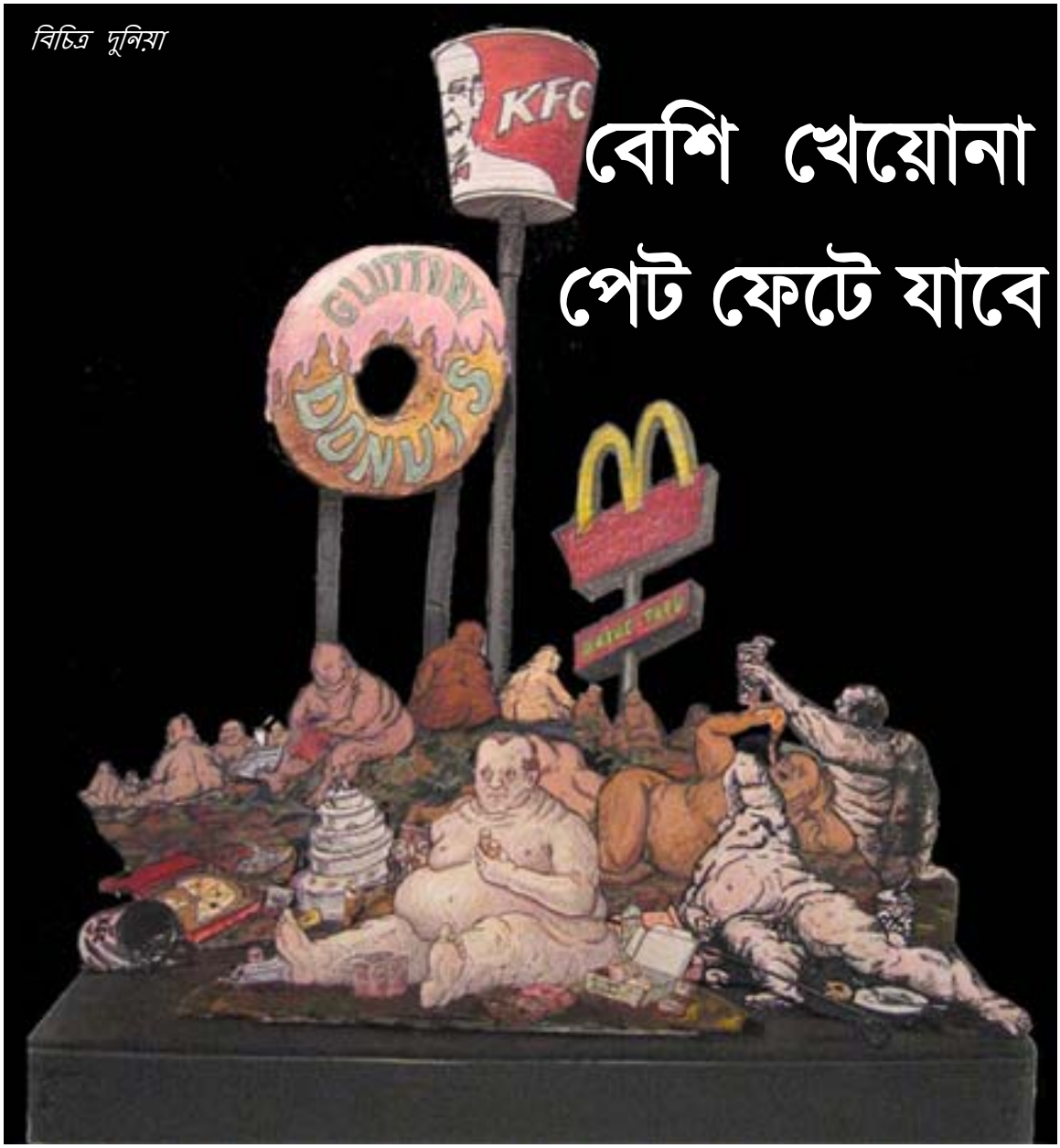

আমরা লোভের অনেক সময়েই বেশি খেয়ে ফেলি। মাত্রাতিরিক্ত খাওয়া মৃত্যুর কারণ হতে পারে। জানাচ্ছেন ***অরিন্দম দেবনাথ***

কিছুদিন আগে পর্যন্ত যে কোন অনুষ্ঠানবাড়িতে বাজি ধরে খাওয়ার রেওয়াজ ছিল। যে যত বেশি খেতে পারত তার সমাদর তত বেশি ছিল। বাড়ির কর্তা খাইয়ে মহাশয়ের সামনে দাঁড়িয়ে ‘এই কে আছিস, রসগোল্লার বালতিটা বাবুর সামনে রাখ। বাবু, এই বালতিটা কিন্তু আপনাকে শেষ করতেই হবে,’ বলে কাকুতিমিনতি করতেন।

বাবু ততক্ষণে পঁচিশটা লুচি, পরিমাণমত বেগুনভাজা আর ছোলার ডাল দিয়ে খেয়ে, তার সাথে একহাঁড়ি পোলাও আর চল্লিশটা মাছ পেটে চালান করে একটা দু কেজির দইয়ের ভাঁড়ও চেটেপুটে শেষ করে ফেলেছেন। রসগোল্লার বালতির দিকে জুলুজুলু করে তাকাতে তাকাতে বলতে হয় তাই বলার মত করে 'না না পারবো না, পারবো না,' বলতে বলতেই বালতিটার ভেতর হাত ঢুকিয়ে চারটে রসগোল্লার রস টিপে একসাথে মুখে ভেতর চালান করে দিয়েছেন।

ভেবো না মিথ্যে বলছি। বাড়িতে বড়দের জিজ্ঞাসা করে দেখো! আগেকার দিনের লোকেরা এরকম করেই খেতো। তখন অবশ্য কেটারিং টেটারিং ছিলো না। তখন বাড়িতে প্যান্ডেল করে, হয় মাটিতে বসিয়ে নয় কাঠের লম্বা টেবিল বিছিয়ে কাঠের চেয়ার পেতে খাওয়ানো হত। আর খাবার পরিবেশন করত বাড়ির বা পাড়ার লোকেরা মিলে। কোমরে গামছা জড়িয়ে হাতে বালতি নিয়ে সে এক হইহই ব্যাপার। মজাটাই অন্যরকম ছিল।

তারও আগে খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারটা ছিলো আরও অন্যরকম। সে সময় কিছু লোক অপেক্ষাই করত কবে কোন বিয়ে , অন্নপ্রাশন বা শ্রাদ্ধের নেমন্তন্ন আসবে। কারণ, শুধু তো বসে খাওয়াই নয়, ছাঁদা বেঁধে পরে খাবার জন্য বাড়িতে নিয়ে আসার রীতিও ছিল।

খাইয়েদের সম্পর্কে এ'রকম গল্পও প্রচলিত আছে যে, কিছু কিছু লোক এমন পরিমাণে খেত যে খেয়ে দেয়ে তাদের হেঁটে যাবার কিংবা দাঁড়াবার ক্ষমতা থাকতো না। তখন তারা বাচ্চাদের মত হামাগুড়ি দিয়ে বাড়িতে ফিরত। আবার কিছুলোককে চৌকিতে শুইয়ে চারজন মিলে কাঁধে করে বাড়িতে পৌঁছেও দিয়ে যেত।

শীতকালে এস্কিমোরাও এমনভাবে খাবার খায় যে ভাবা যায় না। কাঁচা মাংসের ফালি অর্ধেক মুখে অর্ধেক বাইরে ঝুলতে থাকে। একটু একটু করে সেই কাঁচা মাংস গিলে খায় তারা। অবশ্য এটা ওরা করে শীতের হাত থেকে বাঁচতে। পেট ভরা খাবার থাকলে শরীর বেশি গরম থাকে।

অনেক জায়গায় আবার খাওয়া নিয়ে প্রতিযোগিতা হয়। একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট একটা খাবার যে সবচেয়ে বেশি খেতে পারবে সে জিতবে। সেই নির্দিষ্ট খাবারটি কাঁচালংকা থেকে কেক, যা খুশি হতে পারে।

পেটুকরা আবার খাবার নিয়ে অনেক কসরৎও দেখাতে পারে। আমরা যারা সাধারণ লোক, তারা অনেক সময় বলে থাকি,'যা খেয়েছি কি বলব, আর একটু খেলেই পেট ফেটে যাবে। আসলে খাবার সময় তো আর মনে থাকেনা যে কতটা খাচ্ছি! বিশেষ করে সে খাবারটি যদি হয় ঝলসানো মুরগি, গলদা চিংড়ি কিংবা কচি পাঁঠা- - -

কিন্তু খাবার খেয়ে পেট ফাটানো কি সম্ভব? সম্ভব। যদি খুব বেশি পরিমাণ খাওয়া যায় তাহলে পাকস্থলী ফেটে যেতে পারে। বলছেন ইন্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটি স্কুল অব মেডিসিনের সহকারী অধ্যাপক ড: রেসেল ফ্রিম্যান। যদিও এর সম্ভাবনা খুবই কম। কারণ বেশি খেলে সাধারণত বমির আকারে পাকস্থলী অতিরিক্ত খাবার উগড়ে দেয়। তবুও অতিরিক্ত খেয়ে পাকস্থলীর খাবার উগড়ে দেবার ঘটনা ঘটেছে। বেশি খেয়ে মানুষ মৃত্যুর মুখে চলে গেছে তারপর চিকিৎসকরা তাকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে গিয়ে বাঁচিয়েছেন এরকম ঘটনাও মেডিক্যাল জার্নালে লেখা হয়েছে।

২০০৩ সালে জাপানের ওসাকা শহরের একটি গণ- শৌচাগারে একটি ঊনপঞ্চাশ বছর বয়স্ক ব্যক্তিকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল। পুলিশ মৃতদেহ নিয়ে গেল ময়না তদন্তের জন্য। ডাক্তাররা মৃতদেহ কাটাছেঁড়া করে দেখলেন অতিরিক্ত

পানভোজনের ফলে মৃত ব্যক্তির পাকস্থলী তিন জায়গায় ফেটে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে। একটি জায়গায় প্রায় ছ সেন্টিমিটার লম্বা ফুটো পেলেন ডাক্তাররা। তাঁরা বললেন ওই ব্যক্তির পেটে আগে থেকেই আলসার (ঘা- কে ইংরিজিতে আলসার বলে)। অতিরিক্ত খাবার ফলে পাকস্থলীতে খুব চাপ পড়ে ঘায়ের জায়গাটায় ফুটো হয়ে গিয়েই এই বিপত্তি।

১৯৯১ সালে আলাবামা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা বিদ্যালয়ের শল্যচিকিৎসা বিভাগে এক ব্যক্তি আসেন পেটে প্রচণ্ড যন্ত্রণা নিয়ে। ডাক্তাররা সাথে সাথে পরীক্ষা করে জানতে পারলেন, রোগির পাকস্থলি ফুটো হয়ে গেছে; এবং তা হয়েছে অতিরিক্ত খাদ্যপানীয় গ্রহনের ফলে। ডাক্তাররা দ্রুত অপারেশন করে লোকটিকে বাঁচিয়ে দেন। কিন্তু একটু দেরি হলেই হয়েছিল আর কি!

আমাদের পাকস্থলী সাধারণত এক থেকে দেড় লিটার খাদ্যপানীয় সহজেই গ্রহণ করতে পারে। তার বেশি খেলে শরীরে অস্বস্তি হয়, তবে ডাক্তারদের মতে একবারে তিন লিটার পর্যন্ত খাদ্য- পানীয় গ্রহনে সক্ষম একটি পূর্ণবয়স্ক মানুষের পাকস্থলী। কিতু তাতে করে সেই অতিরিক্ত খাদ্যপানীয় গিয়ে যখন পাকস্থলীর পেশিতে চাপ দেবে তখন পাকস্থলীও চেষ্টা করবে উলটো দিকে চাপ দিয়ে সেটাকে বমির আকারে উগড়ে দিতে। ড: ফ্রিম্যান বলছেন, পাকস্থলী ফুটো হওয়া বা ফেটে যাওয়াটা সাধারণত তখনই ঘটে যখন কেউ পাঁচ লিটারের বেশি খাদ্যপানীয় একবারে খেয়েছেন এবং অতিরিক্ত খাদ্যপানীয় বমি করে বেরও করেন নি। এই অবস্থায় পাকস্থলিকে ফাটিয়ে দিয়ে সেই ছিদ্র দিয়ে খাদ্যপানীয় শরীরের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে। ছড়িয়ে পড়ে সংক্রমণ। সময়মত সঠিক চিকিৎসা শুরু না হলে এতে মৃত্যু অবধারিত। ড: ফ্রিম্যান এরকমই একটি কেস স্টাডির কথা বলেছেন। একজন মহিলা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন পেটে অসম্ভব যন্ত্রণা নিয়ে। দেখা গেল তাঁর পাকস্থলী অতিরিক্ত খেয়ে ফেটে গিয়েছে। অপারেশন করে ডাক্তারেরা বারো লিটারেরও বেশি খাদ্যপানীয় বের করেছিলেন তার পেট থেকে। কী লোভি রে বাবা!

সম্পাদকের ডেস্ক থেকেঃ

বেশি খেলে পেট ফেটে যায় অনেকসময় সে তো পড়লে। কিন্তু অধিকাংশ সময়েই বেশি খাবার ফলে পেট না ফাটলেও অন্য একটা বিশ্রি অসুখ হয়। তাকে বলে ওবেসিটি বা মোটা হওয়ার রোগ।

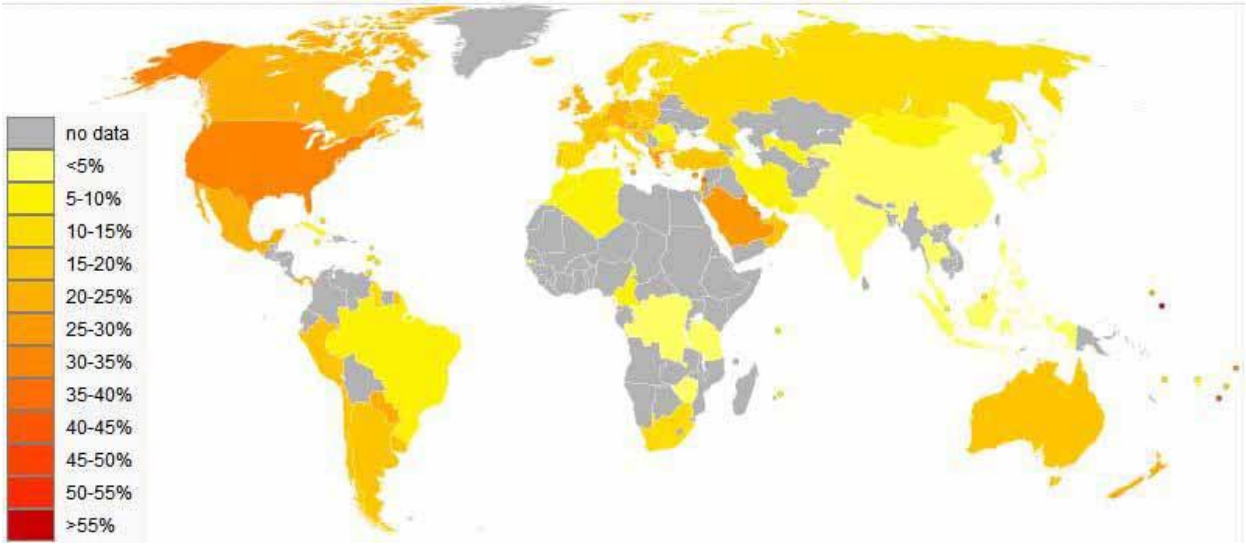

গায়ে থলথলে চর্বি, ইয়াবড়ো ভুঁড়ি এমন সব বাচ্চা- বুড়ো চারপাশে আজকাল অনেক দেখা যায়। বি এম আই { বডি মাস ইনডেক্স—ওজন/(উচ্চতা)^২ । তোমার ওজন যদি হয় ১০০ কেজি আর উচ্চতা হয় ১. ২৫ মিটার তাহলে তোমার বি এম আই হবে ১০০/(১. ৭৫)^২= ৩৩ কেজি। } ত্রিশের বেশি হলে বলা যাবে মানুষটি এই ভয়ানক রোগের শিকার। পৃথিবী জুড়ে এখন এই ওবেসিটি এক মহামারীর চেহারা নিয়েছে। গোটা পৃথিবীর সব মানুষ ধরে হিসেব করলে দেখা যাচ্ছে, ২০০৮- এর হিসেবে প্রায় ৫০ কোটি মানুষ এই মহামারীর কবলে। তবে এর অধিকাংশই রয়েছে ইউরোপ আর আমেরিকার বড়লোক দেশগুলোতে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৩১ শতাংশ মানুষ এই রোগের শিকার। বৃটেনের জনসংখ্যার শতকরা ২৩ ভাগ এই রোগে আক্রান্ত। মহামারী দ্রুত ছড়াচ্ছে গোটা ইউরোপ ও আমেরিকায়। এশিয়ার দুই ধনীতম দেশেও (দক্ষিণ কোরিয়া আর জাপান) শুরু হয়ে গিয়েছে এই মহামারী। দুটি দেশেই জনসংখ্যার শতকরা তিনভাগ এখন এই রোগে আক্রান্ত। শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই (ইউ এস এ) বছরে তিন লক্ষ মানুষের মৃত্যু হচ্ছে এই রোগে। সারা পৃথিবীর সমস্ত বড়লোক দেশের সংখ্যা একত্র করলে এ সংখ্যাটা আরো অনেকগুণ বেড়ে যাবে। অন্যদিকে, গরীব দেশগুলোতে এখনো এই মহামারীর ছায়া পড়েনি তেমনভাবে। সঙ্গে পৃথিবীর ওবেসিটি ম্যাপ দিয়ে দিলাম একখানা। দেখলেই বুঝতে পারবে।

ছবিঃ সংগৃহীত।

আর্যযুগের গণিত

আর্যদের সময়ে এসে শুরুতে অংকের প্রয়োগ হচ্ছিল প্রধানত পুজোআর্চার প্রয়োজনে। মজার কথা, নয়? পুজো করতে আবার অংক লাগে কোথায়? সেই কথাই বলব। আর্যদের পুজো মানে ছিল প্রধানত যজ্ঞ। একখানা বেদি বানিয়ে তার ওপর আগুন জ্বেলে তাইতে ঘি ঢেলে ঢেলে মন্ত্র পড়ে দেবতাদের আরাধনা করা হত সে সময়। এই যে যজ্ঞের বেদি, আর্যদের ধর্মকর্মের নীতিনিয়ম অনুযায়ী এক এক যজ্ঞের জন্য সেই বেদির গড়ণ এক এক রকম হতে হবে। আর, তার মাপজোক নিখুঁত না হলে যজ্ঞের ফল তো মিলবে না- ই উপরন্তু ভগবানের রোষে ক্ষতি হয়ে যেতে পারে যিনি যজ্ঞ করছেন তাঁর।এই নিখুঁত মাপের বিভিন্ন বেদি তৈরির প্রয়োজনেই আর্যরা গড়ে তুললেন এক উচ্চমাণের মাপজোকের গণিতশাস্ত্র। "ভূমির মাপজোক" এর বৈদিক নাম থেকেই গড়ে উঠেছে জ্যা- মিতি শব্দটা (এই জ্যামিতি নামের প্রাচীন আর্য শব্দটার সঙ্গে আধুনিক ইংরিজি ভাষার জিওমেট্রি শব্দটার বিস্ময়কর মিল রয়েছে। ইংরিজিতেও খেয়াল করে দেখবে, জিও মানে পৃথিবী আর মেট্রি মানে পরিমাপ। শুক্ল যজুর্বেদ- এর মধ্যেকার শতপথ ব্রাহ্মণ নামের বইতে নানাজাতের যজ্ঞবেদি গড়বার জন্য প্রয়োজনীয় জ্যামিতিক মাপজোকের বিশদ বিবরণ মেলে। মোটামুটি আঠেরোশ খৃষ্টপূর্বাব্দে তৈরি এই বইতে প্রথম দেখা গেল আর্যরা সিন্ধু

উপত্যকার ইঁট তৈরির প্রযুক্তি জ্যামিতিকে ফের একবার নতুন করে ব্যবহার করতে শুরু করেছেন।

তবে কেবল ধর্মকর্মের জন্যই নয়, আরও নানান সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাজকর্ম চালাবার জন্যও অংকের ব্যবহার শুরু করেছিলেন আর্যরা। কৃষিজ উৎপাদনের সুনির্দিষ্ট অংশ হিসেবে করনির্ধারণ, চাষের ও বসবাসের জমি বিলি, বেচাকেনা, ভাগবাটোয়ারা এইসব করতে গিয়ে ধীরে ধীরে গড়ে উঠলো হিসেব-নিকেশের অংক(পাটিগণিত বা অ্যা্রিথমেটিক), জমির মাপজোকের অংক (পরিমিতি বা মেনসুরেশন)।

অ্যা্রিথমেটিক বা গণিত- এর নানান পদ্ধতি, যেমন ধরো, যোগ- বিয়োগ- গুণ- ভাগ, ভগ্নাংশ, বর্গ, বর্গমূল, ঘন, ঘনমূল এই সব অংকের পদ্ধতি পাওয়া যায় প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে লেখা নারদ বিষ্ণুপুরাণ নামের পুঁথিতে। বলা হয় নাকি স্বয়ং বেদব্যাস এর লেখক।

<u>শূল্বসূত্রের কথাঃ</u>

৮০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে তৈরি হওয়া বৌধায়ন, কাত্যায়ন, মানব, অপষ্টম্ভের শূল্বসূত্র পুঁথিগুলোতে রয়েছে, তারও বহু আগে প্রাচীন যুগের ভারতে আবিষ্কৃত ও ব্যবহৃত রেখা গণিত বা জ্যামিতি এবং অন্যান্য জটীলতর গণিতের নানান তত্ত্বের বিবরণী। এতে এমনকি একটা আয়তক্ষেত্রের (রেকট্যাংগল)সমান মাপের বর্গক্ষেত্র বা ত্রিভূজ আঁকবার পদ্ধতিও দেয়া আছে। বহু পরবর্তী যুগে পিথাগোরাস যে বিখ্যাত ত্রিভূজের সূত্র লিখেছিলেন সেই সূত্রও শূল্বসূত্রের পুঁথিতে পাওয়া যায়। সাধারণত কোন সংখ্যাকে দুটো সংখ্যার অনুপাত হিসেবে সবসময় প্রকাশ করা যায়। যেমন ধরো ৮। একে তুমি লিখতে পারো ১৬/২ কিংবা ৮০/১০ এইরকম নানান উপায়ে। অথবা ধরো ০.৭৫। একে তুমি লিখতে পারো ৩/৪, ২৪/৩২ এইসব উপায়ে। এদের বলে মূলদ সংখ্যা। কিন্তু তোমরা যারা বর্গমূলের অংক শিখেছো, তারা খেয়াল করে দেখবে এমন বহু সংখ্যা আছে যাদের এইভাবে লেখা যায় না। যেমন ধরো √২, বা দুই- এর বর্গমূল। একে তুমি কোনভাবেই দুটো সংখ্যার অনুপাত হিসেবে লিখতে পারবে না।) এই ধরণের সংখ্যাকে বলে অমূলদ সংখ্যা। শূল্বসূত্রে এইসব অমূলদ সংখ্যার বিবরণ আছে, আর তার সাথে আছে এই জাতের যেকোন অমূলদ বর্গমূলের অ্যাপ্রক্সিমেটকে একাধিক মূলদ সংখ্যার যোগফল হিসেবে প্রকাশ করা। উচ্চতর গণিতের এই পদ্ধতি সাহেবি অংকে টেলর সিরিজ নামে পরিচিত। টেলর সাহেব তাঁর এই পদ্ধতি আবিষ্কারের বহু আগেই তা তৈরি করে শূল্বসূত্রের পুঁথির পাতায় লিখে রেখে গিয়েছেন আর্য বৈজ্ঞানিক।

আর্য সংস্কৃতিতে গণিতের জন্ম মূলত ব্যবহারিক প্রয়োজনে। জমির মাপজোক থেকে শুরু করে যজ্ঞবেদির গঠন এইসব কাজে ব্যবহারের জন্য তার সৃষ্টি। কিন্তু এই অমূলদ সংখ্যার গণিত ও সেই সম্বন্ধীয় উপপাদ্যগুলো কিন্তু সে জাতের অংক নয়। এ

ছিল সাধারণ ব্যবহারিক গণিতের চেয়ে গভীরতর বিশুদ্ধ গণিতের চর্চার সূচনার প্রমাণ। এর মধ্যে দিয়েই সূচনা হয়েছিল সংখ্যার চরিত্র নিয়ে গভীরতর অনুসন্ধান। খোঁজ শুরু হয়েছিল তার অন্তরে লুকিয়ে থাকা গণিতের উৎসবীজের। বীজগণিত নামের সেই গণিতচর্চার ধারা পরবর্তী সময়ে আরবদের হাত ধরে এল- জেব্র- ওয়াল-মুকাবলা নাম নিয়ে পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়ে। আজ আমরা তাকে অ্যালেজেব্রা নামে জানি।

ক্রমশ

মাথে মে ট্রিকস্

যে কোন দু- অংকের সংখ্যার বর্গ বের করা বেজায় সহজ কাজ। এইভাবে করবেঃ

<u>ধরো ৪৭ এর বর্গ করতে হবে।</u>

প্রথম ধাপঃ ৪৭- এর সবচেয়ে কাছের দশের গুণিতক হল ৫০। এটি ৪৭এর চেয়ে ৩ বেশি।

দ্বিতীয় ধাপঃ ৪৭- এর চেয়ে ৩ কম করলে পাব ৪৪।

তৃতীয় ধাপঃ ৪৪- কে ৫০ দিয়ে গুণ করো (৫ দিয়ে গুণ করলে হবে ২২০। তার পেছনে একটা শূন্য জুড়লে ২২০০)। পাবে ২২০০।

চতুর্থ ধাপঃ ৪৭ এর সবচেয়ে কাছের গুণিতক তার চেয়ে ৩ বেশি। এই ৩ এর বর্গ করো। পাবে ৯

পঞ্চম ধাপঃ ২২০০+৯=২২০৯ হলো ৪৭ এর বর্গ।

<u>এবারে আর একটা উদাহরণঃ ৮৮- এর বর্গ।</u>

সবচেয়ে কাছের দশের গুণিতক ৯০। তফাৎ হলো ২।

৮৮- র চেয়ে ২ কম হলো ৮৬।

৮৬ আর ৯০- এর গুণফলঃ ৭৭৪০

২ এর বর্গ=৪

অতএব ৮৮- র বর্গ হলোঃ ৭৭৪৪।

নানান দেশের এক দুই তিনঃ

কন্নর ভাষায় এক দুই তিনকে এইরকম নামে ডাকেঃ

০=সনে (೦), ১=ওন্ডু (೧), ২=এরাডু(೨), ৩= মুরু (೩), ৪= নালকু(೪),৫=আইডু(೫), ৬=আরু(೬), ৭=এলু (೭), ৮=এনটু(೮), ৯=ওমভাটু(೯) ১০=হাট্টু (೧೦)

কয়েকজন অতিপ্রাচীন বৈজ্ঞানিক

টুপুর

খ্রিষ্টজন্মের বহু আগেই ভারতে বিজ্ঞানের চর্চা চলত এমন প্রমাণ পাওয়া যায় নানা পুরোন নথি থেকে। সে সময়ে হয়তো টেলিস্কোপ দিয়ে গ্রহ নক্ষত্রের গতি জানার উপায় ছিল না, কিন্তু অন্য বিভিন্ন উপায়ে খালি চোখে রাতের আকাশ পর্যবেক্ষণ করে নক্ষত্রপুঞ্জকে চিহ্নিত করা হত এবং তাদের গতিবিধি বোঝার চেষ্টা করা হতো। এমনকি সেই সমস্ত চেষ্টা থেকে পৃথিবীর বুকে ঘটতে থাকা নানা প্রাকৃতিক ঘটনা, যেমন ঝড়- বজ্র- বৃষ্টিপাত কিংবা মহামারীর প্রাদুর্ভাব বা খরা- বন্যা- ভূমিকম্প, যা মানুষের জীবনকে নাড়া দেয়, তা ব্যাখ্যা করার উপায় খোঁজা হত। শুরুর দিকের সেইসব চেষ্টার কোনো কোনোটা হয়ত আজ অর্থহীন বা ব্যর্থ মনে হতে পারে। কারণ চারপাশের ঘটনার কারণ মানুষ খোঁজে প্রয়োজনের তাগিদে, কখনো কখনো স্বভাবেও; আর খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে যায় একটা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা, যেটা পরে হয়তো আরও জ্ঞান বাড়লে ভুল বলে ধরা পড়ে। কিন্তু এরকমই একেকটা ভুল অতিক্রম করে তবে আজকের যে ব্যাখ্যা ঠিক বলে মনে হয় তাতে পৌঁছেছে মানুষ।

খ্রিষ্টজন্মের প্রায় নশো বছর আগেও মনে করা হতো যে মানুষের জীবনযাপনকে নাড়া দেয় এমন প্রাকৃতিক ঘটনাগুলোর মূলে রয়েছে নক্ষত্রপুঞ্জের নিয়ন্ত্রণ। সেই সময়ে আরও মনে করা হতো যে নানা রকম যাগযজ্ঞ করেই প্রাকৃতিক ঘটনার প্রকোপ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। সেই জন্য জরুরি ছিল ঠিক সময়ে ঠিক যজ্ঞ করার তিথি, দিন, ক্ষণ নির্ধারণ করা। তিথি

মানে এক একএকটি চান্দ্র দিন। (চাঁদ প্রতিদিন এক কলা করে বাড়তে বাড়তে পনেরো দিনে পুর্ণাঙ্গ হয় (পুর্ণিমা) ও তার পর প্রতিদিন এক কলা করে কমতে কমতে পনেরো দিনের মাথায় অদৃশ্য হয়ে যায় (অমাবস্যা)। এই যে ত্রিশ দিন, তাকে বলি এক চান্দ্র মাস। নক্ষত্রপুঞ্জের অবস্থান বা একাধিক নক্ষত্রপুঞ্জের অবস্থানের সমাহার বিভিন্ন তিথিতে বদলে যায়। মনে করা হত আমাদের সব কাজকর্মের ওপরে এই নক্ষত্রপুঞ্জের বিভিন্ন অবস্থানের বিশেষ ভূমিকা আছে। সেজন্য দিন আর ক্ষণের আগে নির্ধারণ করতে হতো তিথি। নানারকম অঙ্ক কষে এই সমস্ত তিথি নির্ধারণ করা হত। কাশ্মীর উপত্যকাবাসী লগধ ছিলেন এই সময়ের বিখ্যাত গণিতবিদ যিনি সেই সময়ে কাজে লাগত এমন সব তিথি নির্ধারণ করে ও সেই তিথি অনুযায়ী বৈদিক যাগযজ্ঞের দিন, ক্ষণ নির্ধারণ করে সূত্রাকারে প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর রচিত সূত্রগুলি "জ্যোতিষ বেদাঙ্গ" নামে প্রচারিত হয়েছিল। এই গ্রন্থনার জন্য লগধকে প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্বিদদের মধ্যে অন্যতম বলে মনে করা হয়।

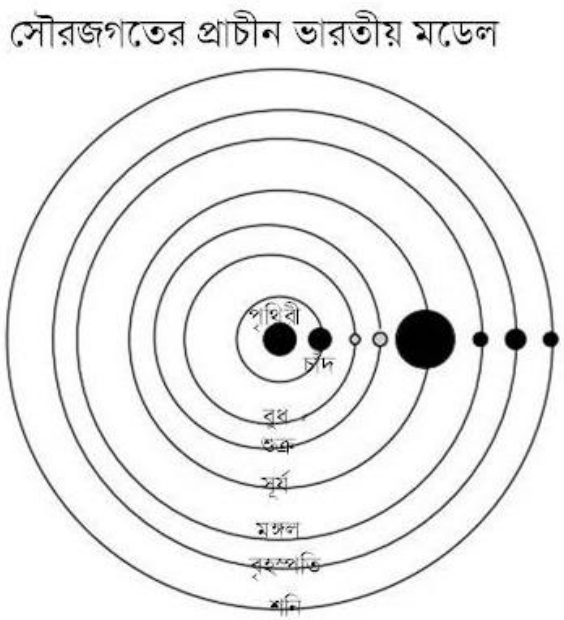

পৃথিবীর নানা প্রাকৃতিক ঘটনার মূলে যেহেতু বিভিন্ন নক্ষত্রপুঞ্জের অবস্থানের প্রভাব রয়েছে বলে মনে করা হতো সেহেতু যাবতীয় নক্ষত্রপুঞ্জকে চিহ্নিত করে তাদের বার্ষিক পরিক্রমা পথ বর্ণনা করা জরুরি ছিল। বহু শতক ধরে প্রাচীন ভারতের জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও গণিতজ্ঞরা সেই চেষ্টা করে চলেছিলেন। খ্রিষ্টজন্মের দুশ বছর আগে এই প্রয়োজনীয় কাজটা করে ফেলেছিলেন গর্গ। প্রাচীন ভারতের জ্যোতির্বিদদের মধ্যে তাই গর্গের কীর্তি আজও অমলিন।

ভারতের গণিতজ্ঞদের মধ্যে আরেকজন ছিলেন কল্বন বংশীয় মেধাতিথি। মেধাতিথির কথা জানা যায় ঋক ও যজুর্বেদ থেকে। সেখানে উল্লেখ আছে যে সুপ্রাচীন কালেই এই গণিতজ্ঞ একহাজার কোটি স্থানীয় অঙ্কের

সংখ্যাকে শব্দে লিখে প্রকাশ করেছিলেন। যিশু খ্রিষ্টের জন্মের দুশ বছর আগে ভারতের গণিতজ্ঞরা বৈদিক গণিতবিদ মেধাতিথির দেখানো উপায় অনুসরণ করে স্থানীয় মানের পাটীগণিত(ঐ যাকে আমরা একক- দশক- শতক কিংবা ইংরিজিতে ইউনিট- টেন হান্ড্রেড- থাউজেন্ডের প্লেস ভ্যালু বলে জানি) তৈরি করেছিলেন, যাতে উচ্চতর স্থানের অঙ্ক নিম্নতর স্থানের থেকে দশগুণ। অঙ্ক শেখার শুরুর ধাপেই এখনও শিখতে হয় স্থানীয় মানের পাটীগণিত।

এই জন্যই মনে করা হয় যে আধুনিক বিজ্ঞানের অঙ্কুর জাগিয়ে তুলেছিল প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানচর্চা।

ছবিঃ সংগৃহীত

বিচিত্র জীবজগত

নারকেলি কাঁকড়াঃ

ভালো নাম
বারগাস ল্যাট্রো।

প্রশান্তমহাসাগর,
ভারত মহাসাগর,
বঙ্গোপসাগরের
নানা
নারকেলগাছ
ভরা দ্বীপে এদের
বাস।

তিন ফুট অবধি
বড়ো হয়।

তিরিশ থেকে
ষাট বছর বাঁচে।

ডিম পাড়তে
ছাড়া সমুদ্রে
নামে না।

দুর্দান্ত গন্ধ শোঁকার ক্ষমতা।

মা কাঁকড়া পেটের তলায় আঠা লাগিয়ে তাতে ডিম আটকে ঘুরে বেড়ায়। ডিম ফোটবার সময় হলে সমুদ্রে গিয়ে ছেড়ে আসে।

নারকেল গাছে উঠে নারকেল পেড়ে খোসা ছাড়িয়ে , ভেঙে তার শাঁসজল খায় তারপর অনেকসময় নারকেলের খোলাটা পেটে লাগিয়ে ঘোরে। তাছাড়াও পচা মাংস, কলা খেতেও ভালোবাসে।

বিজ্ঞানিরা বলেন, প্রশান্ত মহাসাগর বিমানে চেপে একলা পার হতে গিয়ে হারিয়ে যাওয়া মহিলা বৈমানিক অ্যামেলিয়া ইয়ারহার্টের কোন চিহ্ন খুঁজে না পাবার কারণ সম্ভবত, এই নারকেলি কাঁকড়ারা তাঁকে চেটেপুটে খেয়ে ফেলেছিলো।

ছবি- সংগৃহীত

টেকনো টুকটাক

ক। সুপার স্কাইসাইকেল

ছোট ছোট জাইরোপ্লেন বিক্রি হচ্ছে আজ অনেকদিন হল। প্লেনগুলো অ্যাসেম্বলি কিট হিসেবে কেনা যায়। বাড়িতে এনে জোড়া লাগিয়ে নিলেই তৈরি। বাড়ির ছাদ বা উঠোন থেকে স্বচ্ছন্দে উড়ে পড়া যায় এই মিনিপ্লেন-এ। সঙ্গে জাইরোপ্লেন-এর একটা ছবি দিলাম। এ প্লেনগুলো শখের আকাশভ্রমণেই কাজে

লাগছিলো এতদিন। দৈনন্দিন কাজে তাকে লাগানো মুশকিল ছিলো। তার জন্য দায়ী এর বিরাট রোটর (মাথার ওপরের পাখা যেটা ঘুরে ঘুরে প্লেনটাকে আকাশে তোলে।)। ওই রোটরের জন্য জাইরোপ্লেন সাধারণ গ্যারেজে রাখা যায়না। ফলে রোজকার ব্যবহারের জন্য তাকে কাজে লাগানো যাচ্ছিলো না এতদিন। বাটারফ্লাই এল এল সি কম্পানির ল্যারি নিল এইবারে তৈরি করে ফেলেছেন ফোল্ডিং রোটর লাগানো জাইরোপ্লেন। ফলে যে জিনিসটা দাঁড়িয়েছে তার নাম দেয়া হয়েছে সুপার

স্কাইসাইকেল। এমনিতে জিনিসটা একটা তেচাকা মোটর সাইকেল। চালাতে চালাতে রাস্তায় যদি ট্র্যাফিক জ্যামে আটকে যান চালক তাহলে কয়েকটা সুইচ টিপলেই মাথার ওপর খুলে যাবে বিরাট রোটর, পেছনের চাকা থেকে ইঞ্জিনের শক্তি ঘুরে যাবে পেছনের প্রপেলার- এ, আর টুক করে আকাশে উঠে পড়ে ঘন্টায় আশি মাইল গতিতে উড়ে যাবে স্কাইসাইকেল।বাড়ির কাছাকাছি কোথাও একটা নেমে এসে (২০ ফিট জায়গাই যথেষ্ট) পাখা গুটিয়ে দিব্যি তিনচাকা স্কুটার হয়ে বাড়ি ফেরা। গ্যারেজটা শুধু সাত ফুট উঁচু হলেই হবে। স্কাইসাইকেল দিব্যি এঁটে যাবে সেখানে। দাম প্রায় আটত্রিশ হাজার ডলার অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ২০ লাখ টাকা। আর একটা সুবিধে হলো, একে এরোপ্লেন হিসেবে রেজিস্টার করবার ঝামেলা নেই। স্কুটার হিসেবেই লাইসেন্স নেয়া যাবে। কিনবে নাকি? তাহলে এই ঠিকানাদুটোতে যোগাযোগ করতে পারোঃ

http://www.thebutterflyllc.com/sscycle/sscycle.htm

http://www.airframer.com/aircraft_detail.html?model=Super%20SKy%20Cycle

স্কাইসাইকেলের ওড়া দেখতে হলে এইখানে দেখোঃ

http://www.youtube.com/watch?v=L5VW2PQva-M

।খ। ই- ভোলো- র ইলেকট্রিক মাল্টিকপ্টারঃ

এ যন্ত্রটা অবশ্য স্কাইসাইকেলের মতো এখনো বাজারে কিনতে পাওয়া যাচ্ছেনা। একটা রাবারের ফাঁপা বলের সংগে হালকা ফ্রেমে ষোলোটা ছোট ছোট ইলেকট্রিক রোটর লাগিয়ে তৈরি এই মাল্টিকপটার প্রথম মানুষ নিয়ে উড়লো গত অক্টোবর ২০১১ তে। একটা ছোট কম্পিউটার এই ষোলটা রোটরের ঘূর্ণনকে নিয়ন্ত্রণ করে মাল্টিকপ্টারকে চালায়। চালক কোন কিছু না ছুঁলে মাল্টিকপ্টার যেখানটায় আছে ঠিক সেইখানটাতে ভেসে থাকবে স্থির হয়ে। প্রচলিত উড়াণ প্রযুক্তির থেকে সম্পূর্ণ আলাদা প্রযুক্তিতে তৈরি এই মাল্টিকপ্টার ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বাজারে আসতে এখনো কয়েক বছর দেরি আছে।

ছবিঃ সংগৃহীত

বান্দিপুরা জাতীয় উদ্যান

সংহিতা

নীলগিরি বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ কর্ণাটক রাজ্যের যে অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে তার অন্যতম হলো বান্দিপুরা জাতীয় উদ্যান। বান্দিপুরা জাতীয় উদ্যানের লাগোয়া কর্ণাটকের নাগেরহোল কিংবা তামিলনাড়ুর মুদুমালাই সংরক্ষিত বনাঞ্চলও নীলগিরি বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের অংশ। সুতরাং বান্দিপুরা বন্যপ্রাণ চলাচলের করিডর হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ।

বান্দিপুরা জাতীয় উদ্যান কর্ণাটকের চামারাজেন্দ্র জেলায় অবস্থিত। ১৯৩০ সালে রাজা ভুডালিয়ার মৃগয়া খেলার জন্য বন্য জন্তু ভরা বান্দিপুরার বনের ৯০ বর্গ কিলোমিটার এলাকাকে গেম রিজার্ভ হিসাবে চিহ্নিত করেন। পরের বছরই এই বনাঞ্চলকে অভয়ারণ্য হিসেবে গড়ে তোলার জন্য রিজার্ভ ফরেস্ট হিসেবে ঘোষণা করা হয়। তখন এর নাম ছিল ভেনুগোপাল ওয়াইল্ড লাইফ পার্ক। তবে শুরুর ৯০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা থেকে ১৯৩১ সালের সংরক্ষিত এলাকার বিস্তার দাঁড়ায় ৮০০ বর্গ কিলোমিটার। তার প্রায় চার দশক পরে ১৯৭৩ সালে বান্দিপুরার অভয়ারণ্য এলাকাকে আরেকটু বিস্তৃত করে মোট ৮৮০ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় শুরু হয় প্রজেক্ট টাইগার। পরের বছরই সমস্ত প্রজেক্ট টাইগার এলাকাকে জাতীয় উদ্যানে উন্নীত করা করা হয়।

বান্দিপুরার আরেকটা ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। ভারতে ইনফ্রা রেড ক্যামেরা দিয়ে জন্তুদের ছবি তুলে সংখ্যা গোণার কাজ এখানেই শুরু হয়েছিল। উদ্যোক্তা ছিলেন শ্রী উল্লাস করন্থ। বান্দিপুরা জাতীয় উদ্যানের প্রকৃতি বীক্ষণ কেন্দ্রে এসব কথা খুব যত্ন করে জানানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বান্দিপুরা জাতীয় উদ্যান পশ্চিমঘাট পর্বতমালার পাদদেশে অবস্থিত। এই বনাঞ্চলের সবথেকে নীচু এলাকা সমুদ্রতল থেকে ৬৮০ মিটার উঁচু আর সবথেকে উঁচু এলাকা সমুদ্রতল থেকে ১৪৫০ মিটার উঁচু। ফলে প্রায় ৮০০

মিটার উচ্চতার তফাতে বিচিত্র গাছপালা আর বিচিত্র প্রাণীজগৎ গড়ে উঠেছে। এই বনাঞ্চলের কিছুটা শুষ্ক পর্ণমোচী আর কিছুটা আর্দ্র পর্ণমোচী গাছে ঢাকা। খুব অল্প সংখ্যায় দেখা যায় চিরহরিৎ গাছপালা। এই বনাঞ্চলের প্রাণ সঞ্চার করে তিন নদী – ময়ার, নাগুর এবং কাবিনি। তিন নদী ছাড়া অবশ্য আছে কিছু পুকুর আর বাঁধ।

পর্ণমোচী গাছের মধ্যে বাইরে থেকে আনা গাছ হলো সেগুন, সিলভার ওক যারা ব্যবসায়িক মূল্যের কাঠ যোগান দেয়; তাছাড়া ল্যানটার্না ঝোপ। আর

দিশি গাছপালার মধ্যে রয়েছে শাল, পিয়াশাল, চন্দন, শিশু, আসন, ধ, খয়ের যারা ব্যবসায়িক গুরুত্বের কাঠ উৎপাদন করে; তাছাড়া রয়েছে জারুল যা ফুলের গাছ বা কাঠদায়ী গাছ দুভাবেই উল্লেখযোগ্য। ফলের গাছের মধ্যে আমলকি, হরিতকি, বহেড়া, রিঠা, ফুলের গাছের মধ্যে পলাশ, অমলতাস উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া রয়েছে মোটা বাঁশ আর পাকা বাঁশ।

বিদেশি গাছেদের মধ্যে সেগুনের নিচে কোনো ছোট ঝোপ বা ঘাস হতে পারে না। ল্যান্টার্না গাছের ঝোপ চা বাগানের মধ্যে ব্রিটিশ আমলে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে এনে লাগানো হয়েছিল যা অন্য সমস্ত দিশি ঝোপের অবলুপ্তি ঘটায়। আর আছে পার্থেনিয়াম নামে আগাছা। এই আগাছা এই বনের পশুদের খাবার গাছ হিসেবে যে সব গাছ লাগে তাদের বৃদ্ধি আটকে দেয় আর বনকে নোংরা চেহারা দেয়।

বলাবাহুল্য বান্দিপুরা বেঙ্গল বাঘের বাসা হিসেবে গর্বের অধিকারী। তাছাড়া এই বনের হাতির পাল, ঢোলের পাল, বুনো শুয়োর, চিতল, সাম্বার, মুঞ্জ্যাক, চৌশিঙা, গাউর তার অহঙ্কারের কারণ। এইসব জন্তু ছাড়াও এখানে রয়েছে নানা প্রজাতির সাপ, প্রজাপতি আর গুবরে পোকা। বনের গভীরে যেমন ঘনত্ব বেড়েছে সবুজের তেমনই ক্রমশঃ দুর্গের আকার নিয়েছে উই ঢিবিগুলো আর তার গোড়ার ভয় জাগানো গোখরোর বাসা। বান্দিপুরার পাখির বৈচিত্র্য প্রমাণ করে এই বনের ময়ূর, সবুজ পায়রা, বন মোরগ, বাজ, ঈগল, শকুন, নানা প্রজাতির প্যাঁচা, হাঁড়িচাঁচা, দুর্গা টুনটুনি, ফ্লাই ক্যাচার, মাকড়শাখোর পাখিরা।

ল্যানটার্না বা পার্থেনিয়াম এই জঙ্গলের জীববৈচিত্র্যেকে ধীরে ধীরে ধ্বংস করে ফেলছে। তার সাথে রয়েছে এই বনকে ঘিরে থাকা গ্রামাঞ্চল থেকে আসা

পোষ্য গবাদি পশুদের ধ্বংসলীলা যারা প্রত্যেকদিন এই বনের ঘাস খেয়ে, খুরের আঘাতে মাটি ভেঙে বনের মাটি আলগা করে চলেছে। তার সাথে পোষ্য গবাদি পশুর জঙ্গলে যাতায়াত আতঙ্ক বাড়িয়ে চলেছে বনের পশুর মধ্যে সংক্রামক রোগ ছড়িয়ে যাওয়ার। সবথেকে মারাত্মক হলো বন চিরে চলে যাওয়া উটি- মাইসোর হাইওয়ে। এই পথে তীর বেগে চলা গাড়ির ধাক্কায় রাতবিরেতে বেঘোরে মারা পড়ে জঙ্গলের পশু।

বান্দিপুরাও অপেক্ষা করছে ইউনেসকোর বিশ্ব হেরিটেজ কমিটির ছাড়পত্রের। স্বীকৃতি পেলেই এই বন পৃথিবীর হেরিটেজ এলাকাগুলোর মধ্যে জায়গা করে নেবে।

ছবিঃ সংগৃহীত

বন্ধু

আশুতোষ ভট্টাচার্য

রঙ পেনসিল বন্ধু আমার, বন্ধু আমার ছবির খাতা
কু ঝিকঝিক রেলগাড়ি আর একটি কুঁড়ি দুটি পাতা
হাট্টিমাটিম বন্ধু আমার, পাগলা দাশুর সঙ্গে দেখা
কাবলিওলা বন্ধু হঠাৎ, দুপুর রোদে ঘুরছি একা
কুমড়োপটাশ ডিগবাজি খায় তেপান্তরের মাঠের পাশে
আমি তখন গোল্লাছুটে, বন্ধুরা সব খেলতে আসে
মেঘবালিকা বন্ধু আমার, রামধনু রঙ আকাশ জুড়ে
জোয়ার ভাঁটায় ভাসতে ভাসতে চললে তুমি অনেক দূরে
চাঁদনি রাতে গান ধরেছি আকাশ ভরা সূর্য- তারা
গাঁয়ের বধু লাজুক আঁখি, পালকি কাঁধে ছয় বেহারা
তুমি আমার বন্ধু হবে? স্ক্র্যাপবুক- এ তা জানিয়ে দিও
ভালো থেকো বন্ধু আমার, সময় করে খবর নিও।

ছবিঃ সোমা

সুয্যি মামার অনেক নাম

অঞ্জন আচার্য

পূর্বদিকে সূর্য ওঠে ভানুর আলোয় পুষ্প য়
রাতকে সকাল করলো দিবাকর,
মাখলো পাখি রবির আলো দিনমণি ঘুম ভাঙ
উদয়াচলে উঠলো প্রভাকর।

অর্ক দেখে গাছের পাতা হাসলো যেন লাল
মিহির রাঙায় নদীর কালো জল,
তপন শোনায় ভৈরবী গান পাহাড় চূড়ায় গোল
মেঘের ফাঁকে ভাস্কর উজ্জ্বল।

মিত্র দেখে রাখাল ছুটে পুষার মাঝে হর্ষ
প্রত্যহদিন আসে অর্যমা,
আফতাব কিংবা সূর বলো অর্থ কিন্তু একই
অরুণ, দীনেশ একই তর্জমা।

চিত্রভানু, মার্তণ্ড, অশুমালী
দিননাথ, পূষণ, কিরণমালী
আদিত্য, উষাপতি, বিভাকর
দিবাবসু, বিভাবসু আর দিনকর।

ছবিঃ সংগৃহীত

ফাল্গুনের ছড়া

শেখর রায়

আমার ঘরের বাতায়নখানি খোলা
আয়রে আমার দখিন হাওয়া
আয়রে ফাগুন বেলা।
ফাগুন দিনের কিরণ ছড়ান রবি
কৃষ্ণচূড়া পলাশ ডালে
ঝিকমিকিয়ে হাসে
প্রজাপতির রঙিন পাখায়
ফুল-কাননের শাখায় শাখায়
দখিন হাওয়া দোল দিয়ে যায়
সবুজ ঘাসে ঘাসে।

হাওয়ায় ভাসে ফুলের সুরভি
যেদিকে তাকাই সোনার আলো
যেন শিল্পী হাতে পটে আঁকা
নিটোল একটি ছবি।
পিচকারি-রঙ-লাল আবিরে
খেলব সবাই প্রাণমাতানো
ফাগুন দিনের হোলি
উড়িয়ে দিয়ে উত্তরীয়
আসমানি-রঙ চোলি।

ছবিঃ সোমা

সে

অচিন্ত্য সুরাল

মিশকালো গায়ে সাদা ছোপ
নিতান্ত এলেবেলে পরাধীন
আমার পাড়ায় তার বসবাস
বান্ধবহীন তার কাটে দিন

উদাসীন মুখ নিয়ে পাড়াময়
কেবলই সে ঘুরঘুর করে রোজ
কি করে কি করে যেন জেনে যায়
কাদের বাড়িতে কবে মহাভোজ

বেলা কাটে সে বাড়ির সীমানায়
খুঁটি গেড়ে বসে থাকে চুপচাপ
দু' পায়ের বালিশে সে মাথা দেয়
চোখদুটি সকরুণ নিষ্পাপ

পায় যদি একখানা হাড্ডি

মুখে নিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে যায়
চাল দেখে মনে হয় ভারতের
বাদশাহ গিয়েছিল মৃগয়ায়

বকুলের গাছতলে বসে সে
আধবোঁজা চোখ তার মুখে হাড়
শাঁস তাতে অল্পই থাকলেও
অন্তত চোয়ালের ভাঙে আড়

রাত্তিরে চোর এলে দৌড়ায়
পথ ঠিক খুঁজে নেয় পালাবার
রাগ করে আজতাকে তাড়ালেও
নিশ্চিত দেখা দেবে কাল আবার

ভাতঘুমে পাড়া হয় অচেতন
ভবঘুরে স্বজাতীয় এলে কেউ
লেজটাকে লুকোবার বাসনায়
নাকি সুরে ডাক ছাড়ে ভেউভেউ

স্বর শুনে স্পষ্টই বোঝা যায়
আসলে সে ভেঙে পড়ে কান্নায়
খাবার জোটে না তারই আর্তি
ভেউ ডাকে তাই তত প্রাণ নাই

তবু সে মহান হয় একদিন
কাকেদের তাড়া খেয়ে অস্থির
বিড়ালের বাচ্চাকে কোল দেয়
মুখভাব করে রাখে গম্ভীর

এইভাবে দিন আসে যায় দিন
কোনওমতে কাল কাটে বেচারার
পাড়াতেই চিরকাল থাকে তাও
সে যেন বহিরাগত, বেপাড়ার

ছবিঃ সংগৃহীত

চোর - পুলিশ

জ্যোতির্ময় দালাল

ময়নাঘাটের নতুন ওসি বিপত্তারণ চট্টো-
বিপুল বপু- আন্দোলনে হাসেন হাসি অট্ট :
"সবাই শুনুন গাঁয়ের লোকে করে দু- কান খাড়া,
চোরডাকাতের শমন আমি, করব এ গ্রাম- ছাড়া
সব ব্যাটাকে! এই কথাটা জানিয়ে দিলাম পষ্ট ।
রাত্রি- দিবা সদাই সজাগ ইন্দ্রিয় মোর ষষ্ঠ! ”
ধন্য ধন্য করলো সকল গাঁয়ের লোকে শুনে,
"এমন কড়া শাসক পেলাম অনেক কপালগুণে! "
সবাই খুশি, একজনেরই মুখটা কাঁচুমাচু-
ময়নাঘাটের রেকর্ডব্রেকার নিশিকুটুম পাঁচু !
বিপত্তারণ গাঁয়ে আসার হপ্তাখানেক পরে

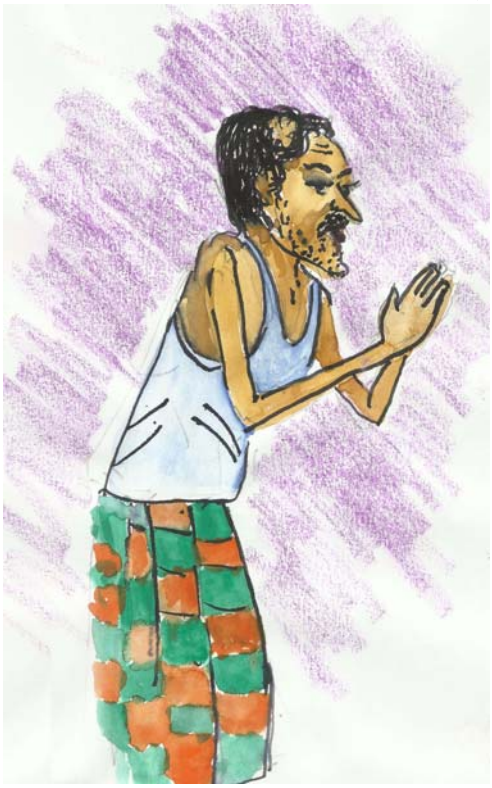

গিন্নির রোজ মুখঝামটায় না তিষ্ঠিয়ে ঘরে -
সন্ধেবেলায় সিঁধেল পাঁচু বেরিয়ে পড়ে রাগে
হনহনিয়ে হাঁটতে থাকে পুলিশ থানার বাগে!

সটান ঢুকে ওসির ঘরে জড়িয়ে দুখান পা
বললে পাঁচু, "ধর্মাবতার, আপনিই বাপ- মা ।
তিনপুরুষের ব্যবসা আমার তিনদিনেতেই লাটে
উঠবে প্রভু! করুন দয়া! রাতের পাহারাতে
দিনকতকের জন্য না হয় একটু দিলেন ঢিলে,
অনাহারে মরছি হুজুর, পাঁচটা ছেলেপিলে! "

তুষ্ট হলেন বিপত্তারণ, পুষ্ট গোঁফের ফাঁকে
ঝিলিক দিল দাঁতের পাটি, হাত বোলালেন টাকে,
"ঘুঘু এবার ফাঁদ দেখেছে, এই কথাটাই বল
আমার নামে বাঘ-গরুতে এক ঘাটে খায় জল ।
একটা সুযোগ দিচ্ছি ব্যাটা, শোন্ রে ভালো করে,
আজকে রাতে করতে হবে চুরি আমার ঘরে!
থাকব জেগে স্বয়ং আমি, পড়িস যদি ধরা
চাবকে পিঠের ছাল ছাড়িয়ে করব এ গ্রাম ছাড়া!
শর্তটা ঠিক মেনে যদি নামতে পারিস কাজে,
করছি প্রমিস্, মওকা পাবি ভালোই মাঝে মাঝে।"

* *

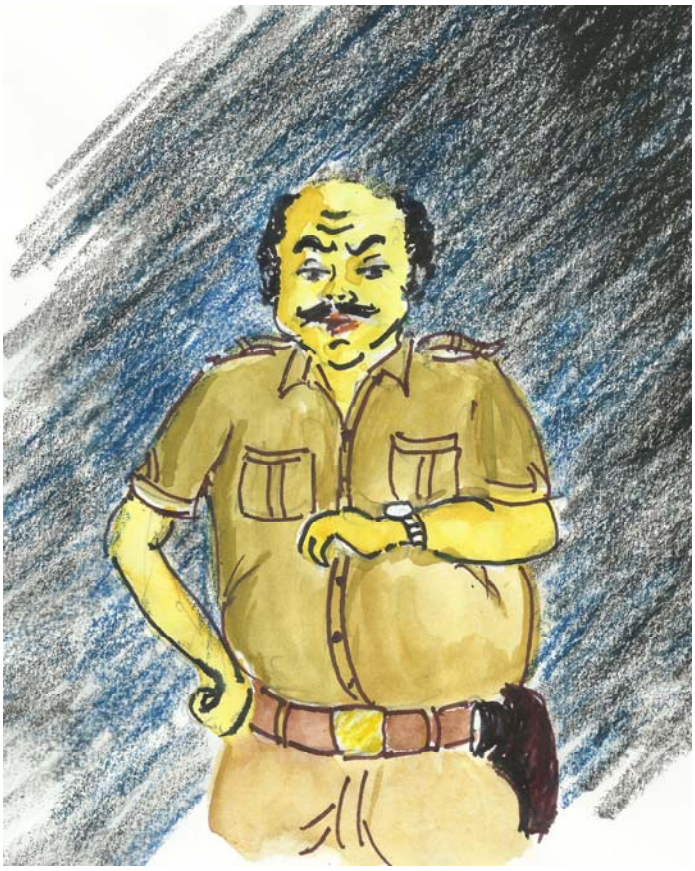

রাত্রিবেলা বিপত্তারণ নিজের ঘরে একা
সিঁধেল পাঁচুর এলেমখানা আজকে যাবে দেখা।

ভাঁটার মতন চোখদুটো তাঁর বনবনিয়ে ঘোরে
থেকে থেকেই পদচারণ করেন করিডরে।
নিশুত রাতে ঘুমিয়ে সবাই, শুনশান, নি: শব্দ
বিপত্তারণ হাসেন, পাঁচু আজকে শিওর জব্দ।
"কাল ব্যাটাকে ঠেঙিয়ে বেদম করবো হাতের সুখ"
আনন্দেতে ডগমগিয়ে উঠল ওসির বুক ।
ঘড়ির কাঁটা এগোয়, পাঁচু ভঙ্গ দিল রণে?
হুক্কাহুয়া শেয়াল ডাকে দূরেতে বাঁশবনে।
পূবের আকাশ ফরসা হল, রাত কেটে হয় ভোর
শেষকালে হার মানল তবে ঘোড়েল পাঁচু চোর!
উল্লসিত বিপত্তারণ দেখেন থানায় এসে
দাঁড়িয়ে স্বয়ং সিঁধেল পাঁচু বিগলিত হেসে ।
নিশপিশিয়ে উঠল দু-হাত, গর্জে ওঠেন ওসি,
"আড়ংধোলাই খাবার দেখি আগ্রহ খুব বেশি !"
আকাশ থেকে পড়ল পাঁচু, বললে, "সে কী প্রভু?
কাজ করলাম শর্তমাফিক, শাস্তি কেন তবু?"
রাগে অধীর বিপত্তারণ, "মিথ্যে ভুরি ভুরি
বলতে ভয়ে কাঁপলো না বুক? কী করেছিস চুরি?"
বললে পাঁচু, "হবেন না কো হুজুর অত ব্যস্ত
বোঝেন নি কাল যা একখানা দাঁও মেরেছি মস্ত !
ঢুলুঢুলু চোখ আপনার, প্রমাণ হাতেনাতে
চুরি গেছে নিদ্রার সুখ প্রভুর গতরাতে!"

ছবি অনুপম

খামখেয়ালী রাজা

বৈষ্ণবী

খাম খেয়ালী রাজা,
খায় কড়াই ভাজা
ভাবেন উনি, খাই যদি
মাংস, মাছ ভাজা
তাহলে, খাবে কী
আমার দেশের প্রজা?
যেমন খুশি চলেন সবাই
হয়না কোনো সাজা।
বলেন সবাই ভাই ভাই
একই দেশে থাকি তাই।
ভুলের নেই কোনো সাজা,
শুধরে নিলেই পাবে মজা
আমি খামখেয়ালী রাজা।

ছবিঃ মুকুট

খামখেয়ালী রাজা,
সময় পেলেই ভাজে গজা,
নিজে হাতে বিলায় নগরে
বলেন, খাও তোমরা সবাই মিলে
ভেজেছি তাজা গজা।
আমি তোমাদের খামখেয়ালী রাজা।
এমন রাজা পেয়ে প্রজা
দু'হাত তুলে নাচে,
সেই রাজাকে ঠকানো কি
আমাদের কারো সাজে?
দেশে দেশে এমন রাজা
পায় যদি সব প্রজা,
অনাহারে থাকবে না কেউ
বাঁচবে কত প্রজা।

কোয়েশ্চেন ব্যাঙ্ক

অমিতাভ প্রামাণিক

কাল রাত থেকে হাজার প্রশ্নে
জেরবার আমি। তুই কি হোসনে?
মাঝরাত্তিরে ঘুমিয়ে পড়েছি;
তখনো মগজে খেলে কানামাছি।
পৃথিবীটা যদি আরো বড়ো হতো?
গঙ্গানদীটা হতো পর্বত- ও!
আকাশের অগণিত তারাগুলো
বেশ যদি হতো বালিশের তুলো!
বেড়ালগুলোর গোঁফগুলো ছেঁটে
পাখি হয়ে তারা যেতো যদি হেঁটে!
জেলে, মালি আর কুমোর- কামার
একসাথে মিলে গাইতো ধামার!
ঘুটঘুটে কালো অমাবস্যায়

উড়ে যেতো যদি নন্দগোঁসাই!
ধরনা দারুণ অগ্নিকান্ডে
পুড়ে গেলো সব সেকেণ্ড- মানডে!
অথবা হঠাৎ বিনা অজুহাতে
করলাটা হতো স্বাদু আলুভাতে!
পাহারাদাররা বগল চুলকে
জরিমানা দিতো নগরশুল্কে!
দারুণ গরমে এ কোলকাতায়
সিন্নি বিকাতো অঙ্কখাতায়!
অফিসের যতো পিওনরা মিলে
বানান শিক্ষা করতো পাঁচিলে!
তেন্ডুলকার সেঞ্চুরি মেরে
আম্পায়ারের টুপি নিতো কেড়ে!
কিম্বা ধরগে ধর্মতলায়
তিমিমাছ ঝোলে হাতির গলায়!
নদীজপমালা- ধৃতপ্রান্তরে
হঠাৎ করেই যদি ঘুণ ধরে!
ওবামা- ওসামা হাতে নিয়ে চক

বাংলায় এসে করে বৈঠক!
মনুমেন্টের মাথার ওপর
হনুমান যদি বানায় টোপর!
শিল্পা শেঠির বিয়ের খবরে
সেনসেক্সের ভ্যালু যায় পড়ে!
সঞ্জয় দৎ হাতে নিয়ে বিড়ি

প্র্যাকটিশ করে রামদেবগিরি!
মিস ইন্ডিয়া অশোকা হোটেলে
বাটামাছ ভাজে সিঙাড়ার তেলে!
দোকানে সাজানো মাখা সন্দেশ
বিকালে সালোক করে সংশ্লেষ!

সিনেমা চলছে, এমন সময়
স্ক্রিন ছিঁড়ে যদি লুঙি বের হয়!
এরকম ইম্পর্ট্যান্ট যত
প্রশ্নে মাথাটা ঘোরে অবিরত।
তার থেকে কিছু এগজ্যাম্পল
তোকে শোনালাম, অ্যাজ স্যাম্পল।
দ্যাখ দেখি তুই ইন্টারনেটে
জবাব পাস কি গুগল- টা ঘেঁটে?

ছবিঃ সৌভিক

দেশ ও মানুষ

বীর ছেলের গল্প

উমা ভট্টাচার্য

আজ ২৬শে জানুয়ারি। সারা দেশ জুড়ে আনন্দ উৎসব চলছে, প্রজাতন্ত্র দিবস উৎযাপন চলছে। রাজধানী দিল্লীতে নানা অনুষ্ঠান, রাজপথে নানা স্কুলের ছেলেমেয়েদের,সৈন্যবাহিনীর বিভিন্ন শাখার কুচকাওয়াজ প্রদর্শন, নাচ ও আরও বিভিন্ন বিষয় প্রদর্শন হবে। বিভিন্ন বিষয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বিখ্যাত মানুষদের, স্কুল কলেজের ছেলেমেয়েদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্বের জন্য পুরষ্কারের ঘোষণা হবে, সাহসিকতার জন্য বিশেষ পুরষ্কারও ঘোষিত হবে। টিভিতে নানা অনুষ্ঠান দেখতে দেখতে মনে পড়ে গেল আমার শহরেই এ'বছরই ঘটে যাওয়া একটি

সাধারণ ঘরের ছেলের এক সাহসী কাজের কথা। সে হয়ত এবছর কোনই পুরষ্কার পাবেনা, কিন্তু সে তো পুরষ্কারের আশায় কাজটা করেনি। করেছিল নিজের দায়িত্ববান নাগরিক চেতনায়। নিজের জীবনের বিপদের কথা না ভেবে ছুটে গিয়েছিলো বিপদের হাত থেকে অসহায় মানুষগুলোকে বাঁচাতে। তার আজ কিছু পাওয়া উচিৎ তার কাজের স্বীকৃতি হিসেবে। ঘটনাটা তাহলে খুলেই বলি।

দিনটা ছিল এবছরেরই ১লা জানুয়ারি, আমাদের মফস্বলের শহর ব্যারাকপুরেরই শান্তিবাজারের কাছেই একটা জায়গা। নববর্ষের সকাল, ছুটির আমেজ চারদিকে, মানুষজন আনন্দে মাতোয়ারা, কেকের দোকানে ভিড়,মাঠে মাঠে ছেলেরা খেলাধুলা করছে,লরি করে মাইক বাজাতে বাজাতে পিকনিক পার্টি চলেছে। বড় রাস্তার ধারে ক্লাবঘরে বসে পাড়ার ছেলেরা চা তেলেভাজা সহযোগে আড্ডা দিচ্ছে, একদল আবার ক্যারাম নিয়ে বসেছে,জোর খেলা চলছে। হঠাৎ চৌমাথার শান্তিবাজারের মোড়ের দিক থেকে জোর কোলাহল শোনা গেল। হৈ চৈ ক্রমশ জোরালো হল। হঠাৎ ক্লাবেরই একটা ছেলে চীৎকার করতে করতে দৌড়ে আসছে দেখা গেল। সে এসে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল মোড়ের কাছে সাংঘাতিক কাণ্ড, একটা বিরাট ষাঁড়কে লেজ ধরে টেনে কে যেন ক্ষেপিয়ে দিয়েছে রগড় দেখার জন্য। সে এখন চার দিকে শিং উঁচিয়ে ছুটছে আর লোকজনকে গুঁতোচ্ছে। ছেলেবুড়ো নির্বিশেষে যে যেদিকে পারছে দিশেহারা হয়ে ছুটছে। দোকানীরা দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে দিয়েছে, মানুষ রাস্তায় আশ্রয় নেবার জায়গাও পাচ্ছেনা। শিগগীর চল সবাই দেখিগে কী হচ্ছে।

যেখানে এই কান্ড চলছে তার কিছু দূরেই থানা। ষাঁড় ছুটতে ছুটতে থানার গেটে গিয়েও ঢুকতে পারেনি, কারণ আইনের রক্ষকরাও জানে যে “আপনি বাঁচলে বাপের নাম”। থানার গেট বন্ধ করে ভিতর থেকে ঘটনার উপর নজর রাখছে। তাদের আর করার কীই বা আছে! কারণ এখানে মানুষ তো কোন আইনভঙ্গ করেনি ,বা কাউকে অত্যাচার করেনি যে তারা কোন স্টেপ নেবে, তাদের জন্য লেখা আইনের বইতে তো এই ব্যাপারে কোন নির্দেশ নেই যে অবোলা জীব ষাঁড়ের বিরুদ্ধে কী করে স্টেপ নেওয়া যেতে পারে, তার থেকে বাবা “য পলায়তি স জীবতি” এই উপদেশ মনে রাখা ভাল। তারা গেট বন্ধ করে বসে আছে আর রাস্তায় দক্ষযজ্ঞ চলছে। দমকলেরও এখনও দেখা মেলেনি।

ব্যাপার দেখে ক্লাবের ডাকাবুকো একটা ছেলে ক্লাব ঘরে রাখা মোটা দড়ির খানিকটা, আর একটা বাঁশের মোটা লাঠি নিয়ে রাস্তার দিকে দৌড়ল, পিছন পিছন অন্য ছেলেরাও দৌড়ল। সেখানে পৌঁছে সে দেখে ষাঁড়ের গুঁতোয় এক ভিখারিণী রাস্তায় পড়ে কাতরাচ্ছে। আর দেরি করলে চলবে না দেখে সে ফন্দি ঠিক করে নিল। হাতের দড়িতে ফাঁস তৈরি করে নিল; সে লক্ষ্য করেছে ষাঁড় প্রলয়ঙ্কর মূর্তিতে ছোটবার সময় সামনের দুই পা প্রায় ২/৩ ফুট উঁচু করে লাফ দিচ্ছে। তার নির্দেশে একটি ছেলে ষাঁড়টির পিঠে লাঠি দিয়ে এক ঘা মারতেই ষাঁড় তাদের দিকে ফিরতে যেই লাফ দিলো ছেলেটা হাতের দড়ির ল্যাসো ছুঁড়ল নিপুণ দক্ষতায়। নাইনে পড়ার সময় সে স্কুলের এন সি সি তে সে এই ল্যাসো বানানো ও ছোঁড়া শিখেছিল,যা আজ কাজে লেগে গেলো। একপায়ে ল্যাসো আটকে যেতেই ভারসাম্য হারিয়ে ষাঁড় ধপ করে মাটিতে পড়ে গেলো। আচমকা আক্রমণে সে খানিকটা হকচকিয়ে গিয়েছিলো, সহসা মাটি থেকে উঠতে পারলনা। ছেলেটাও ল্যাসোর দড়ি টেনে ধরে রেখেছিলো যাতে চেষ্টা করলেও ষাঁড় যেন উঠতে না পারে।

ইতিমধ্যে আশেপাশের কিছু লোকজন সাহস পেয়ে ততক্ষণে জাল ও লাঠিসোটা নিয়ে ছুটে এসেছিল । থানার দরজা খুলে পুলিশও এসে গেলো, কারণ থানার বড়বাবু তখন থানায় এসে গেছিলেন। কে একজনের ফোন পেয়ে বনবিভাগের লোকজনও তখনই এসে পড়লো, তারা ঘুমপাড়ানি গুলিতে ষাঁড়কে অচেতন করে গাড়িতে তোলার ব্যবস্থা করতে লাগলো। থানার বড়বাবু ও আরও আশেপাশের লোকজন সেই ছেলেটার খোঁজ করলো কিন্তু তাকে পাওয়া গেলনা। পাবে কি, সে তো ততক্ষণে আহত লোকজনের জন্য হাসপাতালের দিকে দৌড়েছে ।

আমি ঘটনাস্থলের কাছেই আমার এক আত্মীয়ের বাড়ির দোতলার বারান্দায় বসে ছিলাম। সেখান থেকেই গোটা ঘটনাটা লক্ষ্য করেছি। ভাবছি আজও এরকম স্বার্থবোধহীন ছেলে আছে! জীবনের মায়া তার কাছে মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসবার পথে বাধা নয়। হয়তো খারাপ মানুষদের পাশাপাশি এরকম অসংখ্য ভালো মানুষ আজও আছে বলেই আমাদের এই অভাবী দেশটা এখনও উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে।

ছবিঃ সংগৃহীত

প্রথম ধাঁধাঃ

নিউ ইয়ার্স ইভ-এর রাতে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সমরেশবাবু খুন হয়েছেন। খুনটা আবিষ্কার করেছিলেন তাঁর বন্ধু সমরবাবু। রাত্রিবেলা সমরেশবাবুর বাড়ি থেকে তিনিই পুলিশকে খবর দিয়ে আনান। পুলিশে তিনি যে এজাহার দিলেন সেটা এইরকমঃ ইভনিং ওয়াকে বের হয়ে সমরেশের বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখি ওর ঘরে আলো জ্বলছে। ভাবলাম একবার উঁকি দিয়ে যাই। ওর বসার ঘরের জানালার শার্শীতে ঠাণ্ডার চোটে বাষ্প জমেছিলো। হাত দিয়ে সেটা মুছে ভেতরে তাকিয়ে দেখি সমরেশের লাশ পড়ে আছে। তখন দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে সব দেখে আপনাদের ফোন করি।

এজাহার শুনে পুলিশ সমরবাবুকে খুনি সন্দেহে গ্রেফতার করলো। এজাহারে ফাঁকটা কোথায় ছিলো?

দ্বিতীয় ধাঁধাঃ

ছেলেটা ঘোড়ার পিঠে বসে ছুটছিলো। রাস্তা দিয়ে গাড়িঘোড়া ছুটে যাচ্ছিলো, কিন্তু কেউ তাকে দেখতে পাচ্ছিলো না। ধাক্কাও লাগছিলো না কিন্তু। ঘোড়াটাও একেবারে নীরব। চিঁহি করে হাঁকও দিচ্ছিলো না একবারের জন্যে। খুড়ের আওয়াজও উঠছিলো না কোন পায়ের নীচে কার্পেট পাতা রাস্তায়। চারপাশে তার গাছপালা, বনজঙ্গল, নদীনালা, পাহাড়পর্বত, মরুভূমি টরুভূমি কিচ্ছু ছিলো না। খানিক পরে ঘোড়া থেকে নেমে সে ঘুমিয়ে পড়লো। ঘটনাটা কোথায় ঘটছিলো?

তৃতীয় ধাঁধাঃ

আটটা আট দিয়ে এক হাজার বানাও।

চতুর্থ ধাঁধাঃ

সাগর আছে জল মেলেনা, লোকজন নেই ফাঁকা

এক নিমেষে পৌঁছে যাবে দিল্লি থেকে ঢাকা

ধানের ক্ষেতে নেইকো ফসল, অরণ্য গাছহীন

সূর্যচন্দ্র কেউ ওঠেনা, নেই কোন রাতদিন।

কুইজ:

১। পৃথিবীতে এখনো কত জাতের মাকড়শা পাওয়া গেছে?

২। আধুনিক মাকড়শা কত দিন ধরে আছে পৃথিবীতে?

৩। মাকড়শার ক জোড়া চোখ হয়?

৪। একটা মাকড়শার কখানা হাঁটু হয়?

৫। ট্যারানটুলার কামড়ে মানুষ কি মরে?

৬। মাকড়শার শরীরের কোন জায়গা থেকে জাল বের হয়?

৭।কম্বোডিয়ার ভাজা মাকড়শা খেতে কোন পরিচিত স্ন্যাক- এর মতো?

৮। ব্ল্যাক উইডো তো মাকড়শা সে আমরা জানি। রেড উইডো কোন জাতের জীব?

জানো কি?

১। স্ত্রী উলফ স্পাইডার তার ডিমের থলি বয়ে নিয়ে ঘুরে বেড়ায় যতদিন না ডিম ফোটে। ডিম ফুটলে বাচ্চারা তাদের ভাঙা ডিমের থলি বয়ে নিয়ে মায়ের পিঠের ওপর গিয়ে উঠে চেপে বসে। মা মাকড়শা বাচ্চাদের পিঠে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়,

শিকার ধরে, সবকিছু করে, আর বাচ্চারা মায়ের পিঠে বসে বসে যার যার ডিমের কুসুম চেটেপুটে খায় আর বড়ো হয়। মা কাজকর্ম করবার সময় কোন বাচ্চা যদি পিঠ থেকে পড়ে যায় তাহলে মা সঙ্গে সঙ্গে থেমে গিয়ে তাকে ফের পিঠের ওপর তুলে নেয়। হপ্তাচারেক পড়ে বাচ্চারা বড় হয়ে গেলে তবেই মায়ের পিঠ থেকে নামে।

২। বোলাস মাকড়শা জাল ছুঁড়ে উড়ন্ত পতঙ্গ ধরতে পারে। শিকার দেখতে পেলে এরা তার দিকে তাক করে, ঠিক স্পাইডারম্যানের মতো একটা জালের দড়ি ছুঁড়ে দেয়। তার আগায় থাকে একটা আঠার গোলা। সে গোলা গিয়ে তার শিকারের গায়ে আটকালে মাকড়শা তাকে কাছে টেনে এনে ভোজ সারে।

৩। গোল্ডেন ওর্ব মাকড়শা(অস্ট্রেলিয়া)র জালের দড়ি সোনালি রঙের হয় আর স্টিলের চেয়েও শক্ত হয়। তাইতে সে পাখি অবধি ধরে খায়। সঙ্গের ছবিটা এ বছর জানুয়ারি মাসে তোলা হয়েছিলো। বিজ্ঞানিদের চমকে দিয়েছে এই ছবি। শক্তির ভরটা একবার ভাবো। পাখি বেচারা এই জালের পাল্লায় পড়ে নড়তে অবধি পারে নি।

ড্রুডল

কীসের ফটো??

অবিশ্বাস্য

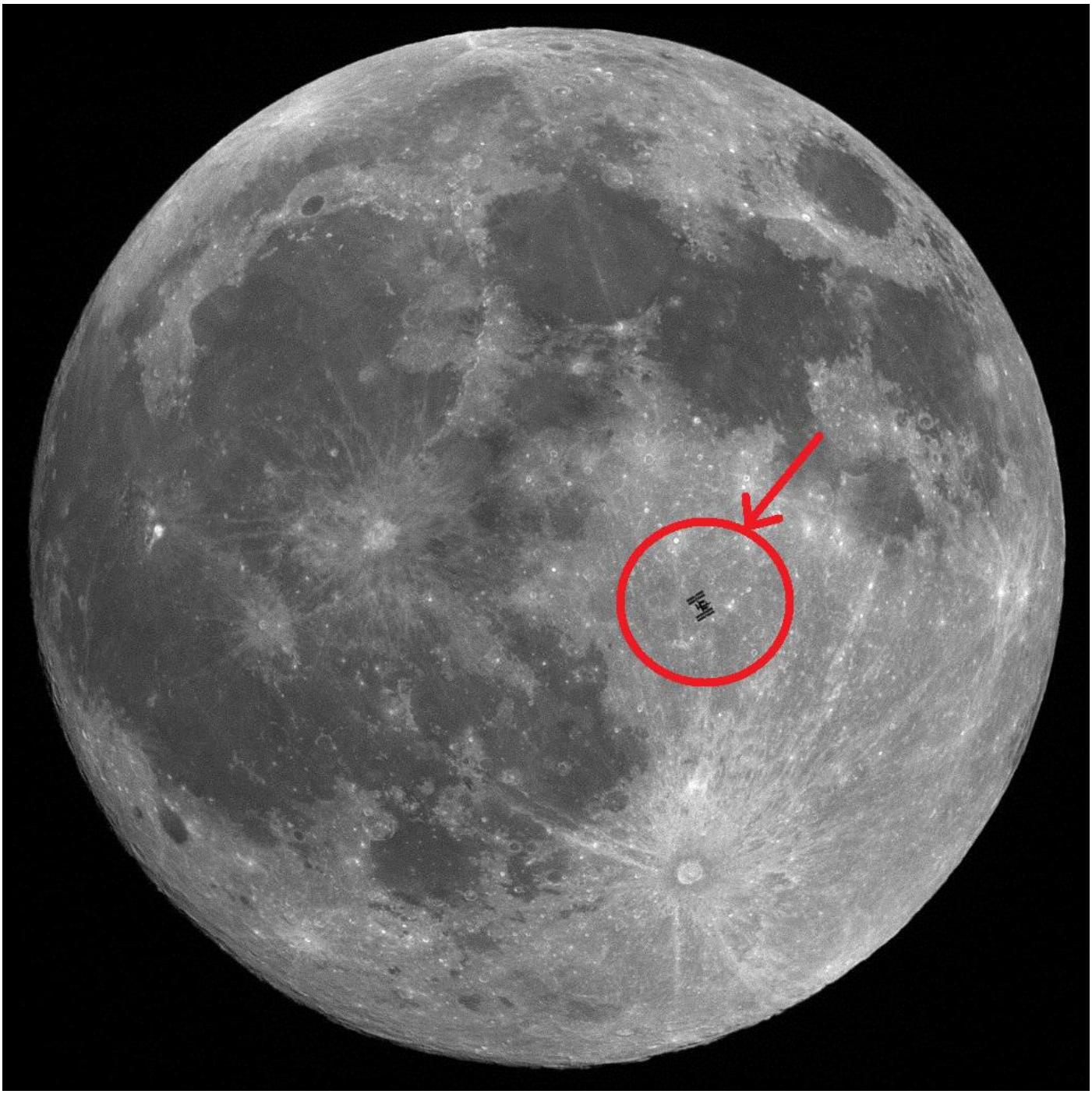

চাঁদের ব্যাকগ্রাউন্ডে ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনের

এক অবিশ্বাস্য ফটোগ্রাফ

মজার ইন্টারনেটঃ

১। ওয়ার্মওয়ার্লড সাগাঃ

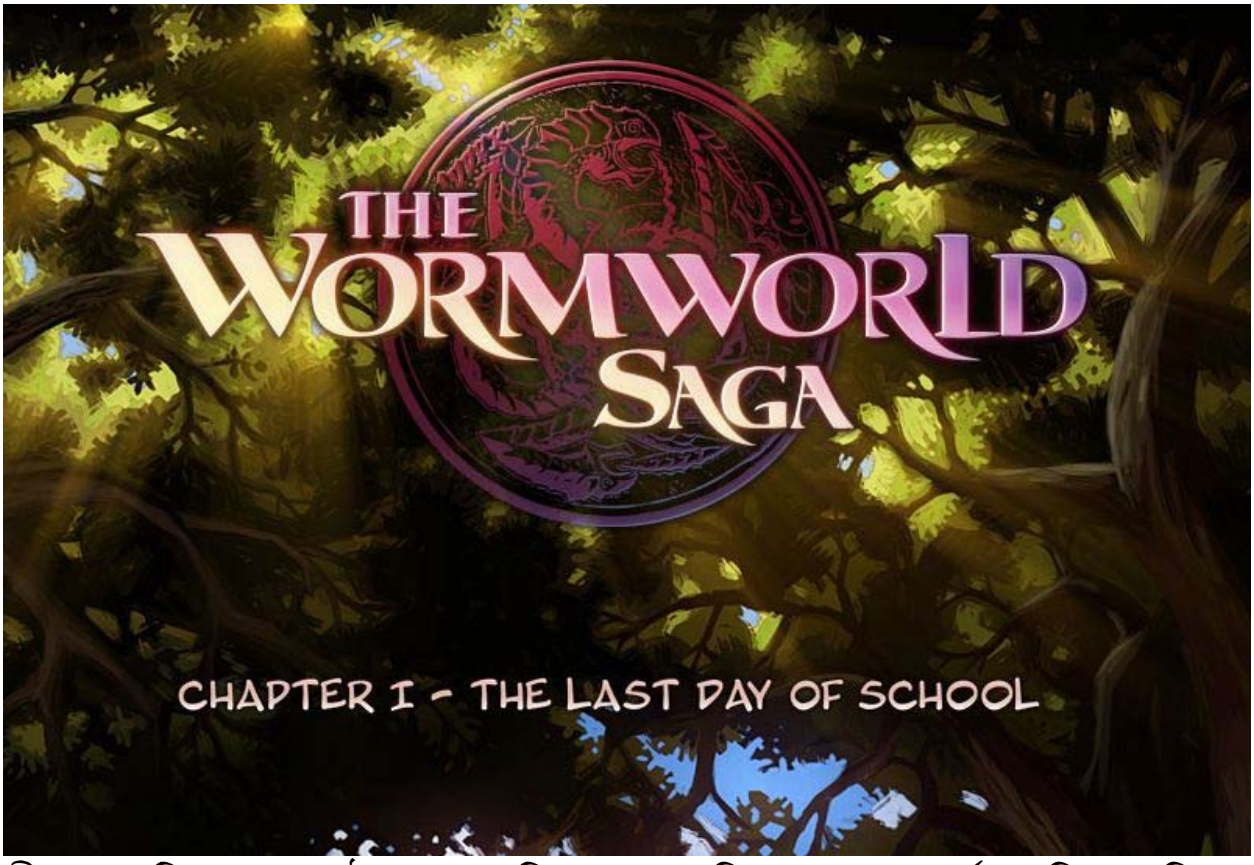

গ্রীষ্মের ছুটিতে গ্রামে ঠাকুমার বাড়ি বেড়াতে গিয়ে এক আশ্চর্য ম্যাজিক দুনিয়ার খোঁজে পেয়েছিল জোনাস নামে একটা ছেলে। তার সেই অ্যাডভেঞ্চার নিয়ে এই অনুপম ছবিতে উপন্যাস (গ্রাফিক নভেল) বিনিপয়সায় বিলি হচ্ছে এই সাইটেঃ

http://www.wormworldsaga.com/chapters/chapter01/EN/Index.php

ঘুরে আসতে পারো। ভালো লাগবেই।

২। ম্যাজিক—ম্যাজিক

যারা অনলাইনে ম্যাজিক শিখতে চাও তারা এই সাইটটায় ঢুকে দেখতে পারো। ভালো ভালো ট্রিক শেখানো হচ্ছে এখানেঃ http://www.magictrickonline.com/

৩। দুনিয়াজোড়া অনেক মানুষই ভূতের ফটো তুলেছেন বলে জানিয়েছেন। সেইসব নানা জাতের ভূতের ছবি একত্রে দেখতে হলে এই সাইটটাতে গিয়ে ঘুরে আসতে পারোঃ http://www.ghostresearch.org/ghostpics/

(সঙ্গের ছবিটা ঘর অন্ধকার করে থ্রি ডি গ্লাস লাগিয়ে রাতের বেলা একলা একলা দেখো, ভারী মজা লাগবে।)

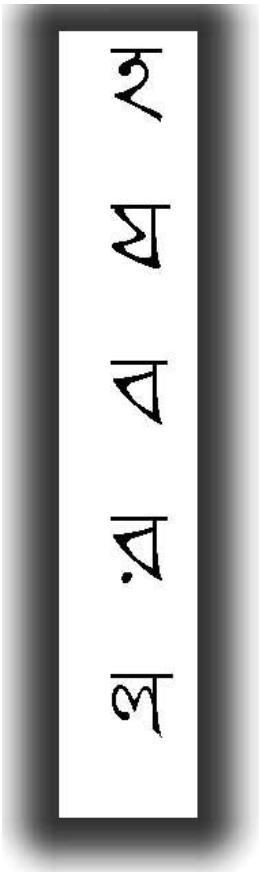

সর্ণং বাদন্তি কুক

ঘবনামে কা দধব্য

রমাকুশ দরিত চ

সা গতথা সরি কর

এইবারে গোল দেয়া ঘরগুলোর অক্ষরগুলো দিয়ে এই ধাঁধাটার উত্তর দাওঃ

প্রথমত খেচরের গলাতে পাউডার, দ্বিতীয়ত পীতকৃষ্ণ দাঁতে বেজায় ধার, তৃতীয়ত ব্যাটা স্বয়ং যুধিষ্ঠিরের চ্যালা, গুছিয়ে নিয়ে জবাব বলো ভারী মজার খেলা।

গত সংখ্যার উত্তরঃ

ধাঁধা:

প্রথম ধাঁধা: ৪৬০২ গিনি।

উটের পিঠে হাজার পুঁটুলি খেজুর নিয়ে মোল্লা রওনা হবে। পথে উট খাবে পাঁচশো পুঁটুলি। বাগদাদে বেচবে পাঁচশো পুঁটুলি আর উটটাকে। তাতে আয় হবে মোট ১৫০০+১৫০ গিনি , মানে ১৬৫০ গিনি। এবারে ভাড়ার উটগাড়িতে ফের মরুদ্যানে ফিরবে। খরচ হবে ১৬ গিনি। মরুদ্যানে ফিরে ফের একটা উট কিনবে সে । খরচ ১৫০ গিনি। অতএব এক ট্রিপে মোট আয় হবে: ১৬৫০-১৬-১৫০=১৪৮৪ গিনি।

অতএব তিন ট্রিপে আয় হবে ৪৪৫২ গিনি। শেষ ট্রিপের পর অবশ্য নতুন উট কিনতে হবে না তাকে। ফলে বেঁচে যাবে দেড়শো গিনি। কাজেই নেট আয় থাকবে ৪৬০২ গিনি।

দ্বিতীয় ধাঁধা:

এর উত্তরটা খুব সহজ নয়। অংকের ফর্মুলার বদলে এসো আমরা অন্য এক কায়দায় এর উত্তর খুঁজি।

ধরো পাঁচজন ছাত্র আর পাঁচটা লকার আছে। তাহলে প্রথম ছাত্র পাঁচটা লকারই খুলে দেবে। দ্বিতীয়্জন দুই আর চার নম্বর লকার বন্ধ করবে। তৃতীয়জন তিন নম্বর লকার বন্ধ করবে। চতুর্থজন চার নম্বর লকারটা খুলে দেবে আর পঞ্চমজন পাঁচ নম্বর লকারটাকে বন্ধ করে দেবে। তাহলে শেষতক খোলা থাকবে এক আর চার নম্বর লকার।

এবারে ধরা যাক দশটা লকার আছে। তাহলে ব্যাপারটা এরকম হবে:

লকার নং:	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ছাত্র নং:										
১	খুলে	খুলে	খুলে	খুলে	খুলে	খুলে	খুলে	খুলে	খুলে	খুলে
২		বন্ধ	-	বন্ধ	-	বন্ধ	-	বন্ধ	-	বন্ধ
৩	-	-	বন্ধ	-	-	খুলে	-	-	বন্ধ	-
৪	-	-	-	খুলে	-	-	-	খুলে	-	-
৫	-	-	-	-	বন্ধ	-	-	-	-	খুলে
৬	-	-	-	-	-	বন্ধ	-	-	-	-
৭	-	-	-	-	-	-	বন্ধ	-	-	-
৮	-	-	-	-	-	-	-	বন্ধ	-	-
৯	-	-	-	-	-	-	-	-	খুলে	-
১০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	বন্ধ

অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে এক চার আর ন নম্বর লকার খোলা থাকবে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে পাঁচটা লকার থাকলে শেষ অবধি খোলা থাকে ২টো লকার। দশটা হলে খোলা থাকে তিনটে লকার। এই হিসেবে এগোলে এক হাজার লকারের জন্য খোলা লকারের সংখ্যাটা দাঁড়াবে ২০১।

অর্থাৎ দুশো একখানা লকার খোলা থাকবে।

তৃতীয় ধাঁধা: যে নাইট ওয়াচম্যান পরপর তিনরাত ঘুমিয়ে কাটায় তেমন ফাঁকিবাজ লোককে কাজে রাখা মোটেই ভালো কাজ নয়।

চতুর্থ ধাঁধা: সাপ।

কুইজের উত্তর:

ব্যারোমিটার, দৈর্ঘ, রিখটার, রেমিংটন, হার্ভে, বেয়ার্ড, ক্যালকুলেটর, রোমার, হার্শেল, লেনেক

ডুডলের উত্তর:

বাঘে জিরাফ ধরেছে।

কীসের ফটো: জাঁতি

হযবরল:

আলুকপির ডালনা

নলেন গুড়ের সন্দেশ

জিরেনকাটা রস

রাঙা আলুর পায়েস

পাটালি গুড়

প্রশ্নের উত্তর: আগুন আগুন।

মজার খেলার উত্তরঃ

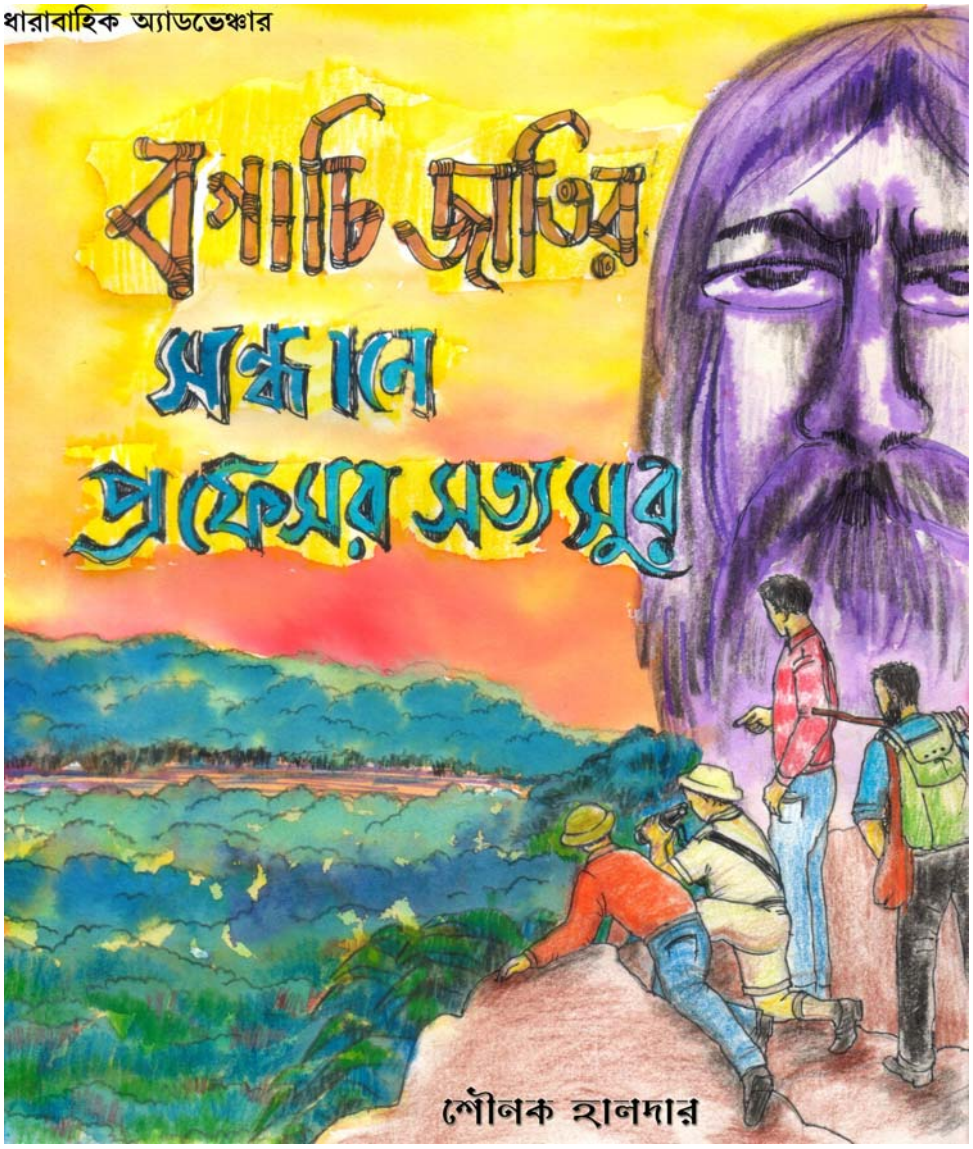

আগে যা ঘটেছেঃ

ইহুদিদের এক হারিয়ে যাওয়া শাখার খোঁজে মিজোরামের বনপাহাড়ে ঘুরতে ঘুরতে অভিযাত্রী ক্লাবের সদস্যরা অবশেষে এসে পৌঁছেছে নীলপর্বতের গায়ে। সেখান থেকে উল্টোদিকের ঢালে আবিষ্কার করা গেল আচাইদের গল্পে শোনা সেই হ্রদকে যার মধ্যে তলিয়ে গিয়েছিল নীলপাহাড়ের অজানা বাসিন্দাদের গ্রাম। সে হ্রদের জলের নীচে নাকি আজও তাদের গ্রামের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। কিন্তু সেখানে পৌঁছোতে হলে পাহাড়ের গায়ে পথ খুঁজতে হবে। অভিযাত্রীরা পাহারের গায়ে ফাটল খুঁজতে লাগলো। তারপর--

''আরে ওরা হয়তো সবাই মরেই নি। এরকম ভূমিকম্প তো এসব জায়গায় কত হয়। যারা বেঁচে ছিল,তারা,ঐ হ্রদের কাছে জায়গা পালটেছে।''

''হতে পারে,''চঞ্চলদা বললো। চঞ্চলদার হয়তো কাল রাতের সেই আওয়াজ আর আলোর কথা মনে হচ্ছিল। সত্যি দেখেছিলাম কি? নাকি ওটা স্বপ্ন ছিল?

''আচ্ছা ধরো, ওদের সঙ্গে দেখাই হল না নয়। ওরা তো, যা শুনে মনে হল, খুব একটা মিশুকে নয়। ওদের সঙ্গে মোকাবিলা করবে কী করে?'' অতনুর সিরিয়াস প্রশ্ন। চঞ্চলদা অতনুর এই প্রশ্ন শুনে একগাল হেসে গেয়ে উঠল, ''আমি বলবো----বন্ধু, কতদিন দেখা হয়নি।'' আমরা সবাই হেসে ফেললাম।

সারা দুপুর লেগে গেল ফাটল খুঁজতে।সত্যদা আর অতনু গেল ওপর দিকটা,আমরা বাকি দুজন নীচের অংশটা।এই বিচ্ছিরি জঙ্গলে ইঞ্চি ইঞ্চি করে পাহাড়ের পাঁচিল ধরে ফাটল খোঁজা মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। পদে পদে গর্ত,ঝর্ণা,বিপজ্জনক খাড়াই আর

গাছপালার বাধা তো আছেই। আমার প্রথম থেকেই মনে হচ্ছিল এখানকার ভার্জিন বনভূমি যেন আমাদের অনুপ্রবেশটাকে ভালোভাবে মেনে নেয়নি। পদে পদে বাধা দিচ্ছে।যেন বলছে,আর এগিও না হননকারীর দল। সামনে বিপদ আছে।

মাথার ওপরে এখান থেকে আকাশ দেখা যায় না। বোঝা যাচ্ছিল না বেলা কত হল। ঘড়িতে দেখলাম চারটে বেজে গেছে। এখানে অক্টোবর- নভেম্বরে পাঁচটা বাজতেই ঝপ করে অন্ধকার নামে। রাত হয়ে গেলে এরকম অবস্হায় ক্যাম্প করা বিপদ। এইসব ভাবছি, হঠাৎ তীব্র বাঁশির আওয়াজ পেলাম। সংকেত মতন তিনবার।অর্থাৎ ওরা খুঁজে পেয়েছে,আমাদের উঠে যেতে ডাকছে। চঞ্চলদার মুখ ঝলমল করে উঠল এতক্ষণে। নইলে দুজনেই এত সময় ধরে খুব হতাশ মুখ করে নামছিলাম।

উপরে পৌঁছে দেখি সত্যদা নাচছে। আর অতনু দাঁত বের করে হাসছে। মাথার ওপরে সূর্য অনেক নেমে গেছে-সম্ভবত পাহাড়ের ওপাশে চলে গেছে। অস্তসূর্যের আভাটা সারা আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে।

''দ্যাখ দ্যাখ কী চমৎকার লাগছে ওপরটা!'' তাকিয়ে দেখলাম যেখান থেকে নেমে এসেছি, সেই নীলপর্বত তার সমস্ত গরিমা নিয়ে ওপর থেকে তাকিয়ে আছে। আর সমস্ত বনভূমি জুড়ে একটা স্তব্ধতা।সত্যদা উত্তেজিত স্বরে নির্দেশ দিল, ''এক্ষুনি ফাটল পেরিয়ে ওধারে যেতে হবে। এপাশে রাত কাটাতে চাই না। হ্রদের ধারেই ক্যাম্প করবো।''

ফাটলটা একটা সংকীর্ণ গিরিপথের মতন। হয়তো ভূমিকম্পের সৃষ্টি। ভেতরটা অন্ধকার, তলায় এবড়োখেবড়ো পাথর, ঘাস আর ওপরে লতা বা গাছের শেকড়; মাঝেমাঝে অস্পষ্ট ওপরের আকাশ দেখা যায়। একটু সতর্ক হয়েই এগোতে হচ্ছিল। হঠাৎ সত্যদা কিসে হোঁচট খেল।

''দ্যাখ্ তো এটা কী? লম্বা লাঠির মতন এটা?''

তুলে দেখলাম একটা বর্শা। ডাণ্ডাটা অক্ষত। ফলাটায় মরচে পড়ে গেছে। ফলার গোড়ার বিবর্ণ পুঁতি আর সুতো ঝুলছে।

''আছে আছে, তারা আছে চঞ্চল। তোরা তো বিশ্বাস করছিলি না--'' সত্যদার অকম্পিত গলা।

''এটা তো সেই আচাই শিকারিদের ফেলে যাওয়া অস্ত্রও হতে পারে---'' সত্যদা আমার প্রশ্নটা শুনে আমার দিকে কটমট করে তাকালো। একটু পরেই আমরা ফাটলের আর এক প্রান্তে পৌঁছলাম। সত্যদা আগে আগে, পেছনপেছন আমরা।

সে এক অপার্থিব দৃশ্য দেখলাম। ঘন বনে ঘেরা এক টলটলে বিশাল হ্রদ। সূর্যাস্তের হালকা আভা এসে তাকে রাঙিয়ে দিয়েছে। যেন হ্রদের জলে কেউ রং গুলে দিয়েছে। আমরা যেখানটায় দাঁড়িয়ে ছিলাম, সেটা একটা উঁচু বারান্দার মতন অসমান চত্বর। চত্বরের কিনারা দিয়ে হ্রদের একটা ভালো ভিউ পাওয়া যায়, কিন্তু হ্রদের কিনারায় যেতে হলে ফের নীচে নেমে জঙ্গল পেরোতে হবে খানিকটা। আর সে কি যে সে জঙ্গল? হ্রদের চারপাশ ঘিরে একটা গাছেদের ব্যূহ যেন, কোনো কোনো জায়গা ঢেকে দিয়েছে, হ্রদের মধ্যে থেকে কোথাও

কোথাও গাছ জেগে উঠেছে। সব মিলিয়ে সে এক আদিম পৃথিবী। আরো আশ্চর্য যে হ্রদের জল স্থির, জঙ্গলে হাওয়া নেই। নেই কোনো ন্যূনতম আওয়াজ।

''আহ-হ--- অনাবিষ্কৃত দেশ--'' সত্যদার গলা থেকে একটা তৃপ্তির রেশ ছড়িয়ে পড়ল। বোধহয় কলম্বাসও এরকম একটা ভাব করেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজে পৌঁছে।

''চল, হ্রদের দিকে এগোই।'' সত্যদার প্রস্তাব। চঞ্চলদা এবারে বাধা দিল, ''না গুরু, আজ রাতে আমরা এখানেই ক্যাম্প করব। নতুন জায়গা অচেনা জঙ্গল। তাছাড়া রাত নামছে। আজ আর ওখানে যাওয়া ঠিক হবে না। কাল ভোরে নামব।''

অতনু দূরবীণ ধরে হ্রদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলল, ''আশ্চর্য হ্রদ! জলটা এতটাই স্বচ্ছ যে তলা অবধি দেখা যাচ্ছে। আর তলাতে সত্যিসত্যিই অনেক পাথুরে স্ট্রাকচার,দ্যাখো তো ভালো করে তোমরা? ''

আলো কমে এসেছে। তবুও মনে হল যে জলের তলায় প্রচুর পাথর, এলোমেলোভাবে ছড়ানো। এগুলোকেই কি স্হানীয়রা মানুষের ঘরবাড়ি বলে? কাছে না গেলে ভালো করে বোঝা যাবে না। আমাদের খুব উত্তেজনা হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল এক্ষুণি গোটা জায়গাটা তল্লাশ করে ফেলি। যেন আর তর সইছিল না।

চত্বরেই তাঁবু ফেলা হল। আমরা সবাই বেশ ক্লান্ত ছিলাম। তাড়াতাড়ি খাওয়াদাওয়া সারা হতে চঞ্চলদা বলল, ''প্রচন্ড কড়া দুধছাড়া এক ফ্লাস্ক কফি বানিয়ে রাখ। আজ পালা করে রাত জাগতে হবে।''

দ্বিতীয় রাত

সে রাতের কথা আজো ভুলতে পারি না। শুরু থেকেই কি প্রচন্ড অন্ধকার সেদিন! তাঁবুর পর্দা আটকানো হল না। তাঁবুর গোড়াতে দুজন করে পালা করে পাহারায় বসলাম। সামনে জ্বালানো হল আগুন। রাতের প্রথম দিকটা জাগার পালা আমার আর চঞ্চলদার। চঞ্চলদা অসম্ভব শক্তিশালী ও সাহসী মানুষ। তাকেও আজ দেখলাম যেন অতিসতর্ক, অতিচঞ্চল-যেন সবসময়ে কোনোকিছুর আশংকা নিয়ে ঘুরছে। সামান্য একটা শব্দতেও নড়েচড়ে উঠছে। প্রথমে তাঁবুর বাইরে টর্চ নিয়ে এক চক্কর ঘুরে এল। এসে বলল, ''অধিরাজ- কীরকম অন্ধকার দেখছিস? দ্যাখ আকাশে মেঘ দেখা যাচ্ছে না, অথচ একটাও তারা নেই--চাঁদটাই বা গেল কোথায়? আজ কি শুক্লপক্ষ?''

বাইরে আকাশের দিকে তাকালাম। চারপাশ শুধু কালো,কুপকুপে অন্ধকার। তার মধ্যে গাছপালা, পাহাড় ও পাথরের অবয়ব, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। সামনে, নীচে, চারপাশে তাকালাম--একমাত্র অগ্নিকুন্ড আর তাঁবু বাদে চারদিকে কিছু নেই-শুধু কালো। যেন একপোঁচ কালি চারদিকে কে যেন লেপে দিয়ে গেছে। চোখের সামনে যেন একখানা কালো পর্দা ঝুলছে, যা বর্তমান আর রহস্যলোকের মধ্যে ব্যবধানকে স্পষ্ট করে তুলেছে।

চঞ্চলদা ফের বলল, ''---কোনো আওয়াজ পাচ্ছিস?''

''হ্যাঁ,সত্যদার নাক ডাকার আওয়াজ!''

''অন্য কোনো আওয়াজ?''

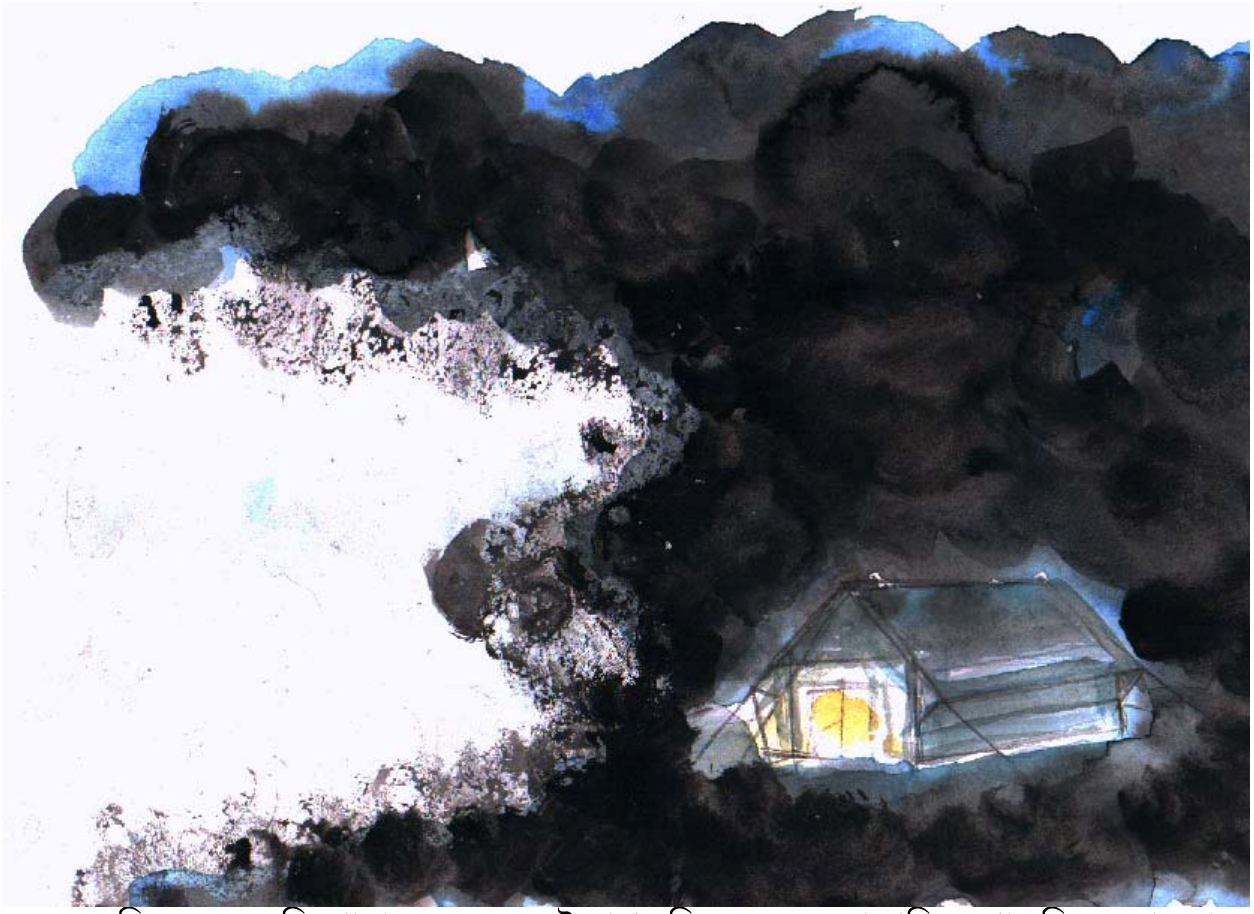

সত্যি বলতে কি,পাহাড় জঙ্গলের নৈশপ্রকৃতির যেসব স্বাভাবিক প্রাকৃতিক আওয়াজ আছে, তার কোনোটাই শোনা যাচ্ছিল না এখানে। একটা টুপটাপ সাধারণ আওয়াজও নয়।

''এ কি অদ্ভুত জায়গায় এসেছি আমরা? এ তো অন্য একটা জগত, এখানে যেন জীবিত প্রাণের কোনো স্পর্শ নেই---'' না চাইলেও আমার মুখ থেকে কথাগুলো বেরিয়ে গেল। অন্য সময় হলে আমার এই নাটকীয় সংলাপ শুনলে চঞ্চলদা হাসত। আজ আর হাসল না। ভুরু কুঁচকে একটা সিগারেট ধরালো।

আমি ফ্লাস্ক থেকে এক কাপ কফি নিলাম। ভীষণ ক্লান্ত লাগছে, অথচ কেমন একটা আশংকা আর উত্তেজনায় সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে গেছে। প্রত্যেকটা মুহূর্ত যেন অনন্তকাল মনে হচ্ছিল।

আগুনটা নিভে আসছে। কাঠ দিয়ে ওটাকে একটু উশকে দেবার জন্য তাঁবুর বাইরে বেরোলাম--আর তখনই চোখ গেল হ্রদের দিক বরাবর। একটা আশ্চর্য আলো আসছে ওদিক থেকে। তীব্র নয়,হালকা---অথচ অনেকদূর অবধি তার রেশ ছড়িয়ে পড়ছে।

পিছন ফিরে ডাকতে গিয়ে দেখি চঞ্চলদা বেরিয়ে এসেছে। আমার যেন ভয় লাগছিল এতক্ষণ। চঞ্চলদা পাশে এসে দাঁড়াতে সাহস ফিরে এল। দুজনে মূর্তির মতন দাঁড়িয়ে দেখতে থাকলাম।

হ্রদটা সেই আশ্চর্য হালকা আলোতে আলোকিত হয়ে গেল। ধীরে ধীরে তার তলাও স্বচ্ছ কাচের মতন স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠল। আশ্চর্য্! পাথরের ঘরবাড়ি।ভাঙাচোরা নয়,আস্ত। রীতিমতন স্বাভাবিক বাড়ি, গেরস্থালি, গোশালা। আস্তে আস্তে একটা গোটা গ্রাম যেন হ্রদের তলায় জেগে উঠল!!!

আমরা চিত্রার্পিত হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম---হঠাৎ হালকা সাদা কুয়াশা চারদিক থেকে জমতে শুরু করল-- আমাদের ঘিরে এগিয়ে এল। বুঝতে না বুঝতেই কুয়াশার ঘন পর্দা এসে গ্রাস করলো চারদিক। চঞ্চলদা চমকে উঠেই আমার হাত ধরে হেঁচকা টান দিয়ে বললো , ''দৌড়ো--তাঁবুর দিকে দৌড়ো---''

তাঁবুটা মাত্র কয়েক মিটার দূরে। কিন্তু সেটুকু পথ পেরোতেই যেন অনন্তকাল লাগলো। ঘন কুয়াশার নদীতে যেন সাঁতার দিতে দিতে এগোলাম। চঞ্চলদা সেদিন না থাকলে যে কী হত কে জানে!

চঞ্চলদা তাঁবুতে ঢুকে দরজাটায় শক্ত করে গিঁট দিয়ে দিল। এক মুহূর্তর জন্য বাইরে চোখ গেছিল। সমস্ত চরাচর শুধু সাদা- উর্ধ্ব থেকে অধ:লোক শুধুই শ্বেতশুভ্র---আর কিছুর অস্তিত্ব নেই যেন। আমি হাঁফচ্ছিলাম। চঞ্চলদা গুম হয়ে বললো, ''ভুল করেছি। সকালে আসা উচিত ছিল এপারটায়, রাতে নয়---''

আমার মনে হল চঞ্চলদা ঠিক কথাই বলেছে---এটা যেন ঠিক এই পৃথিবীর জগৎ নয়, এপারে সবকিছুই ধরাছোঁয়ার আর ব্যাখ্যার বাইরে।

চঞ্চলদা প্রস্তাব দিল, ''চল,বসে গল্প করি। ওরা উঠলে এসব বলিস না। সত্যদা বিশ্বাস করবে না।''

বাইরের জগত নিয়ে আর মাথা ঘামাবার ইচ্ছে না হলেও ভীষণ কৌতূহল জাগছিল। চঞ্চলদা নাগজিকা ফরেস্ট বাংলোর অতিপ্রাকৃত সব গল্প করে আমাকে অন্যমনস্ক করার চেষ্টা করছিল। আদপে কিন্তু আমরা দুজনেই মন বসাতে পারছিলাম না।

এক ঘন্টার মাথায় সত্যদাদের তুলে দিলাম। সত্যদা উঠেই বিরক্ত মুখে বলল,''কী হে, বীর পুরুষেরা! তাঁবুর ভিতরেই আড্ডা মারছো দেখছি! পাহারার কী হল?''

''পাহারা দিচ্ছি সে তো দেখতেই পাচ্ছো গুরু। বাইরে পাহারা না ভিতরে পাহারা, এসব কন্ডিশন তো দাওনি,'' চঞ্চলদা হালকা চালে বললো।

সত্যদা বিরক্তমুখে সব ঝেড়েমুছে উঠে টর্চ নিয়ে বকবক করতে করতে তাঁবুর দরজার দিকে এগিয়ে গেল দেখে চঞ্চলদা উঠে দাঁড়িয়ে পথ আগলালো।

''সত্যদা, যেও না। যেতে পারবে না। প্রচন্ড ঘন কুয়াশা। কিছু দেখা যাচ্ছে না বাইরে!''

''কুয়াশা? কিন্তু ফাঁকফোকর দিয়ে তো কিছুই ঢুকছে না? এ আবার কী কুয়াশা?'' অতনুর ঘুমভাঙা গলা পেলাম।

''উঁকি মেরে দ্যাখো। বিশ্বাস কর, ভীষণ ঘন কুয়াশা। আজ রাতে আর তাঁবুর বাইরে বেরিও না প্লিজ সত্যদা!''

সত্যদা চঞ্চলদার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, ''কী বলছিস চঞ্চল?''

''হ্যাঁ ঠিকই বলছি গুরু। রাতটা কোনোরকমে কাটিয়ে দাও, কাল সকালে সূর্য উঠলে সবাই একসঙ্গে বেরোবো---এখন নয়!'' চঞ্চলদা ভীষণ উত্তেজিত।

সত্যদা এবার চঞ্চলদার চোখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর কী ভেবে থেমে গেল। আমরা আর বেশি কথা না বলে স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে ঢুকে পড়ে চোখ বোঁজার চেষ্টা করলাম। ভীষণ ক্লান্ত ছিলাম, পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙল অতনুর ধাক্কায়, ''ওঠ্ ওঠ্, এদিকে কী আশ্চর্য ব্যাপার ঘটছে!!''

ধড়মড় করে উঠে দেখি বাকিরা তাঁবুর পর্দার ফাঁক থেকে বাইরে কী যেন দেখছে। আর হুঁশ আসতে কানে এল একটা আওয়াজ।

''শুনতে পাচ্ছিস?'' অতনুর গলা।

হ্যাঁ,পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছিলাম। কাল রাতের সেই আওয়াজ আরো স্পষ্ট, স্পষ্টতর। মানুষের গলা। একসঙ্গে অনেক মানুষের গলা। মেয়েদের তীক্ষ্ণ গলা, শিশুর চিৎকার আর পুরুষদের ভারি গলা। সব মিলিয়ে যেন সাধারণ কোনো শব্দ নয়, একটা চিৎকার অথবা আর্তনাদ----ধীরেধীরে পরিণত হচ্ছে সম্মিলিত হাহাকারে-- সে কি তীব্র আর মর্মভেদী কি বলব! আমার মেরুদন্ড বেয়ে শীতল একটা স্রোত বয়ে গেল। আর্তনাদ ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে, আবার ফিরে আসছে। যেন সারারাত ধরে একই হাহাকারের পুনরাভিনয় চলছে। বেশিক্ষণ ধরে শুনলে হয়তো পাগল হয়ে যেতাম। কিন্তু তার আগেই একটা ভয়ংকর কাণ্ড ঘটল। সত্যদা তাঁবুর বাইরে গলা বাড়িয়ে দেখছিল। তখন একাই ছিল। হঠাৎ গোঙানীর আওয়াজ এল। যেন কেউ তার গলা টিপে ধরেছে। অতনু এক লাফে সত্যদার কাছে পৌঁছে গেল, পিছনপিছন চঞ্চলদা আর আমি।

সত্যদা আর কথা বলার অবস্থায় নেই তখন আর, চোখ ঠিকরে আসছে,মুখ বিকৃত হয়ে গেছে যন্ত্রনায়--কী হল সত্যদার।

অতনু পিছন থেকে সত্যদাকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরতে গিয়ে বিদ্যুৎপৃষ্টের মত ছিটকে এল।

''সত্যদার গলার দুটো হাত--- আমি টের পেয়েছি,কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না---তোমরা দেখতে পাচ্ছো কি?--'' অতনুর গলায় ভয়ানক আতংক!

''হাতটা ছাড়া! সত্যদা মরতে বসেছে যে--''

চঞ্চলদা তার সর্বশক্তি দিয়ে সত্যদার গলা থেকে অদৃশ্য দুটো

শক্তিশালী হাতকে ছাড়াতে লাগল। অতনুও এপাশ থেকে সেই অদৃশ্য হাত ধরে টানাটানি করতে লাগল---দুজনেরই গলায় বিকৃত চিৎকার। আমি দেখলাম অদৃশ্য আততায়ী যেন সত্যদার গলা ছেড়ে চঞ্চলদাকে আক্রমণ করলো। আমিও অমনি দূর্গা বলে চঞ্চলদার কোমর ধরে ঝুলে পড়লাম। আমাদের বোধহয় কারুরই স্বাভাবিক চেতনা কাজ করছিল না। প্রবল উত্তেজনায় স্নায়ু উদ্দীপিত হয়ে গেছিল, গলা থেকে অদ্ভুত সব আওয়াজ বেরোচ্ছিল, আর শরীরের সর্বশক্তি দিয়ে সবাই যেন যুদ্ধ করছিলাম!!

একসময়ে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। অদৃশ্য হানাদার চলে গেছে। অতনু হাফাঁচ্ছিল। তাঁবুর পর্দার গিঁট মারতে মারতে বলল, ''অধি, সত্যদা বেঁচে আছে তো?'' সত্যদা নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল মাটিতে। চঞ্চলদাও মাথা নীচু করে বসে বড়বড় নিশ্বাস ফেলছিল।

আমি সত্যদার মাথায় মুখে জল ছিটোতে ছিটোতে গলায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলাম। অতনু এমার্জেন্সি আলোটা জ্বালালো। সত্যদার গলায় গভীর দাগ, নীল হয়ে গেছে- নিষ্ঠুর ভাবে কে যেন তার গলাটা টিপে মুচড়ে দেবার চেষ্টা করছিল।

একটু পরে সত্যদার জ্ঞান ফিরল।

গলা স্বাভাবিক হলে বলল,''উ: কী সাংঘাতিক!!মরেই যাচ্ছিলাম আজ,তোরা না থাকলে----''

''সত্যদা, কী হয়েছিল বলো তো?''

''আমি কিছুই করিনি,বুঝলি? ঐ হাহাকারের উৎসের দিকে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করছিলাম। এত ঘন কুয়াশা কিছুই দেখা বা বোঝা যাচ্ছিল না। কিন্তু হঠাৎই মনে হল দুটো শক্ত হাত দিয়ে কে আমার গলাটা ভীষণ জোরে টিপে ধরলো। চীৎকার করবার চেষ্টা করেছিলাম---গলা থেকে গোঙানি বের হলো, বেশ বুঝলাম।

''কিন্তু---কিন্তু জানিস---'' সত্যদার চোখমুখ আতঙ্কে বিবর্ণ হয়ে গেছে, ''---কাউকে দেখতে পেলাম না! স্পষ্ট টের পেলাম দুটো হাত অথচ দেখতে পেলাম না।''

''আমরাও টের পেয়েছি সত্যদা---'' চঞ্চলদা নিজের গলায় হাত বুলোতে বুলোতে বলল।

''আমিও,'' অতনুর আতংকিত গলা, ''--ভয়ংকর শক্তি হাতদুটোতে। আমার সব শক্তি দিয়েও ঠেলে সেগুলোকে ছাড়াতে পারছিলাম না! আর জানো,অদৃশ্য হাতগুলো বেশ গরম ছিল, মানে স্বাভাবিক আমাদের মতন---''

অতনু কি বলতে চাইছিল আমরা সবাই বেশ বুঝতে পারছিলাম---আর টের পাচ্ছিলাম বাইরে ঘন কুয়াশার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনের মধ্যে ভীষণ একটা আশংকা যেন ছেয়ে ফেলেছে।

''আমরা এ কোথায় এলাম সত্যদা?'' সত্যদা আর ভরসা দেবার ভাষা খুঁজে পেল না। আমি একে একে থাঙ্গার গল্প, কাল রাতের আলো আর আওয়াজ আর আজকের প্রথম প্রহরের অলৌকিক আলোর কথা খুলে বললাম।

''চঞ্চল,এ কী সত্যি?'' সত্যদার গলা শোনা গেল। যেন কাঁপছে।

''সত্যি সত্যদা--তুমি বিশ্বাস করবে না তাই বলিনি। সত্যি বলতে কী অলৌকিক বিশ্বাস করি না।কিন্তু এখন অবধি যা ঘটল,তাকে যুক্তি দিয়ে ঠিক মেলাতে পারছি না।''

''একেই কি গোষ্ঠীপতি মায়া বলেছিল? ওদের সব গল্পগুলো একে একে মনে করো--- ভূমিকমপ, পুরো গ্রাম চলে গেল হ্রদের তলায়! যারা থাকত ঐ গ্রামে, তারা নিশ্চয়ই মরে গেছিল। কিন্তু এখন এখানে কারা আছে? তারা মানুষ নাকি অন্যকিছু--?'' অতনুর গলাটা তীক্ষ্ণ শোনালো।

''তারা যাই-ই হোক,তারা আমাদের এখানে আসাটা পছন্দ করছে না।''চঞ্চলদা বলল, ''তোরা সতর্ক থাকিস।সারারাত জেগে থাকতে হবে।আরো কঠিন যুদ্ধের মোকাবিলা করতে হবে,আমার মন বলছে।''

ক্রমশ

১। পাগলের পাল্লায়ঃ

একটা লোক একটা পাগলা গারদের পাশ দিয়ে আসতে আসতে হঠাৎ শোনে রাস্তার পাশের একটা ঘরের দেয়ালের একটা ছোট গর্ত । আর তার ঠিক পেছনে ঘরের ভেতর থেকে ভারি করুণ গলায় একটা আওয়াজ ভেসে আসছে—তেরো তেরো তেরো তেরো- - - -

খানিক বাদে আবার পাগলা গারদের পাশ দিয়ে উলটো মুখে যাবার সময় সে শোনে সেই একই গলাটা এখনো একঘেঁয়ে ভঙ্গীতে সেই একই কথা বলে চলেছে। কৌতুহলি হয়ে ব্যাপারটা কী দেখবার জন্য লোকটা গিয়ে যেই গর্তটায় চোখ রেখেছে অমনি ভেতর থেকে একটা আঙুল দিয়ে পাগলটা লোকটার চোখে মোক্ষম এক খোঁচা মেরেছে। লোকটা আর্তনাদ করে পিছিয়ে আসতেই শোনে এইবারে ভেতর থেকে পাগলটা একঘেঁয়ে গলায় বলছে চোদ্দো—চোদ্দো—চোদ্দো—চোদ্দো-

২। হাজির জবাবঃ

দোকানে এসে এক ভদ্রলোক বললেন, আমায় অর্ধেকটা ফুলকপি কেটে দাও দেখি। কাউন্টারের থেকে ছেলেটা বললো, “আমরা অর্ধেক ফুলকপি বেচিনা দাদু। নিলে গোটা নিতে হবে।”

“উঁহু, আমার অর্ধেকটাই চাই।”এই বলে ভদ্রলোক মহা চোটপাট শুরু করে দিলেন। ঝগড়া বাড়তে দেখে ছেলেটা তাড়াতাড়ি ভেতরের ঘরে ঢুকে মালিককে বলে, “স্যার একটা বুড়ো পাগল এসে অর্ধেক ফুলকপি কিনতে চাইছে- - ” এই বলেই সে দেখে বুড়ো ভদ্রলোক তার পেছন পেছন মালিকের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়ে তার কথা শুনছেন। ছেলেটা তাড়াতাড়ি ফের বললো, “আর বাকি অর্ধেকটা এই ভালোমানুষ ভদ্রলোকটি নেবেন বলছেন। দিয়ে দিই স্যার?”

খরিদ্দার খুশি হয়ে চলে যাবার পর মালিক বেশ আনন্দিত হয়ে বললেন, “তুই দেখছি ছোকরা বেশ বুদ্ধিমান। জোর সামলে নিলি তখন! তোর বাড়ি কোথায়?”

“আজ্ঞে দুর্গাপুরে।”

“সে কী রে? দুর্গাপুর থেকে কলকাতায় চলে এলি যে বড়ো?”

“ওখানে ভালো লাগছিলো না স্যার। গোটা শহরে সব লোক চোর। পুলিশের জ্বালায় দিনরাত অস্থির।”

“কী বললি? জানিস আমার বাবা দুর্গাপুরের লোক?”

ছেলেটা অমনি একগাল হেসে বললো, “কোন থানায় ছিলেন স্যার উনি?”

লিখিব

খেলিব

আঁকিব

ঘুরে

লেখায়, আঁকায় ‘বন্ধু’ সংস্থার সদস্যরা—অরণ্য, পূর্ণিমা ও মুকুট।

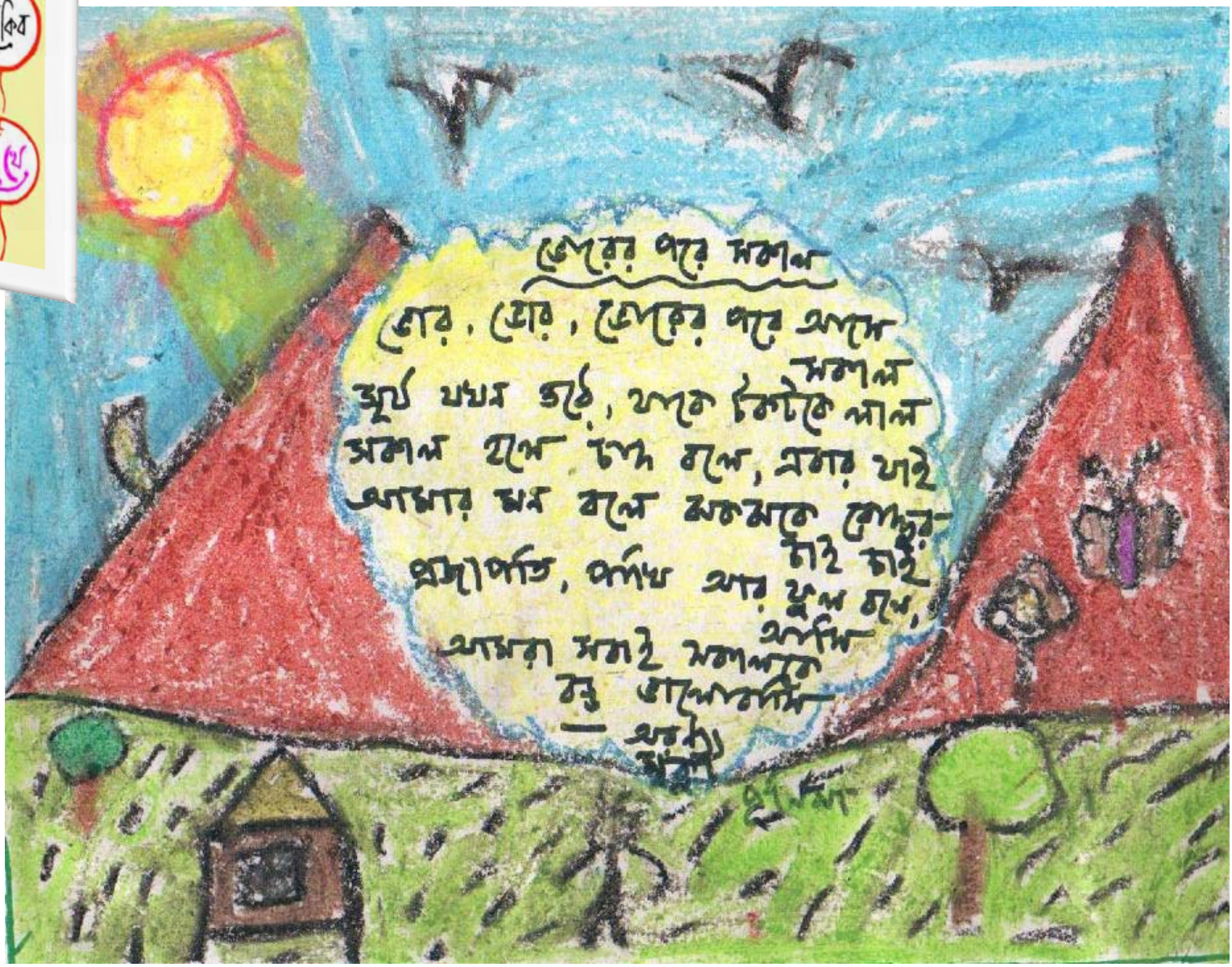

গ্যালারি

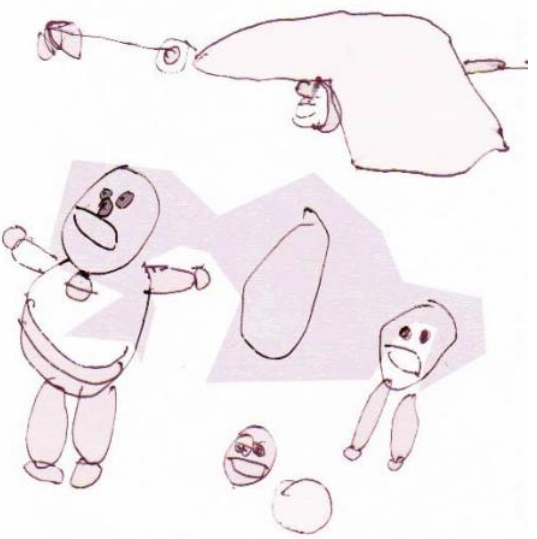

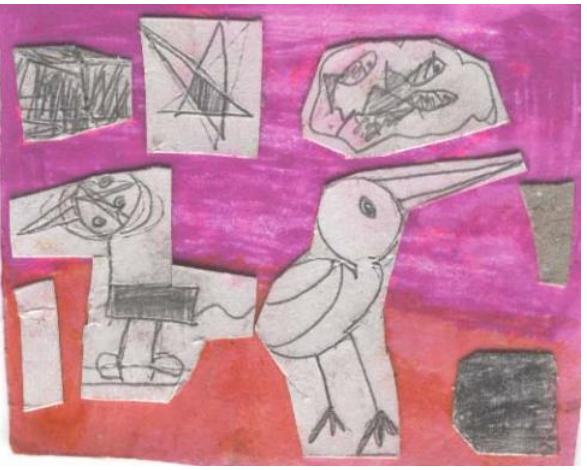

এবারের বিষয় ছিলো “রাত্রি এলো”। তাতে সমাদৃতা এঁকেছে সুর্যাস্তের ছবি, বউল একটা শেড লাগানো রাত বাতি পাঠিয়েছে আমাদের দপ্তরে। তার থেকে আবার লালনীল আলোর কণা ঝরছে। রুপসু এঁকেছে দিনের শেষে রঙিন আলোয় ভাসা এক খেলনা ভরা ঘর। আর তান বলছে, রাত্রি মানেই চোর গুণ্ডা, বন্দুক পিস্তলের রোমাঞ্চকর রাজ্য। কেমন লাগলো তোমাদের জানিও।

মহোৎকট কথা

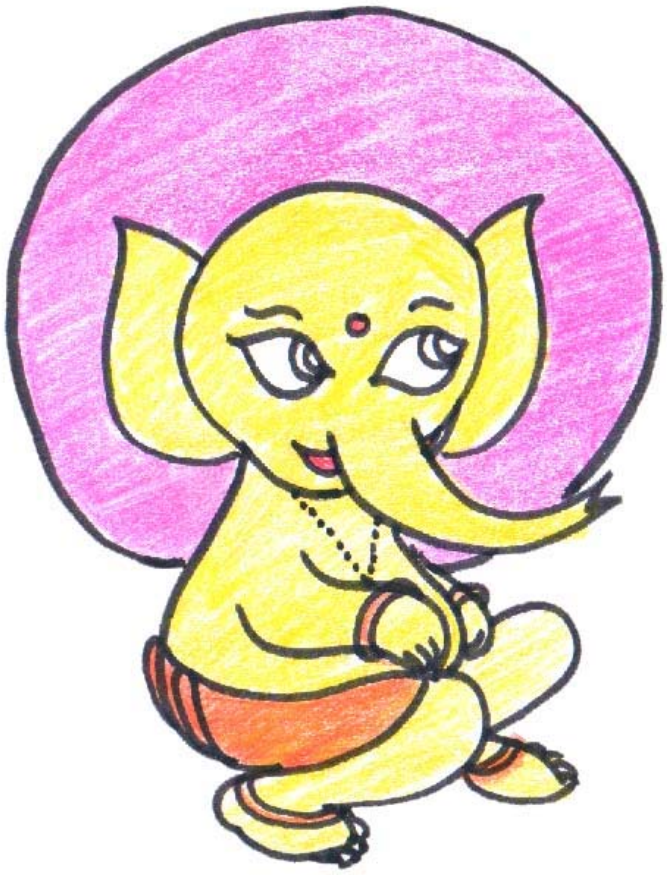

সংহিতা

নিজেদের আশ্রমে সুখে শান্তিতে বাস করতেন ঋষি কাশ্যপ ও তাঁর স্ত্রী অদিতি। অদিতি পুণ্যবলে পুত্র হিসেবে দেবতাদের গর্ভে ধারণ করার, লালন- পালন করার দুর্লভ ভাগ্যের অধিকারিণী ছিলেন। তাঁর সন্তানদের মধ্যে ছিলেন ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ। তাঁর বড় সাধ হয়েছিল স্বয়ং সিদ্ধিদাতা বিনায়ককে সন্তান হিসেবে পাওয়ার। তিনি সে ইচ্ছের কথা কাশ্যপমুনিকে জানাতে মুনি তাঁকে বলে দিয়েছিলেন সিদ্ধিদাতার ধ্যান করার মন্ত্র। কঠিন তপস্যায় অদিতি তুষ্ট করেছিলেন বিনায়ক গণেশকে। ভগবান গণেশ অদিতিকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি যথা সময়ে অদিতির সন্তান হয়ে জন্মাবেন।

***

পৌরাণিক বন রাজ্যে গঙ্গার তীরে বাস করতেন পুণ্যবান ঋষি রুদ্রকেতু ও ঋষিপত্নী সারদা। তাঁদের দুই পুত্র ছিলেন নরান্তক ও দেবান্তক। এই দুই ঋষিপুত্র ছিলেন যেমন রূপবান তেমন শক্তিমান। তাঁরা সাধনায় মহাদেবকে খুশি করে বর পেয়েছিলেন ত্রিলোকের যত মানুষ, যত পশু, যত পরি, যত দত্যিদানো, এমনকি যত দেবতা সব্বাইকে হত্যা করা ক্ষমতা। এই অপরাজেয় শক্তি নিয়ে তাঁরা অল্প সময়ের

মধ্যেই ত্রিলোকে হুলুস্থুল বাধিয়ে দিলেন। নরান্তক পৃথিবীর আর পাতালের সমস্ত বীরকে পরাস্ত করে ফেললেন, আর দেবান্তক হারিয়ে দিলেন স্বর্গের সব দেবতাকে। ফলে স্বর্গ মর্ত্য পাতাল জুড়ে স্থিতি টলে গেল, মহা ওলোট-পালোট হয়ে গেল রোজকার জীবন। জগতজুড়ে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠল।

যখন ত্রিলোকের প্রায় নাভিশ্বাস ওঠার দাখিল হলো নরান্তক ও দেবান্তকের দানবিক শাসনে তখন ভগবান গণেশ দায়িত্ব নিলেন জগতের স্থিতি ফেরানোর। তাই তিনি ঠিক করলেন অদিতির সন্তান হয়ে জন্মবেন। ফলে একদিন দেখা দিলেন কাশ্যপমুনির আশ্রমে। অদিতি তাঁর স্তবস্তুতি গাইলেন খুব করে। তারপর বললেন, "হে সর্বেশ্বর, আপনি শিশু হয়ে যান যাতে আমি আপনাকে কোলে নিতে পারি আর আপনার যত্ন-আত্তি করতে পারি। আপনাকে আদর আর শাসন করতে পারি"। বহু দেবতার লালনের সৌভাগ্যধন্য এই মানুষী মায়ের অনুরোধ রাখতে গণেশ এক হৃষ্টপুষ্ট মানবশিশুর রূপ নিলেন। কাশ্যপ মুনি তাঁর নাম রাখলেন মহোৎকট। অদিতি ও কাশ্যপ মুনির ঘর আলো করে এক দেবশিশুর আগমনের খবর ছড়িয়ে গেল দিকে দিকে। ত্রিলোকের সমস্ত ঋষি এসে সেই নবজাতককে আশীর্বাদ করে গেলেন। ত্রিলোকের আশীর্বাদে পরম বলশালী মহোৎকট ক্রমশ বেড়ে উঠতে লাগলেন আশ্রমের অনাড়ম্বর জীবনে।

এদিকে অসুরেরাও নরান্তক ও দেবান্তকের জমানায় পরমানন্দে দিন কাটাচ্ছিল। তাদের বাড়বাড়ন্তের কোনো সীমা ছিল না। তাদের কানেও মহোৎকটের জন্মের খবর পৌঁছেছিল। তারাও আসত মাঝে মাঝে কাশ্যপ মুনির আশ্রমে দেবতা কিংবা মানুষের ছদ্মবেশে। সুযোগ বুঝে মেরে ফেলার চেষ্টা করত দেবশিশু মহোৎকটকে। দেবশিশুও সেই ছদ্মবেশের আড়ালেই কৌশলে তাঁদের হত্যা করতেন।

এইভাবেই মহোৎকটের বয়স ষোল পেরোল যখন তখন একদিন কাশীরাজ এলেন কাশ্যপ মুনির আশ্রমে। কাশী রাজবংশের কুলগুরু ছিলেন কাশ্যপ মুনি। কাশীরাজ কাশ্যপ মুনিকে তাঁর রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছিলেন তাঁর পুত্র কাশীরাজ্যের যুবরাজের বিয়ের অনুষ্ঠান পরিচালনা করার জন্য। কাশ্যপ মুনি তখন

এক কঠিন সাধনা করছিলেন। তিনি কাশীরাজকে বললেন, "মহোৎকটই পারবে বিয়ের অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে। আপনি ওকেই আপনার সঙ্গে নিয়ে যান"। মুনির কথা মতো কাশীরাজ মহোৎকটকে নিয়ে চলেছিলেন নিজের রাজ্যের দিকে। পথে পড়ল অনেক বন, কিছু নগর, কিছু শ্মশান, কিছু মশান। এরকম এক বনে হঠাৎ দেখা দিল এক অদ্ভূত আলো। কাশীরাজের রথ থেকে লাফ দিয়ে নেমে, আলো যেখান থেকে আসছিল সেদিকে ছুটে গেলেন মহোৎকট। গিয়ে দেখলেন ধুমরক্ষ নামে এক রাক্ষস সাধনায় সূর্যকে তুষ্ট করেছে বলে সূর্য তাঁকে এক অপরাজেয় মারণাস্ত্র বর দিতে চলেছেন। সে মারণাস্ত্রের আলোই ছড়িয়ে পড়ছিল চতুর্দিকে। মহোৎকট দৌড়ে গিয়ে সে অস্ত্র ছিনিয়ে নিলেন। আর তারপর ছুঁড়ে মারলেন ধুমরক্ষের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে পুড়ে ধুমরক্ষ ছাই হয়ে গেল তখনই। কাশীরাজ ভীষণ অবাক হয়ে গেলেন।

কাশীরাজ যখন মহোৎকটকে নিয়ে রাজধানীতে পৌঁছলেন তখনও রাজপুত্রের বিয়ের কয়েক সপ্তাহ বাকি ছিল। ফলে খেলেধুলে কাটতে লাগল মহোৎকটের সময়। ক্রমশ রাজধানীর সমস্ত লোকের মন জয় করে ফেললেন তিনি তাঁর অতিমানবিক ক্ষমতায় আর শক্তিতে। এই সময়েই তিনি মেরে ফেলেছিলেন, রাজধানী আর রাজপ্রাসাদে ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়ানো দৈত্যদানোদের সব গুপ্তচরকে।

এদিকে ত্রিলোকজুড়ে নরান্তক তাঁর গুপ্তচর ছড়িয়ে রেখেছিলেন। কাশীর খবরে তিনি বেশ ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন। সব লুকোচুরি ফেলে তিনি নিজের চেহারা ধরলেন আর সোজাসুজি ঝাঁপিয়ে পড়লেন কাশীরাজ্যের ওপর। কাশীর লোকজন ভীষণ ভয় পেয়ে মহা শোরগোল বাধিয়ে তুললেন। মহোৎকটও নেমে পড়লেন প্রতিকারে। তিনি নরান্তককে যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে তার প্রাণনাশ করলেন।

একটা ব্রাহ্মণের ছেলের হাতে অপরাজেয় ভাইয়ের মৃত্যুর খবর বড়ো অপমান হয়ে বাজল দেবান্তকের বুকে। তিনি তখন তাঁর অতিপ্রিয় আট দানবকে পাঠালেন মহোৎকটকে বধ করে ভাইয়ের হত্যার প্রতিশোধ নিতে। আট দানব কর্দম, দীর্ঘদন্ত, তালজঙ্ঘা, যক্ষ্ম, ঘন্টাসুর, রক্তকেশ, কালান্তক আর দুর্জয় একসাথে খুব চেষ্টা করলেন কাশীরাজ্যের সৈন্যবাহিনী ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য। কিন্তু একা মহোৎকটই আলাদা

আটটা শক্তির রূপ নিলেন আট দানবকে বধকরার জন্য। অণিমা হয়ে বধ করলেন কর্দমকে, মহিমা রূপে বধ করলেন দীর্ঘদন্তকে, গরিমা রূপে তালজঙ্ঘাকে, লঘিমা হয়ে যক্ষ্মকে, ঘন্টাসুর, রক্তকেশ, কালান্তক ও দুর্জয়কে বধ করলেন যথাক্রমে ঈশিত্ব, প্রাপ্তি ও প্রকাশ্য রূপে। শেষে দেবান্তকের সাথে মহোৎকটের সরাসরি লড়াই অবধারিত হয়ে দাঁড়াল। দেবান্তক মায়ার আশ্রয় নিলেন আর মহোৎকট দেবতা গণেশের স্বরূপ নিলেন। দুহাতে দেবান্তক চেপে ধরলেন গণেশের দুই গজদাঁত। গণেশ তাকে ঠেলে সরিয়ে দিলে দেবান্তক গিয়ে আছড়ে পড়লেন মাটিতে। তার একহাতের মুঠোয় রয়ে গেল গণেশের একটা গজদাঁতের টুকরো। তখন গণেশ অন্য গজদাঁত বিঁধিয়ে দিলেন দেবান্তকের মাথায়। ফলে দেবান্তক বধও সারা হয়ে গেল দেবতা গণেশের।

এইভাবে ত্রিলোক মুক্তি পেল দানবিক শাসনের রুদ্ধশ্বাস দশা থেকে। মহোৎকট কাশীরাজপুত্রের বিয়ের সব অনুষ্ঠান সেরে ফিরে গেলেন তাঁর মানুষ- মানুষী বাবা- মায়ের কাছে। তাঁদের কাছে গিয়ে বললেন যে তিনি যে কাজের জন্য পৃথিবীতে এসেছিলেন তা সারা হয়ে গেছে বলে তিনি মানুষের জগৎ থেকে বিদায় নিতে চান। প্রিয় পুত্রের সাথে ছাড়াছাড়ি হওয়ার দুঃখে কাতর হয়ে পড়লেন কাশ্যপ মুনি ও তাঁর স্ত্রী অদিতি। তখন তাঁদের স্বান্তনা দিতে গণেশ বললেন যে যখনই পৃথিবীতে দেবী দুর্গা আসবেন পুজো নিতে তখনই দেববেশে গণেশ দেখা দেবেন পৃথিবীতে। তারপর তিনি আবার স্বর্গে ফিরে গেলেন।

আনুমানিক ১৩০০ খ্রিষ্টাব্দে রচিত গণেশপুরাণ থেকে নেয়া।

রাশিয়ান সাহিত্য

চাষার বুদ্ধি

মলডোভিয়া- র লোককথা

এক দেশে ছিলো এক জমিদার। সে সবসময় অহংকারে মটমট করত। লোকজনের সঙ্গে কথা বলত না মোটে। চাষাভুষোদের তো একেবারে দুচ্ছাই করত সবসময়। বলত, গা থেকে মাটি মাটি গন্ধ বের হয়, ওগুলো আবার মানুষ নাকি! বাড়ির চাকরবাকরদের ওপর কড়া আদেশ ছিল, প্রাসাদের ত্রিসীমানায় কোন চাষা এলে তাকে যেন দূরদূর করে তাড়ানো হয়।

একবার জমিদারের কয়েকজন চাষাভুষো প্রজা একত্র হয়ে জমিদারমশাইকে নিয়েই গল্প করছিলো। তাদের একজন গর্ব করে বলল, "বুঝলি, আমি না জমিদারবাবুকে একেবারে কাছ থেকে দেখেছি সেদিন। মাঠে এসেছিলো ফসলের তদারক করতে, তখন।"

দু'নম্বরজন বলে, "আমিও দেখেছি সেদিন। পাঁচিলের এপাশ থেকে বাড়ির দিকে চেয়ে দেখি বারান্দায় বসে কফি খাচ্ছে।"

তিন নম্বর যে চাষা আড্ডায় বসেছিলো , সে ছিলো সবচেয়ে গরীব, কিন্তু সবচেয়ে বুদ্ধিমানও।সে মুচকি হেসে বলল, “দূর দূর, পাঁচিলের ওপর দিয়ে তো যে কেউ উঁকি মেরে জমিদারকে দেখতে পারে। ওতে আবার বলার কী আছে? আর জমিদার যখন মাঠে যায় তখন তো মাঠের পাশে জঙ্গলের শেয়ালটাও তাকে দেখতে পায়। ফুঃ।”

“তুই তাহলে কী পারিস তাই বল,” রেগে গিয়ে বলল, অন্য দুই চাষা।

“আমি? আমি ইচ্ছে করলে জমিদারের সাথে এক টেবিলে বসে খেয়ে আসতে পারি।”

অন্য দুজন সবাই তাই শুনে হেসে উঠে বলে, “পাগল নাকি? তোকে ত্রিসীমানায় আসতে দেখলে জমিদারবাবু লোক দিয়ে দূরদূর করে তাড়িয়ে দেবে দেখিস। আবার বলে জমিদারের সঙ্গে খাবার খাবে! ব্যাটা হামবাগ! হা হা- - ”

এইভাবে দুই চাষা মিলে তিন নম্বর চাষাকে নিয়ে হাসাহাসি করতে লাগল। তিন নম্বর চাষা কিন্তু তাও বলে যাচ্ছে সে ইচ্ছে করলেই জমিদারের সঙ্গে এক টেবিলে বসে খেয়ে আসতে পারে। শেষে এই নিয়ে বাজি ধরা হলো, যদি চাষা সত্যি জমিদারের সঙ্গে এক টেবিলে বসে খেতে পারে তাহলে অন্য দুজনের কাছ থেকে সে পাবে তিন বস্তা গম আর দুটো বলদ। আর হেরে গেলে অন্য দুজন যা বলবে তাই করতে হবে তাকে।

তিন নম্বর চাষা এবারে আড্ডা ছেড়ে উঠে গুটি গুটি গিয়ে ঢুকলো জমিদারবাড়ির উঠোনে। যেই না তাকে সেখানে পা দিতে দেখা, অমনি জমিদারের পেয়াদারা রে রে করে তেড়ে এলো তাকে কান ধরে বাইরে বের করে দেবে বলে।

চাষা কিন্তু একটুও ঘাবড়ে না গিয়ে পেয়াদাদের সর্দারকে বললো, “আরে কথাটা আগে শুনবে তো! জমিদারমশাইয়ের জন্য বেশ ভালো একটা খবর আছে।”

সর্দার বলল, “কী খবর?”

“সে আমি তোমায় বলবো না। কেবল জমিদারবাবুকেই বলব,” গোঁ ধরে বলল চাষা। সে গোঁ তার ভাঙায় কার সাধ্য।

খবর গেল অন্দরমহলে জমিদারবাবুর কাছে। শুনে জমিদারের একটু কৌতুহল হল। কোন ভালো খবর এনেছে চাষাটা কে জানে। একবার শুনে নিলে হয়। কে জানে দু পয়সা লাভও হয়তো হয়ে যেতে পারে ও থেকে! “আচ্ছা ডেকে আন ওটাকে ভেতরে,” বলে আদেশ দিলেন তিনি।

কাছারিঘরে চাষার সঙ্গে জমিদারের দেখা হল। তিনি গোঁফ চুমরে বললেন, “কীরে ব্যাটা চাষা! কী খবর এনেছিস?”

“আজ্ঞে সে একেবারে গোপন কথা বাবু। একদম একা একা শ্রীচরণে নিবেদন করতে চাই,” বিনয়ে গলে পড়ে বললো, চাষা।

একটা চাষার এত সাহস দেখে জমিদারবাবু একটু অবাক হচ্ছিলেন। তারপর মনে হল, নিশ্চয় এ ব্যাটা এমন কিছু জেনেছে যাতে তার এত সাহস হয়েছে। কৌতুহলী হয়ে ঘরের সকলকে বের করে দিয়ে তিনি চাষাকে বললেন, “এবার বল।”

“বাবু, মানে বলছিলাম কি, ঘোড়ার মাথার মত বড় একতাল সোনার দাম ঠিক কেমন হতে পারে?”

জমিদার কৌতুহলী হয়ে উঠলো। চাষাটা বলে কী? এতটা সোনার কথা ওর মাথায় এলো কী করে? তবে মুখে সে ভাব না দেখিয়ে সে মৃদু হেসে তাকে জিজ্ঞাসা করল, “কেন রে?”

“সে কারণ একটা আছে। আপনি বলেন না বাবু!”

জমিদারের হাতের তালু চুলকোতে আরম্ভ করলো। চাষা ব্যাটা বিনা কারণে এত প্রশ্ন করবে না। এ নিশ্চয় কোন গুপ্তধন- টনের সন্ধান পেয়েছে।

গলায় মাখন মাখিয়ে জমিদার আবার প্রশ্ন করলো, “বল না বাপু, কেন জানতে চাইছিস এ কথা!”

চাষা গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বললো, “তাহলে আপনি বলবেন না, তাইতো? আমি যাই তবে! খিদে পেয়েছে। বাড়ি গিয়ে দুটো রুটি খাই।”

লোভে তখন জমিদারের বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে। সে ভাবছে,চাষাটাকে কোনভাবে বোকা বানিয়ে সোনার তালটা সরাতে না পারলে তার জীবন বৃথা। নিজের বড়লোকি চাল সরিয়ে রেখে সে বিগলিত গলায় বললো, “রুটি খেতে বাড়ি যাবি কেন বাপ? তুই আজ আমার এখানে রাজভোগ খাবি, কেক খাবি, মাংস খাবি,” বলতে বলতেই বাইরের দিকে চেয়ে হাঁক দিল সে, “এই কে আছিস, শীগগির টেবিলে খাবার সাজা। আমরা দুজন এখন ডিনার খাবো. নিয়ে আয় ঠাণ্ডা মাংসের পিঠে, হাঁসের রোস্ট, বাগানের সেরা ফল আর কিশমিশ দেয়া কেক।”

একটু বাদেই থরে থরে খাবাররের স্তুপে টেবিল ঢেকে দিল চাকরেরা। চাষা তার ওপর হামলে পড়ে মনের সুখে খেতে লাগলো লোভনীয় সব খাবার। জমিদার পাশে বসে তাকে বারবার বলে শুধু, “এটা খাও, ওটা খাও, পেট ভরে খাও, লজ্জা কোর না,” এইসব।

ঘন্টাখানেক পরে পেট পুরে খেয়েদেয়ে মুখ ধুয়ে চাষা এসে বসতে জমিদার মশাই বললেন, “পেট ঠাণ্ডা হয়েছে তো? এবারে যাও বাবা, সেই সোনার তালটা নিয়ে এসো তো! ও দিয়ে কী করতে হবে আমি তার সব জানি। তোমায় আমি এই এত্তোবড়ো চকচকে একটা টাকা দেবো দেখো।”

চাষা চোখ কপালে তুলে বলে “কীসের সোনার তাল?”

“কেন ওই যে বললি, ঘোড়ার মাথার মতো বড়ো—”

“ঘোড়ার মাথার মত বড়ো সোনার তাল? সে আমি কোথায় পাবো?”

জমিদার রেগে গিয়ে বললো, “কথা ঘোরাবি না। এই তো বললি, অমন একটা তালের দাম কতো হতে পারে। বলিস নি?”

“হ্যাঁ বাবু, বলেছি তো,” চাষা মাথা নাড়লো, “মানে হয়েছে কি কাল রাতে আমার ছোট ছেলেটা স্বপ্নে দেখেছে অমন একটা সোনার তাল কুড়িয়ে পেয়েছে আপনার বাড়ির সামনে থেকে। সকালে উঠে ওর দাম কতো হবে তাই নিয়ে যা ঘ্যানঘ্যান জুড়েছে কী বলি। শেষে ভাবলাম, এ গ্রামে আপনার চেয়ে বড়লোক আর কে আছে? তাই আপনার কাছে এলাম দামটা কেমন হতে পারে জানতে। আপনি বললে ছোঁড়াকে গিয়ে তাই বলে শান্ত করি। এখন- - - ”

তার কথাটা শেষ করবার আগেই জমিদার মশাই রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে একটা ডাণ্ডা নিয়ে তেড়ে এসেছন তার দিকে। চাষাও তৈরিই ছিল। এক লাফে ঘর থেকে বেরিয়ে পাঁচিল টপকে পগাড় পার। খেয়েদেয়ে মোটা জমিদার বাবু বা তার চাকরবাকরেরা রোগা চাষার সঙ্গে দৌড়ে পেরে উঠবে নাকি?

সেদিন রাতে চাষা বাড়ি ফিরলো, ভরা পেট, আর বাজিতে জেতা তিন বস্তা গম আর দুটো বলদ নিয়ে।

ছবিঃ সংগৃহীত

নেকড়ের গল্প

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

আমরা হিংস্র ও বন্য পশুদের যত গল্প শুনি, তন্মধ্যে নেকড়ে সম্বন্ধীয় গল্প সর্বাপেক্ষা রোমাঞ্চকর। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র এই জন্তুটিকে দেখিতে পাওয়া যায়, তবে সাইবিরিয়া ও রুশিয়ার উত্তরাংশে, নরওয়ে ও সুইডেনে ইহাদের অত্যাচার খুব বেশী।

৮৫২ সালে শীতের প্রারম্ভে সমস্ত সাইবিরিয়া প্রদেশে বরফে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। এই সময় তুরস্কে ও রুশিয়ায় লড়াই চলিতেছিল। তুরস্কের একদল সেনা লুঠতরাজের জন্য সাইবিরিয়ায় প্রেরিত হয়, কিন্তু রুশিয়ার হাতে তাহারা পরাজিত হইয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। এই ছত্রভঙ্গদলের একটি অংশ এগারজন তুর্কী অশ্বারোহী সৈন্য চারিজন রুশীয় পুরুষ ও একটি স্ত্রীলোককে বন্দী করিয়া সাইবিরিয়ার প্রান্তর ভেদ করিয়া গৃহাভিমুখে ফিরিতেছিল। অশ্বারোহী সেনাদলের প্রত্যেকের কাছে বন্দুক, পিস্তল ও তরবারি ছিল। বন্দীরাও প্রত্যেকে এক একটি অশ্বে আরূঢ় ছিল। প্রান্তর-পথে কিছু দূর যাইতে না যাইতেই, তাহারা সাতটি নেকড়েকে তাহাদের পাছু লইতে দেখিয়া, গুলি করিয়া দুইটিকে হত্যা করে। বাকি পাঁচটি পলাইয়া যায়।

ইহার অল্প কিছুক্ষণ পরেই অশ্বারোহীদল পশ্চাতে এক মহা কলরব শুনিতে পায়। প্রথমে বাতাসের গর্জন মনে করিয়া, তাহারা ঝড়ের ভয়ে দ্রুত ঘোড়া ছুটাইয়া দেয়,

কিন্তু অনতিবিলম্বে বহু দূরে তুষারের উপর অসংখ্য কালো বিন্দুর মত কি যেন নড়িতেছে দেখিয়া, তাহারা ভয়ে শিহরিয়া উঠে। বুঝিতে পারে, বহুসংখ্যক নেকড়ে তাহাদের পাছু লইয়াছে।

ঘোড়াগুলি অনেক পথ অতিক্রম করিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু নেকড়ের ভয়ে তাহাদের গতি অদ্ভুত রকম বাড়িয়া গেল। অশ্বারোহীরা জানিত যে, অন্ততঃ সাত মাইলের মধ্যে কোন আশ্রয় তাহাদের মিলিবে না। সাত মাইল পরে পথের ধারে একটি পরিত্যক্ত কাষ্ঠনির্মিত কুটির মাত্র আছে। সেখানে পৌঁছিলে, ইহাদের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। মাঝে মাঝে তুষার অতি গভীর, বিপুলকায় অশ্বগুলির পা তাহাতে ডুবিয়া, তাহাদের গতি কিছু রুদ্ধ হইতেছিল, কিন্তু নেকড়েরা অমিত বিক্রমে বিনা বাধায় ছুটিতেছে।

এই ভীষণ রক্তলোলুপ জানোয়ারদের চিৎকার উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। তাহারা অত্যন্ত নিকটে আসিয়া পড়িল। তুর্কীসেনারা পরামর্শ করিয়া স্থির করিল, রক্ষা পাইতে হইলে, এক একজন করিয়া ইহাদের হাতে আত্মসমর্পণ না করিলে চলিবে না। প্রথমতঃ বন্দী পাঁচজনের প্রাণ বলি দেওয়াই স্থির হইল। হঠাৎ একজন তুর্কীসেনা বন্দী মহিলাটির ঘোড়াকে আঘাত করিল। অশ্ব ও সওয়ার একসঙ্গে মাটিতে পড়িল। নেকড়েদল নিকটে আসিয়া তাহাদের উভয়কেই নিমেষমধ্যে ছিন্নভিন্ন করিয়া উদরস্থ করিল। ইত্যবসরে অন্যান্য অশ্বারোহীদল অনেকটা অগ্রসর হইয়া গেল।

কিন্তু রক্তের আস্বাদ পাইয়া হিংস্র জানোয়ারগুলা ভীষণতর হইয়া উঠিল ও অধিকতর দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল। বাকি চারিজন বন্দী ও তাহাদের অশ্বগুলিকে নেকড়ের হাতে বলি দেওয়া হইল। কিন্তু তখনও সেই কুটিরে পৌঁছিতে অনেক দেরি। এই অশ্বারোহীদের নেতা তখন নিজেদের বিপদের কথা ব্যক্ত করিয়া, একে একে প্রত্যেককেই মৃত্যু বরণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিল। নেকড়েগুলা তখন অতি নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে। সর্দার সহসা তাহার পার্শ্ববর্তী অশ্বারোহীর অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিল। অশ্বারোহী ভূপতিত হইয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিল। আরোহীহীন অশ্ব প্রান্তর- পথে প্রাণভয়ে ছুটিতে লাগিল। নেকড়েদল অশ্ব ও অশ্বারোহীকে নিমেষমধ্যে খণ্ড খণ্ড করিয়া বাকি কয়জনকে বিনষ্ট করিবার জন্য ছুটিতে লাগিল। এইবার অশ্বারোহীদল গুলি ছুঁড়িতে শুরু করিল। দশজনের গুলিতে দশটা করিয়া নেকড়ে হত হয়, বাকি নেকড়েগুলা সেই দশটাকে

একেবারে ছিন্নভিন্ন করিয়া উদরসাৎ করিয়া ছুটিতে থাকে। ইহা সত্বেও আরো তিনজন অশ্বারোহীর প্রাণ বলি দিবার পর, সৈন্যদল সেই কুটিরে উপস্থিত হইয়া আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হয়।

গত শতাব্দির প্রথমার্ধে প্রকাশিত। বানান অপরিবর্তিত।

ছবিঃ মৌসুমী

সেই আয়না

জয়চাক-পড়ুয়াদের জন্য এবারে কলম ধরলেন শিল্পী সুজয় রায়, তুলির সাথে কলমেও শব্দছবি আঁকায় যাঁর জুড়ি মেলা ভার। তিনি নিয়ে এসেছেন এক আশ্চর্য জাদু আয়না, যার বুকে ধরা পড়েছে পুরোনদিনের সব ছবি, বিহারের গ্রামদেশে কাটিয়ে আসা এক সুন্দর ছোটবেলার গল্পকথা। এসো, আমরা সবাই মিলে দেখতে বসি–

চার

কৌতুকের রঞ্জন বড় মামার কর্মজীবনেও পাওয়া যায়। কিছুটা সে বাস্তব সত্য, অনেকটা কল্পনার তুলিতে তাকে খেলিয়ে তোলা। পেশাতে তিনি চিত্রশিল্পী। প্রথম জীবনে প্রতিকৃতি আঁকবার বায়না পাওয়ার জন্য ঘুরত খদ্দেরের বাজারে। এই অনুপ্রেরণায় একদিন উপস্থিত হল হাইকোর্ট প্রাঙ্গনে। দেখল মামলা চলেছে দুই ভাইয়ের মধ্যে। বাবা জমিদার, উইল করে সম্পত্তির সিংহভাগ দিয়েছে বড় ছেলের নামে। ছোট ছেলের উকিল নালিশ করছে 'ধর্মাবতার, উইল হয়েছে অন্যায়ভাবে। জমিদারমশায় সুড়সুড়িতে কাতর হয়ে পড়েন। He has a fatal affliction to the act of titillation* এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কাতুকুতু দিয়ে তাকে উইল লিখতে বাধ্য করেছে বড় ছেলে।' ছোট ছেলের সাথে আলাপ হতে সে সাগ্রহে বলল বাবার একটা প্রতিকৃতি এঁকে দিতে, যাতে বাবার মন পাওয়া যায়। ঠিকানা নিয়ে পরদিন মামা গেল বর্ধমানে। গ্রামের মধ্যে জমিদারী কাছারি, হল সেখানে অতিথি। ছোট ছেলে আপ্যায়ন করল। কিন্তু জানালো, কর্তামশায়কে সামনে বসিয়ে তার ছবি আঁকা যাবে না। প্রাতে তিনি হাওয়া খেতে যান। তারপর তৈলমর্দন, আহার এবং দুপুরে নিদ্রা। বিকেলে আবার হাওয়া খেতে যান, সন্ধ্যাবেলা বাবা কী করেন ছেলে নিজমুখে বলতে লজ্জা পেল। রাত্রে নিদ্রা। অগত্যা স্হির হল ছোটছেলের মুখ এঁকে তাতে এক রাশভারী গোঁফ বসিয়ে দেওয়া হবে। তাহলেই বাবা ও ছেলের মুখ সেই ছবিতে সামিল হয়ে যাবে।

সাতদিন ধরে ছবি আঁকা চলল। অন্দরমহলে মাঝে মাঝে জমিদারের হাস্যযন্ত্রণার কাতর আওয়াজ শোনা যেত। ফিরে আসার দিন জমিদারের সঙ্গে মধাহ্নের আহারের আমন্ত্রণ এল। খাবার

ঘরে পিঁড়ি পেতে খাওয়ার রেওয়াজ। বড়কর্তা এলেন। পরণে ফিনফিনে শান্তিপুরী ধুতি - পেটে চর্বির ঢেউ হিল্লোলিত। আসনে বসে প্রচুর ব্যঞ্জন সাজিয়ে মাঝখানে বিরাজ করছেন তিনি। ছোটছেলে তথৈবচ। কিন্তু নাকে এল কাদার গন্ধ। কর্তা বললেন, দ্বিধা করবেন না, গ্রামের সব খাবার টাটকা । এবার ছোটছেলে কাদার গন্ধে নাসিকা কুঞ্চন করল। জমিদার গিন্নি তদারক করছেন, ঘোমটার আড়ালে মাথা নেড়ে তিনিও সায় দিলেন।

কর্তার খাস চাকর হঠাৎ তাঁর পেটের খাঁজে হাত চালিয়ে আবিষ্কার করল এক কচুরীপানা। পুকুরে স্নান করতে নেমে অঙ্গে তুলে এনেছেন। এদিকে পরিচারকের আঙুলের স্পর্শে হিল্লোলিত হল তাঁর শরীর, ভূমিকম্পের মত কেঁপে উঠলেন। খিলখিল শব্দে হেসে অজ্ঞান হয়ে গড়িয়ে পড়লেন মেঝেতে।

একবার এক কুকুর পোষা হল। করপোরেশন চিঠি দিল কুকুরের জন্য লাইসেন্স কেন করা হয়নি জবাব দাও। কুন্ঠিত ভাবে মামা গেল সেই অফিসে। দারোয়ান দেখিয়ে দিল ঘরের মধ্যিখানে বড়বাবুর দিকে। একটি গল্পচক্রের মধ্যমণি হয়ে বসে আছে সে। অনেকে মুগ্ধ হয়ে তার কথা শুনছে। রক্তকরবীর নাটকের গল্প হচ্ছে। শম্ভু মিত্র দুর্গের আড়াল থেকে বলছে 'নন্দিনী, এখন বিরক্ত করোনা, এখন দেবতার পূজার সময়।'

তৃপ্তি মিত্র বলছে, 'রাজা, দেবতার অপেক্ষা করার সময় আছে, মানুষের নেই, দরজা খোলো।' এমন সময় বড়মামা বলল, 'স্যার' -

নাটকে ছেদ পড়ল। ভ্রুকুটি করে বড়বাবু বলেল, 'কী চাই?'

'আমার লাইসেন্স চাই। না মানে, কুকুরের লাইসেন্স চাই।. কুকুরের আমি ...।' সমবেত জনতা মুগুর পেটানোর মত বলল, 'ছি, ছি, কিসের মধ্যে কী কথা?'

বড়বাবু ফেটে পড়ল, 'আপনারা শিক্ষিত লোক, বাড়িতে বিপজ্জনক জন্তু পুষেছেন, অথচ লাইসেন্স করেননি, জানেন ওটা ম্যান ইটার হয়ে যেতে পারে? আপনার কুকুর তুলে আনা হবে।' আবার রক্তকরবীর পালা শুরু হল। মামা পরাস্ত হয়ে ফিরে আসছেন। দারোয়ান ঘনিষ্ঠ হয়ে বলল 'দশটা টাকা দিন, ব্যবস্হা হয়ে যাবে।' টাকা হাতে দারোয়ানের সঙ্গে আবার ভেতরে চলল।

আউটরাম ঘাটের ধারে স্টেট ব্যাঙ্ক। সেখানে তীরের গতিতে মামা ছোটাছুটি করছে। টাকা তুলবে, আর দুই মিনিট পরে Cash Counter বন্ধ হয়ে যাবে। চেক লিখেছে। কিন্তু একটা ভুল বেরিয়েছে তাতে। মুশকিল-আসান যে ভদ্রলোক বসে আছে হলঘরে এক কোনায় বুদ্ধের মত। টেবিলের পরে এক বেড়াল চোখ বুজে বসে আছে। ভদ্রলোক তার মাথায় হাত বোলাচ্ছে। চুম্বকের টানে মামা সেখানে এসে অনুরোধ করলে,'আপনার সই পেলে টাকা তুলতে পারব।' বেড়াল এক চোখ তুলে তাকাল। ভদ্রলোক অতিকষ্টে হাতে কলম তুলে নিল। কিন্তু পরক্ষণেই উদ্যত কলম হাত থেকে পড়ে গেল। মামা বললে, 'কী হল স্যার?'

'দেখছেন না, গঙ্গায় বান এসেছে সকলে দেখতে যাচ্ছে', - এই কথা বলেই ভদ্রলোক ছুটল বারান্দার দিকে। সেদিন মামা খালি হাতে বাড়ি ফিরে এল।

বড় মামা আর্ট কলেজ থেকে গোল্ড মেডেল নিয়ে পাশ করে প্রথম জীবনে তেল রঙে প্রতিকৃতি আঁকল অনেক নামি দামি লোকেদের। তার চিত্রকর জীবনের প্রভাত-সঙ্গীত সুপ্রতিষ্ঠিত সাহেব, বিবি, গোলামের তাসের দেশে সাধনা লাভ করেছিল। এদের সুবাদে হরেকরকম বিচিত্র অভিজ্ঞতাও হয়েছিল। একবার এক বাঙালি ধনী ব্যবসাদারের পক্ষপুটে আশ্রয় পাওয়া গেল। নাম হরিতকি পতিতুন্ডি। ডালহৌসি পাড়ায় ভদ্রলোকের অফিস। সামনে বড় বড় হরফে লেখা আছে 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী।' মহিলা সেক্রেটারি - লক্ষ্মীর মত চেহারা, মামাকে নিয়ে গেল অফিস ঘরে। লম্বা ঘর, জায়গা জুড়ে লম্বা সুপরিসর টেবিল। শেষের দিকে ঘোরানো চেয়ারে ঘোরালো এক ব্যক্তি, দেখে মনে হয় ক্ষুদ্রকায় নেপোলিয়নের জোরালো সংস্করণ। তরুণ আর্টিস্টকে দেখে সে বলল, 'তুমি বরুণ মৈত্র? খাসা চেহারা তোমার, প্রতিশ্রুতি আছে তোমার মধ্যে। তুমি মুণ্ডু আঁকতে পারো? আমার বাবার মুন্ডু আঁকতে হবে।'

'আজ্ঞে আমি পোর্ট্রেট আঁকি।'

'ঐ একই ব্যাপার। তবে একটা শর্ত আছে। তুমি আমার চাইতে বয়সে অনেক ছোট মানতেই হবে। সুতরাং আমি যা করতে বলব নির্ভয়ে তাই সেরে ফেলবে। কোন তক্ক করা চলবে না। নির্ভয়ে কাজ করো, উপযুক্ত পারিশ্রমিক মিলবেই।'

' স্যার, আমি রাজি।'

'তবে যাও, এঁকে ফেল বাবার ছবিখানা, দাঁড়িয়ে থেকে দন্ড দিও না নিজেকে।'

'কিন্তু আপনার বাবাকে দেখলাম না, ছবি আঁকব কী করে?'

‘হক্ কথা, তোমার বুদ্ধি আছে, সিদ্ধিলাভ করবে তুমি। কিন্তু বাবা তো জীবিত নেই।’

‘ বাবার ফটো আছে কি?’

‘এটা একটা ভালো কথা বলেছ। এই নাও একটা চিঠি লিখে দিলাম। ঠিকানা দেখে চলে যাও। সেখানে গেলে একটা ফটো দেওয়া হবে তোমার হাতে। পাওয়া মাত্র আমার কাছে চলে আসবে।’

তাই হল, বরুণ গেল সেই ঠিকানায়। পাঁচতলা বাড়ি। লিফ্ট উঠছে, নামছে। তিন তলায় যেতে হবে। কিন্তু ভারি মুশকিল, লিফ্ট থামছে পাঁচতলায়, উপেক্ষা করে যাচ্ছে অন্যান্য তলাতল। মামা ভেতরে, কিন্তু পাঁচতলা ব্যতিরেকে অন্য কোথাও লিফ্টের দরজা খুলছে না। পাঁচতলায় আর এক সমস্যা। সেখানে এক অ্যালসেশিয়ান কুকুর আছে লিফ্টের দরজা আগলে, দন্তবিকশিত করে পেট থেকে এক অপার্থিব ঘড়ঘড় শব্দ বার করছে। এই অপরূপ সমস্যার জটাজাল কাটিয়ে কাহিনী কী করে এগোয়? তবু অসাধ্যসাধন করে মামা এল তিনতলায়। গৃহস্বামী অ্যাড্ভোকেট, মন্তব্য করল ‘বাবার ছবি আঁকা হবে বুঝি? বাবা ছিলেন হাই কোর্টের জজ। জানতাম আমার বাবার ছবি একদিন কোর্টে টাঙানো হবেই।’

পরের দিন পতিতুণ্ডি অফিসে কাহিনী এগিয়ে চলল। সে বলল, ‘বরুণ, তুমি এই ফটোর প্রথমে ড্রাফ্ট আঁকো পেন্সিল দিয়ে।’

‘কেন?’ মামা প্রতিবাদ করল।

‘তক্ক করবে না, আগেই বলেছি। একটা পেন্সিল ছবি আমাকে এনে দেখাও, সঙ্গে এনো উড্পেন্সিল আর রবাট।’

পরের দিন বড়মামা ড্রাফ্ট নিয়ে হাজির। ছবি দেখে পতিতুণ্ডি উচ্ছসিত প্রশংসা করে উঠল,‘খাসা হাত তোমার। কিন্তু কি জানো? ছবিখানা ফিফ্টি পার্সেন্ট ঠিক হয়েছে।’

‘কিন্তু স্যার হুবহু ফটো যেমন’, মামার প্রতিবাদ।

‘তর্ক করা চলবে না একেবারেই। এক কাজ করো, ছবিতে আছে গোঁফজোড়া মিলিটারি মেজাজে ওপরের দিকে খোঁচা মারছে । সেটা রবাট্ট দিয়ে মুছে ফেল। এবার গোঁফ জোড়া আঁকো নিচের দিকে ঝুলে পড়েছে, যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না। সেইভাবে ছবির সংস্কার করা হল।

‘এইবার ছবি সিক্সটি পার্সেন্ট ঠিক হয়েছে, পতিতুণ্ডির মন্তব্য। এখানে দেখছ চোখ জ্বলজ্বল করছে, ভ্রুযুগল যেন ছুরির মত বঙ্কিম। মুছে দাও ভাই, মায়া করোনা। সরু করে ভুরু টানো। চোখের মধ্যে যদি একটা ভিজে বেড়াল চেহারা আনতে পার তাহলে বুঝব।’

বড়মামা যথাসাধ্য তাই করে দিল। পতিতুণ্ডির উক্তি, ‘ছবি এইট্টি পার্সেন্ট ঠিক হয়েছে। ছবিতে চুল ব্যাকব্রাশ করা আছে, নির্ভয়ে সেটা মুছে দাও। তারপর চুলগুলো সামনের দিকে ঝুলিয়ে দাও দেখি লক্ষীছাড়া।’

বড়মামা চটে বলল ‘আমাকে লক্ষীছাড়া বললেন যে বড়?’

‘না না, আমি বললুম লক্ষী ছোঁড়া’ ছবিতে নতুন করে চুলোচুলি হওয়ার পর ভদ্রলোক আহ্লাদিত হয়ে শিল্পীর চিবুকে আদর করে বলল, ‘আমার শেষ আব্দারটি রাখবে? ছবিতে দেখছ শরীরে কোট টাই। উড়িয়ে দাও। এবার চড়াও গলাবন্ধ নেহেরু কোট।’ শিল্পী সবকয়টা গর্হিত হুকুম পালন করে চলেছে। শেষে পতিতুণ্ডি পাশের ঘর থেকে চিৎকার করে ভাইকে ডাক দিল, ‘হারু দেখে যা এটা কার ছবি?’

হারু ছুটে এল। কাছা গোছাতে গোছাতে সোৎসাহে বলে উঠল ‘এ যে বাবার মুণ্ডু, কোথায় পেলি মাইরি? ’

‘এই আর্টিস্ট কে দিয়ে আঁকালুম।’

এবার মামা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল ‘তবে এই ফটো কি আপনার বাবার না? ’

‘কে বলেছে আমার বাবার ফটো? এটা আমার বাবার বন্ধুর মুণ্ডু। বাবার চেহারার সঙ্গে মিল আছে, ফিফ্‌টি ফিফ্‌টি। এবার বলো তোমার পারিশ্রমিক কত? কি বললে, দুই হাজার টাকা? সামান্য চটের ক্যানভাসের আবার এত দাম হয়? তুমি কি ডাকাত!’

মামার প্রশ্ন, ‘আপনার বাবার ছবির মূল্য দেবেন না?’

‘বাবার মুণ্ডুর এত দাম?’

ক্রমশ

স্মরণীয় যাঁরা

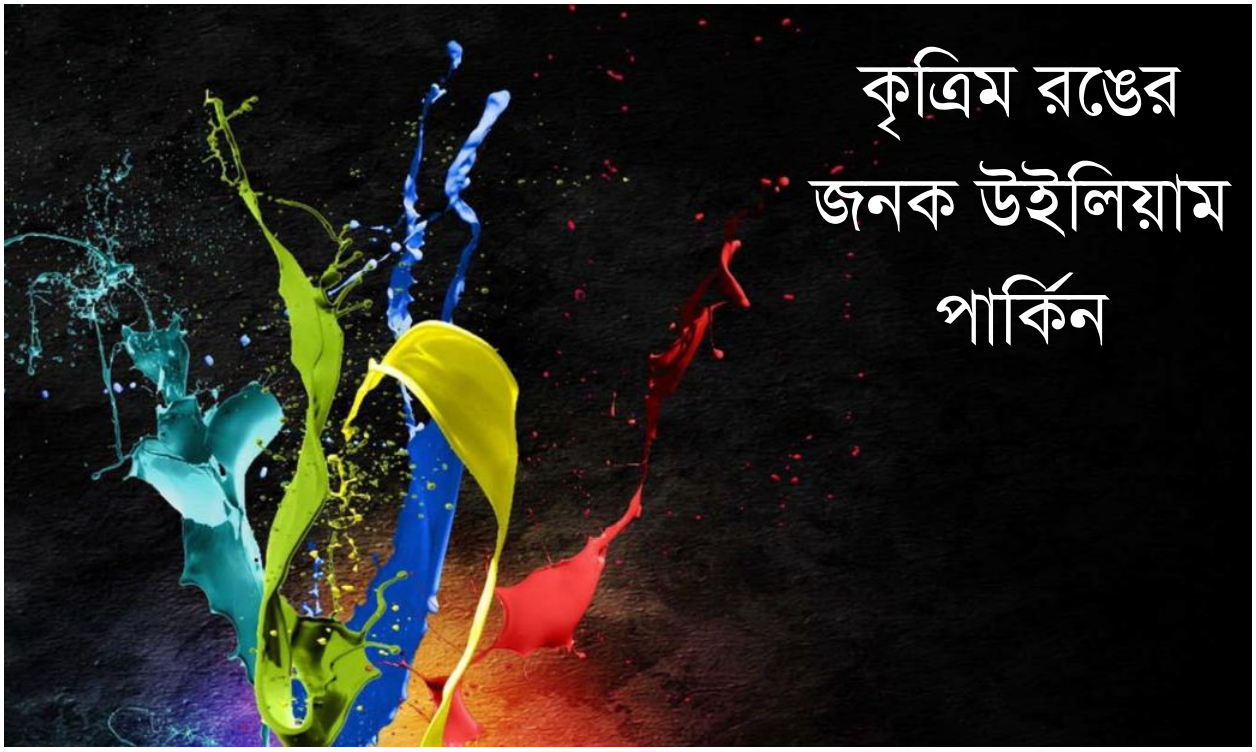

"রাঙিয়ে দিয়ে যাও, যাও, যাও গো এবার যাবার আগে" - রবীন্দ্রনাথ

আকাশের রং নীল, পাতারা সবুজ, রক্তের রং লাল। রং না থাকলে দুনিয়াটা কেমন ম্যাড়মেড়ে হয়ে যেত না? অথচ এগুলো হল সব প্রাকৃতিক রং। বিভিন্ন কাজে প্রাকৃতিক রং ব্যবহার করি আমরা। চুলে বা হাতে মেহেন্দি লাগাতে দেখেছ নিশ্চয় অনেককে। অজন্তা ইলোরার গুহাচিত্রও এরকম প্রাকৃতিক রং ব্যবহার করেই বানানো। কাপড় রঙিন করতেও কিছু ভেষজ রং ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে রং তৈরি আবিষ্কার না হলে আজকের পৃথিবীর এই বিপুল চাহিদা মেটানো কোনভাবেই সম্ভব হত না। সেই আবিষ্কারের গল্প শোনাচ্ছেন অমিতাভ প্রামাণিক।

তেরোশো সাতান্ন সালে পলাশীর যুদ্ধে ইংল্যান্ডের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নবাব সিরাজউদ্দৌল্লার বাহিনীকে পরাস্ত করে ভারতবর্ষে তাদের শাসন কায়েম করল। সেই শাসন চলল পরবর্তী প্রায় দুশো বছর। সামান্য একটা বাণিজ্যিক সংস্থার এভাবে বিদেশে শাসণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নজির বিশ্বের ইতিহাসে বেশি নেই। ইংরেজ ছাড়াও পর্তুগিজ, ওলন্দাজ, ড্যানিশ আর ফরাসিরাও ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল।

এর আগে বিদেশী শাসকগোষ্ঠী ভারতে হানা দিয়েছে বহুবার, চালিয়েছে লুঠপাট- অত্যাচার। আলেকজান্ডার - চেঙ্গিজ খান – মহম্মদ ঘোরীর উদাহরণ তো আছেই, মোগলরাও তো বিদেশ থেকেই এসে ভারতে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। ইংরেজরা অবশ্য শুধু লুটে নিয়েই যায়নি, এদেশে স্থাপন করেছিল বেশ কিছু সুব্যবস্থা, যার সুফল আমরা ভোগ করছি। পৃথিবীর বৃহত্তম রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা, আধুনিক শিক্ষার প্রসার, নগর উন্নয়ন ইত্যাদি বহু জিনিস তাদেরই অবদান। যদিও এদেশের

সোনাদানা হীরে জহরৎ জাহাজ ভর্তি করে ইংল্যান্ডে নিয়ে গিয়েছিল তারাও। না হলে কোহিনুর হীরে কি করে ইংল্যান্ডের রানির মুকুটে শোভা পায়?

সোনাদানা ছাড়াও তুখোড় বাণিজ্যিক বুদ্ধির ইংরেজরা আরো যা নিয়ে যেত এদেশ থেকে, তার ব্যবহারিক মূল্য ছিল অসীম। ভারত থেকে দামি মশলা আর রেশম সংগ্রহ করে নিয়ে যেত এই বিদেশী বণিকরা।

পলাশীর যুদ্ধে বাংলায় তাদের শাসন স্থাপন করে বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্যে ইংরেজ বাহিনী ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও তাদের সামরিক কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে লাগল। ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধে জেতার পর তাদের শাসনের এলাকা বাংলার বাইরে ছড়িয়ে গেল। অশান্ত ইউরোপে তখন বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকমের বিপ্লব চলছে। দক্ষিণ ভারতে মহীশূরের আর পশ্চিমে মারাঠা রাজশক্তিকে পরাস্ত করে ১৮২০ সালের মধ্যে শান্তিপ্রিয় ভারতের অধিকাংশ অঞ্চল হয়ে গেল ইংরেজের অধীন।

ভারতে স্থায়ী শাসন কায়েম করে ইংরেজরা পেল রেশম আর মশলার পাশাপাশি আরও এক মহার্ঘ বস্তু – তুলো। দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণমৃত্তিকা তুলোচাষের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। সেই তুলো দিয়ে এদেশের মানুষ বানাতো নরম পোশাক। তবে এদেশে তখনো ইংরেজদের দেশের মত বাষ্পচালিত যন্ত্র দিয়ে অল্প সময় অনেক কাপড় বানাবার কৌশল জানা ছিলো না। পুরনো আমলের চরকা ঘুরিয়ে তৈরি হত সুতো, আর হাতে চালানো তাঁত বা ঐ ধরণের যন্ত্র দিয়ে কাপড়। কারিগরী দক্ষতায় এগিয়ে থাকা ইংরেজরা বুঝে গেল, এখানকার কাপড়শিল্পকে ধ্বংস করে ওই তুলো যদি তাদের নিজেদের দেশের কাপড়ের কলের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা যায় তাহলে বিশ্বের কাপড়ের বাজার তাদের হাতে এসে যাবে।

হলও তাই। ১৮৪৮ সালে ডালহৌসি ব্রিটিশ ভারতের গভর্নর জেনারেল হলেন। ভারতের বন্দরগুলি থেকে তুলো জাহাজ বোঝাই হয়ে চলে যেতে লাগল ইংল্যান্ডের পশ্চিম উপকূলে। ম্যাঞ্চেস্টার, লিভারপুল, গ্লাসগো ইত্যাদি অঞ্চলে স্থাপিত হল বহু কটন মিল। যন্ত্রচালিত মিলে সেই তুলো থেকে হাজার হাজার মিটার কাপড় বেরোতে লাগল প্রতি দিনে। বিক্রি হতে লাগল সারা পৃথিবীর বাজারে। ঊনবিংশ শতাব্দির মাঝামাঝি ইংল্যান্ডের সারা দেশের মোট রপ্তানির প্রায় অর্ধেক আসতে লাগল এই কাপড় বিক্রি করে।

কিন্তু সবাই তো সাদা কাপড় পরতে চায় না। রং- বেরঙের পোশাকের চাহিদা বেশি। কিন্তু তুলোয় সুন্দর রং লাগানো এত সহজ তো নয়, অন্ততঃ তখন তা জানা ছিল না। কাপড়ে রং করার জন্যে মূল উপাদান ছিল গাছগাছড়ার বিভিন্ন অংশ থেকে সংগ্রহ করা নানা রঙের রঙিন আরক। গাছের ছাল, শিকড়, পাতা, ফল এমনকি কান্ড থেকেও বিভিন্ন উপায়ে ছেঁকে নেওয়া হত এই রং। মোটেও সহজসাধ্য কাজ ছিল না এগুলো। প্রচুর সময় তো লাগতোই, কেননা জল বা অন্যান্য দ্রাবকে গাছপালার অংশগুলি চুবিয়ে রাখতে হত, তারপর সেগুলোকে ঘন করে কাপড়ে লাগানো হত। এর আগে অবশ্য কাপড়গুলোকে ভালো করে ধুয়ে ব্লিচ করে নেওয়া হত, যাতে তাতে হলদেটে ভাব না থাকে। সব রং কাপড়ে সহজে তো ধরে না, তাই আরো সব রাসায়নিক পদার্থ মেশাতে হত রং ধরানোর জন্যে। তুলোতে রং ধরাতে হলে মর্ড্যান্ট বলে এক ধরণের পদার্থের প্রয়োজন হয়।

ভেষজ রঙের জন্যে বিভিন্ন গাছের চাষও করতে হত। যেমন নীলগাছ থেকে সংগ্রহ করা হত নীল। সেটাও চাষ হত ভারতেই। জোর করে চাষিদের নীল চাষে বাধ্য করানো, আর তা না করলে তাদের ওপর নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের কথা বহুল প্রচারিত। ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে চাষ হওয়া ম্যাডার বলে এক গাছড়ার (রুবিয়া টিঙ্কটোরিয়া, কফিগাছ যে ফ্যামিলির, সেই রুবিয়াসি ফ্যামিলির; আমাদের আয়ুর্বেদে মঞ্জিষ্ঠার কথা আছে, সেটা অনেকটা এর মত, এর নাম রুবিয়া কর্ডিফোলিয়া) শিকড় থেকে এভাবে নিঙড়ে নেওয়া হত খুনখারাপি লাল রং।

শুধু গাছপালা থেকে নয়, প্রাণীজগত থেকেও সংগ্রহ হত জামাকাপড়ের রং।

মেক্সিকো আর মধ্য আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে প্লিকোপুরপুরা পানসা বলে এক সামুদ্রিক শামুকের গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রস থেকে টাইরিয়ান পার্পল বলে এক রং পাওয়া যেত, যা ছিল অত্যন্ত মহার্ঘ, কেননা ব্যবহারে আর সূর্যের আলোয় অন্য রং যেমন ফিকে হয়ে যায়, তেমন না হয়ে এই রং আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠত। খুব বড়লোকেরাই এই রঙের পোশাক পরতে পারত, এতই ছিল এর

দাম। একে রয়্যাল পার্পল, ইম্পিরিয়াল পার্পল বা ইম্পিরিয়াল ডাই- ও বলা হত। রাজবাড়িতে সন্তানাদি জন্মালে তার পোশাক এই রঙের বানানো ছিল রীতি।

বলাই বাহুল্য, এই সব প্রাকৃতিক রং নিস্কাশন পদ্ধতি শুধু যে সময়সাপেক্ষ ছিল তাই নয়, জীবিত বস্তু থেকে সংগৃহীত বলে টেঁকসই হত না তেমন। গাছপালা বা প্রাণীজগত পচনশীল, কেটে ফেলে রাখলে পচে গন্ধ হয়, তা থেকে নিঙড়ে নেওয়া রংও কিছু কিছু ক্ষেত্রে এরকম ব্যবহার করত। কয়েকটি মাত্র রং পাওয়া যেত, খুব বেশি বৈচিত্র ছিল না। অধিকাংশ রং এখনকার রংবেরং- এর পোশাকের তুলনায় অনেক অনুজ্জ্বল ছিল।

একরকম কপালের জোরেই কৃত্রিম রং আবিষ্কৃত হয়। সেটা ১৮৫৬ সাল। বৈজ্ঞানিক অগাস্ট হফম্যানের মাত্র আঠার বছর বয়সী ছাত্র উইলিয়াম পার্কিন এই কাজটা করে ফেলেন আধখানা ঘরের এক নামমাত্র ল্যাবরেটরিতে, আসবাব বলতে যেখানে মাত্র একটা টেবিল আর বোতল রাখার কয়েকটা শেল্‌ফ। রাসায়নিক উপায়ে উনি বানাতে চেয়েছিলেন, রং নয়, কৃত্রিম কুইনাইন, ম্যালেরিয়ার ওষুধ!

পার্কিনের এই এক্সপেরিমেন্টের কথা বলার আগে কয়েকটা তথ্য দিয়ে নেওয়া দরকার। যদিও মানুষ সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অনেক আগে থেকেই কয়েকটা ধাতুর ব্যবহার জানত, লোহা বা তামা যা দিয়ে তারা অস্ত্রশস্ত্র থেকে রান্না করার বাসনপত্র বানাত, অথবা মৃত্তিকাজাত কাজের বা ঘর সাজানোর বস্তুসামগ্রী, বিজ্ঞানের শাখা হিসাবে রসায়নশাস্ত্রের প্রসার শুরু হয় অনেক পরে। চাষ- আবাদ বা এগ্রিকালচার, জ্যোতির্বিদ্যা বা অ্যাস্ট্রোনমি আর পদার্থবিদ্যা বা ফিজিক্স সে তুলনায় অনেক এগিয়ে তখন। প্রথম প্রথম কেমিস্ট্রি বলতে বোঝাত অ্যালকেমি, বা অপরসায়ন। কোন ধারণার বশবর্তী হয়ে কে জানে, একদল বিজ্ঞানী চেষ্টা চালিয়ে যেতেন সমস্ত কিছুকে সোনায় রূপান্তরিত করতে। শুধু তাই নয়, এমন এক ভোজবাজি বানাতে যা নাকি মানুষকে দেবে দীর্ঘায়ু, রোগমুক্ত জীবন। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় থেকে খৃষ্টাব্দ সপ্তদশ শতাব্দির মাঝামাঝি পর্যন্ত সময় চলে যায় এই অ্যালকেমির চর্চায়। কিন্তু পরশপাথর বা ফিলোজফার্স স্টোন এবং এলিক্সির অফ লাইফ বা চিরায়ু সুরা অধরাই থেকে যায়। এই অন্ধকার যুগ থেকে আলোর পথ দেখান বিজ্ঞানী রবার্ট বয়েল, যাঁকে অধুনা রসায়নশাস্ত্রের জনক বলা যেতে পারে। ১৬৬০ সালে তাঁর বয়েলের সূত্র নতুন ভাবনার অঙ্গীকার নিয়ে আসে।

পার্কিনের কৃত্রিম রং আবিষ্কার এই ঘটনার আরো দুশো বছর পরে। কিন্তু ততদিনে রসায়নের অঙ্গন বিশেষ কিছু যে পরিপূর্ণ তা নয়। যদিও গুরুত্বপূর্ণ মৌলগুলির আবিষ্কার হয়ে গেছে। মাত্র পঞ্চাশ বছর আগে জন ডাল্টন প্রকাশ করেছেন তাঁর পরমাণুবাদ, ১৮০৩ সালে। তার ঠিক তিন বছর আগে অ্যালেসান্দ্রো ভোল্টা ব্যাটারি আবিষ্কার করেছেন, যদিও ব্যাটারির মধ্যে যে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে, যাকে বলা হয় ইলেক্ট্রোলিসিস, তার থিওরি প্রথম দেন মাইকেল ফ্যারাডে,

১৮৩৪ সালে। এর পরপরেই তাপগতিদ্যার সূত্রগুলি এক এক করে বের হতে থাকে। ১৭৭৫ সালে অক্সিজেনের আবিষ্কর্তা বিজ্ঞানী ল্যাভয়সিয়ার, ১৭৮৯ সালে প্রথম বললেন বস্তুর অবিনাশীতার তত্ত্ব। তা থেকে এক ধাপ এগিয়ে ১৮৪৭ সালে হেল্‌মহোল্‌জ শক্তির অবিনশ্বরতার কথা শোনালেন। অবশ্য এখন আমরা জানি, বস্তু আর শক্তি দুটোর কেউই একা অবিনশ্বর নয়, কেননা একটা থেকে আর একটাতে পরিবর্তন সম্ভব, বরং দুটো মিলে যা হয়, তার বিনাশ নেই।

শুধু বিজ্ঞান নয়, রাজনীতি এবং টেকনোলজিতেও তখন তোলপাড় চলছে সারা দুনিয়ায়, যার মূল তখন ইউরোপে। ১৭৭৫ সালে স্টিম ইঞ্জিন আবিষ্কার হয়ে ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লবের যে ধারা প্রবর্তন হয়, তা অল্পদিনেই ছড়িয়ে যায় ইউরোপের অন্যান্য দেশে। ১৭৮৯ সালে শুরু হয় ফরাসী বিপ্লব। ১৮১৫ সালে নেপোলিয়নের পতন ঘটে ওয়াটার্লুর যুদ্ধে। ১৮২৫ সালে পৃথিবীর প্রথম প্যাসেঞ্জার রেল চলে ইংল্যান্ডে। প্রথম ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলা হয় ১৮২৬ সালে।

সম্ভবত পৃথিবীর প্রথম ফটোগ্রাফ। ১৮২৬ সালে তোলা একটা ফার্মহাউসের ছাদের ছবি

১৮৪৮ সালে রাশিয়ায় কমিউনিস্ট আন্দোলন তৈরি করে তাদের প্রথম ম্যানিফেস্টো, আর তার পাঁচ বছর পরেই তারা ব্রিটিশ- ফরাসি যৌথশক্তির সাথে জড়িয়ে পড়ে আড়াইবছর ব্যাপী ক্রিমিয়ার যুদ্ধে।

এই পারিপার্শ্বিক অবস্থায় উইলিয়াম পার্কিনের এই আবিষ্কার বিজ্ঞানের ইতিহাসে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৩৮ সালের মার্চ মাসে লণ্ডনের ইস্ট এন্ড এলাকায় তাঁর জন্ম। বাবা জর্জ পার্কিন ছিলেন ছুতোর। ইলেক্ট্রন প্রোটন কিচ্ছু তখন আবিষ্কার হয়নি। সে আরো কুড়ি- পঁচিশ বছর পরের কথা। জীবজগত থেকে সংগৃহীত বস্তুগুলি যে কার্বন- যৌগ, তার আণবিক চেহারা জানা তখন সম্ভব ছিল না, কেননা কার্বনের যোজ্যতা যে চার এবং তা একটা সুষম পিরামিডের চেহারার মাঝামাঝি বসে অন্য পরমাণুর সঙ্গে বাসা বাঁধে পিরামিডের কোণা বরাবর, সেই কাহিনীর প্রবর্তন করেন ভ্যান্ট হফ ও লা বেল অনেক পরে, ১৮৭৪ সালে। আধুনিক পিরিয়ডিক টেবিলও জানা ছিল না পার্কিনের ঐ আবিষ্কারের সময়। এমনকি বেঞ্জিন রিং, যা দেখতে একটা সুষম ষড়ভুজের মত, তার খবরও জানা ছিল না। অগাস্ট কেকুলে সেটা বললেন আরো আট বছর পরে, ১৮৬৪তে।

অথচ বেঞ্জিনেরই এক জ্ঞাতিভাইকে নিয়ে ফোটাচ্ছিলেন পার্কিন, তরলটির নাম অ্যানিলিন। বেঞ্জিনের সঙ্গে একটা অ্যামিন গ্রুপ লেগে আছে ঐ যৌগটিতে, অ্যামিনোবেঞ্জিন বললে কেউ আপত্তি করবে না। ১৮৩৮ সালের কথা। পার্কিন তখন লণ্ডনের রয়াল কলেজ অব কেমিস্ট্রিতে প্রফেসর হফম্যানের ছাত্র। ইস্টারের ছুটিতে প্রফেসর হফম্যান তাঁর দেশ জার্মানিতে বেড়াতে গেছেন। কিছুদিন আগে হফম্যান ম্যালেরিয়ার ওষুধ কুইনাইন, যেটা সিঙ্কোনা বলে এক গাছের ছাল থেকে নিষ্কাশিত হত, ল্যাবোরেটরিতে কী করে কৃত্রিম উপায়ে বানানো সম্ভব, তা নিয়ে কিছু ভাবনাচিন্তা প্রকাশ করেছিলেন একটা জার্নালে। পার্কিন ভেবেছিলেন হফম্যান ফিরে আসার আগেই তাঁকে চমকে দেবেন কুইনাইন বানিয়ে। লন্ডনের পুবদিকে কেব্‌ল স্ট্রিটে বাড়ির ওপরের তলায় অস্থায়ী ল্যাব বানিয়ে তাঁর এই কীর্তি শুরু হয়। অ্যানিলিনের মধ্যে জারক দ্রব্য পটাসিয়াম ডাইক্রোমেট ঢেলে ফোটাতে গিয়ে দেখলেন গাঢ় একটা রং তৈরি হয়ে গেল। কালচে কিছু জিনিস থিতিয়ে পড়ল সেই তরলের নীচে। ছেঁকে নিয়ে অ্যালকোহল ঢেলে দেখলেন পার্কিন, আরে বাঃ, গুলে যাচ্ছে বেশ কিছুটা অংশ। আর তার রং বাহারি বেগুনী। এতদিন অবধি দেখা অন্য ভেষজ বেগুনীর চেয়ে এর ঔজ্জ্বল্যই আলাদা।

একটা কথা বলে রাখি, তোমরা কিন্তু পার্কিনের মত এরকম দুষ্টুমি করতে যেও না। পটাসিয়াম ডাইক্রোমেট খুব শক্তিশালী জারক দ্রব্য, অসাবধানে মারাত্মক বিপদ হতে পারে। একমাত্র রসায়নাগারে তত্ত্বাবধায়কের নির্দেশ অনুযায়ীই এরকম এক্সপেরিমেন্ট করা সঙ্গত।

তো পার্কিন তো সেই বেগুনী রং দেখে আনন্দে আত্মহারা। ডুবিয়ে দিলেন তাতে রেশমের কাপড়, দারুণ সুন্দর রং ধরে গেল সেই কাপড়ে। জলে ধুলে সে রং যায় না, আলোতে মেলে রাখলেও ফিকে হয়ে যায় না। ব্যবসায়ী বুদ্ধি খেলে গেল তাঁর মাথায়। হফম্যানের কাছে তিনি কাজ করছিলেন ম্যালেরিয়ার ওষুধ কুইনাইন বানানোর জন্যে। এর সঙ্গে তার তো কোন যোগাযোগ নেই। এ তো তার একেবারে নিজের আবিষ্কার। যদি এই পদ্ধতিটাকে আরো বেশি উন্নত করা যায়, যাতে ঐ বেগুনী রঙের যৌগটি তৈরি হবে আরো বেশি অন্য কিছুর তুলনায়, তাহলে তো একটা কারখানা বানিয়ে এ থেকে অনেক টাকাপয়সা রোজগার হতে পারে!

যা ভাবা, তাই কাজ। ভাই টমাসকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির পেছনে তৈরি হল তার গোপন পাইলট প্ল্যান্ট। এই রঙিন জিনিসটার নাম দিলেন তিনি অ্যানিলিন পার্প্‌ল বা মভিন। এই যে উজ্জ্বল বেগুনী রং, একে অনেকেই ‘মভ কালার’ বলে। বানানোর পদ্ধতির আরো উন্নতিসাধন করলেন দুই ভাই মিলে, যাতে ঐ থকথকে কালো মিশ্রণ থেকে মভিন বেরোয় অনেক বেশি।

টমাসের এক বন্ধু স্কটল্যান্ডের পার্থে বিখ্যাত ভেষজ রঙের কারখানা মিল স্ট্রিট ডাইওয়ার্ক্‌স-এ কাজ করত। সে বছরের জুন মাসে একটা চিঠি আর মভিনের

স্যাম্পল পাঠালেন পার্কিন সেখানে, এটা জানতে যে বিভিন্ন রকমের কাপড়ে কী রকম স্থায়ী আর উজ্জ্বল রং ধরায় মভিন অন্যান্য ভেষজ রঙের তুলনায়। কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার রবার্ট পুলারের চিঠি এসে গেল কিছু দিনের মধ্যেই। তারা দেখেছে মভিন সত্যিই অতুলনীয়। রবার্ট পার্কিনকে লিখলেন যে যদি পার্কিনের মভিনের দাম খুব বেশি না হয়, তাহলে এটা সত্যিই এক অসাধারণ আবিষ্কার, কেননা সিল্ক বা সুতির কাপড়ে এত উজ্জ্বল রং ধরানো অন্য কোনভাবেই সম্ভব নয়। সারা ইংল্যান্ডে একটা রঙের কারখানেতেই এর কাছাকাছি ঔজ্জ্বল্যের রং ধরানোর কারিগরী দক্ষতা আছে, কিন্তু সেটাও এর মত স্থায়ী রং দিতে পারে না।

মাত্র আঠার বছর বয়স তাঁর। অন্য কেউ হলে মাথা ঘুরে যেত নির্ঘাৎ। কিন্তু পার্কিন অন্য ধাতুতে গড়া। রবার্ট পুলারের সেই চিঠি তিনি দেখালেন বন্ধু আর্থার চার্চকে। সেও হফম্যানেরই অ্যাসিস্ট্যান্ট, পার্কিনের মতই। আর্থার বলল, শিগগির এর পেটেন্ট নিয়ে নে, যাতে এ থেকে অন্য কেউ ব্যবসায়িক ফায়দা না লুটতে পারে। কিন্তু মুশকিল হল সেই সময় পেটেন্টের জন্য আবেদনপত্র গৃহীত হত ২১ বছর বয়স হলে তবেই। পার্কিন এক উকিল ধরলেন। আর টমাসের সঙ্গে গরমের ছুটিতে বানিয়ে ফেললেন বেশ কয়েক আউন্স মভিন। অগাষ্টে তার পেটেন্ট গ্রাহ্যও হয়ে গেল।

এরপর পার্কিন আর আর্থার দুজনে রং বানানোর খেলায় মেতে উঠলেন বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিক বিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে করে। তৈরি করলেন অনেক রকমের এবং অনেক রঙের যৌগ। এর মধ্যে এক ধরণের যৌগ হল অ্যাজো- যৌগ, যাতে দুটি নাইট্রোজেন পরমাণু পাশাপাশি ডাব্‌ল বন্ড দিয়ে যুক্ত। অ্যাজো- যৌগের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে কৃত্রিম রঙের দুনিয়ায় আরো বিপ্লব ঘটে গেল।

মভিনের প্রসঙ্গে ফিরে আসি আবার। প্রথম বানানোর পর পার্কিন যখন ঐ পদ্ধতির ওপর আরো গবেষণা চালিয়ে যান সেটাকে আরো উন্নত করতে, উনি বুঝতে পারেন ভাগ্য ওঁর কত সহায় ছিল। উনি চেয়েছিলেন অ্যানিলিনকে জারিত করতে, সেটাই করছিলেন। কিন্তু ভাগ্যক্রমে সেই অ্যানিলিন ছিল অশুদ্ধ, আর তার মধ্যে ছিল টলুইডিন বলে আর একটি জ্ঞাতিভাই।শুদ্ধ অ্যানিলিন দিয়ে শুরু করলে তিনি মভিন পেতেন না, আর এই রঙের খেলা কখন যে শুরু হত, কে জানে। ঠিক এই ভাবেই তৈরি হল আরেকটি রং ম্যাজেন্টা, যাকে রোজিন, ফুশিন বা অ্যানিলিন রেড বলা হতে লাগল। ১৮৫৬ সালেই নাটানসন বলে এক বিজ্ঞানী প্রথম ম্যাজেন্টার সন্ধান পান, হফম্যান তার দু বছর পরে, আর ১৮৫৯ সালে ফ্রান্সে এর বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয়ে যায়।

কৃত্রিম রঙের বাণিজ্যিক উৎপাদনের কথা প্রথম ভেবেছিলেন কিন্তু পার্কিনই। কিন্তু শুধু ভাবলেই তো হল না। পার্কিন টাকা কোথায় পাবেন কারখানা বানানোর? তাছাড়া বাণিজ্যিক উৎপাদন মানেই তাঁর ক্রেতা থাকতে হবে, তাঁকে জোগাড় করতে হবে রং তৈরির কাঁচামাল। কৃত্রিম রঙের কোন কারখানা পৃথিবীতে নেই, আর পার্কিন

একজন রসায়নবিদ, তাঁর তো এঞ্জিনিয়ারিং- এর কোন অভিজ্ঞতাও নেই। কীভাবে এগোবেন তিনি?

পার্কিন প্রথম গেলেন পুলারের ভেষজ রঙের কারখানায়। দুজনে মিলে বের করলেন কৃত্রিম রং দিয়ে কিভাবে জামাকাপড়ে ভালো রং করানো যায়, মভ কালারের ক্যালিকো প্রিন্টের সেই প্রযুক্তি। পুলার পার্কিনকে আরো বললেন যে তাঁর উচিত বেথন্যাল গ্রিন বলে লন্ডনের বিখ্যাত রঙের কারখানার মালিক টমাস কিথের সঙ্গে যোগাযোগ করা। পার্কিন করলেনও। কিথ পার্কিনকে পরামর্শ দিলেন অবিলম্বে কৃত্রিম রঙের কারখানা বানাতে।

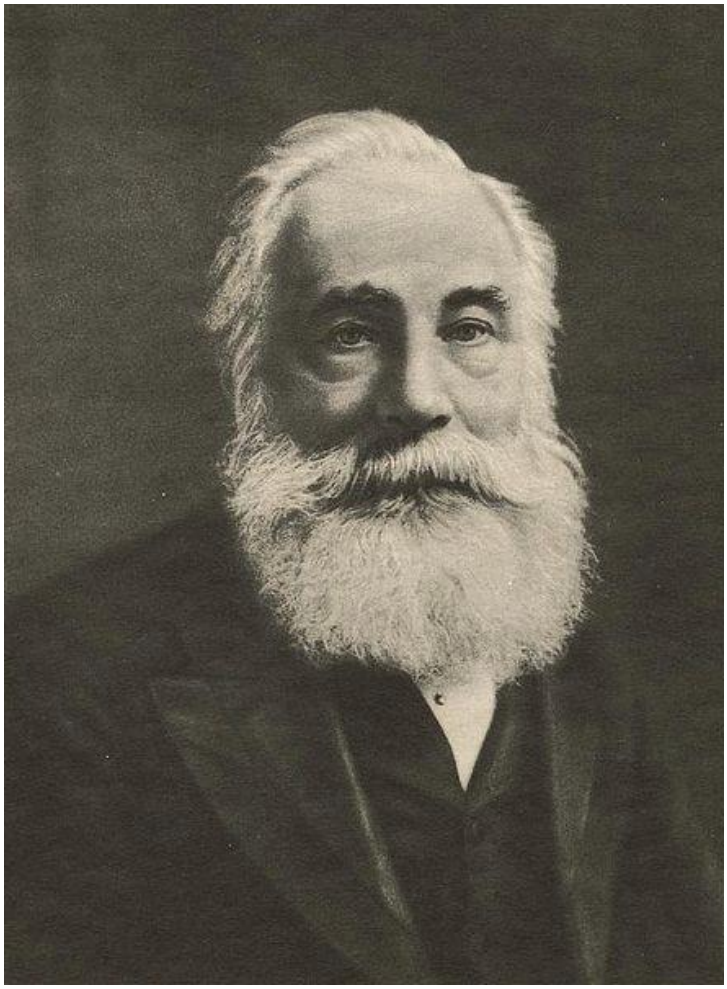

বাড়ি ফিরে পার্কিন গেলেন বাবার কাছে টাকা চাইতে। বাবাকে বোঝালেন কি দারুণ জিনিস আবিষ্কার করেছেন তিনি। ভাই টমাস পার্কিন, যার সঙ্গে বাড়ির পেছনে গোপনে গবেষণা করছিলেন এতদিন, রাজি হল পার্কিনের সঙ্গে একসঙ্গে এই ব্যবসায় নামার। টমাসের ঘরবাড়ি বানানোর আর ব্যবসা বাণিজ্যের বুদ্ধি ভালো ছিল। তাই বলতে হবে পার্কিনের ভাগ্য এখানেও সহায় হল।

কিন্তু ধাক্কা খেলেন কলেজে গিয়ে। হফম্যানকে বলতেই তিনি তো তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। কী, বিজ্ঞানের গবেষক হবে সামান্য ব্যবসায়ী? ছোঃ!

পার্কিন কিন্তু শুনলেন না হফম্যানের বাধানিষেধ। উইলিয়াম আর টমাস পার্কিন দুই ভাই মিলে পার্কিন অ্যান্ড সন্স বলে একটা কোম্পানি খুলে ফেললেন মিড্লসেক্সের সাডবারির কাছে গ্রিনফোর্ড গ্রিনে। সেটা ১৮৫৭ সালের জুন মাস। অ্যানিলিন বানানোর জন্যে যে বেঞ্জিন দরকার, সেটা পাওয়া গেল গ্লাসগোর মিলার অ্যান্ড কোম্পানি থেকে। কিন্তু তার মান এত খারাপ, যে সেটাকে শুদ্ধ করে নিতে হত পাতন প্রক্রিয়ায়। বাণিজ্যিক পরিমাপের ফিউমিং নাইট্রিক অ্যাসিড পাওয়া গেল না, কারণ

তাকে রাখবার মত অত বড় কাচের ফ্লাস্কই বা কোথায় পাবেন? ফলে অনেক রদবদল করতে হল পদ্ধতির। শেষমেষ যা পাওয়া গেল, পার্কিন দেখলেন, তা ব্যবহার করে নয়ভাগ অ্যানিলিন থেকে একভাগ অশুদ্ধ মভিন পাওয়া যাচ্ছে।

কারখানা শুরু করার ছয় মাসের মধ্যে ১৮৫৭ সালের ডিসেম্বরেই মভিনের প্রথম ব্যাচ তৈরি হয়ে টমাস কীথের বেথন্যাল গ্রিনে চলে গেল জামাকাপড়ে রং লাগানোর কাজে। সেই প্রথম বাণিজ্যিক স্তরে কৃত্রিম রং ব্যবহার হল।

পার্কিন এবং তাঁর সঙ্গীরা এর পর আরো অনেক রং বানিয়েছেন এবং ব্যবহার করেছেন বাণিজ্যিক ভাবে। মভিনকে বলা হত অ্যানিলিন পার্প্‌ল। সে রকম অ্যানিলিন পিঙ্ক বানালেন তিনি মভিনের সঙ্গে লেড পারক্সাইডের বিক্রিয়ায়। মভিনের ইথাইল যৌগের রং দেখা গেল লালচে বেগুনি; সেটা তিনি ডালিয়া নামে বাজারে ছাড়লেন। ম্যাজেন্টা- প্রসূত লাল এবং নীল শেডের ব্রিটানিয়া ভায়োলেট, পার্কিন্‌স্‌ গ্রিন – এসবও ছিল। ১৮৬০- এর দশকে পার্কিন অ্যান্ড সন্স রং করার এক নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করল যা দিয়ে জামাকাপড় ছাড়াও ওয়ালপেপার প্রিন্টিং, কাগজের ছাপাখানার রং এবং সুক্ষ্ম লিথোগ্রাফিক প্রিন্ট (যা দিয়ে স্ট্যাম্প পেপার, কারেন্সি নোট বা মুদ্রা এসব ছাপা হয়) সম্ভবপর হল কৃত্রিম রং দিয়ে। ১৮৮১ সালে ইংল্যান্ডে পেনি স্ট্যাম্প বানানোর জন্যে মভিন ব্যবহার হয়েছিল। সম্ভবত সেটাই শেষ।

যেকোন বাণিজ্যিক প্রচেষ্টা সফল হলে অনেকেই তার ভাগীদার হতে চায়। বাকিরা কি হাত গুটিয়ে বসে থাকবে? পার্কিনের মভিন বানানোর যে ব্রিটিশ পেটেন্ট, তাতে এক তুচ্ছ তারিখের আইনি গোলযোগের সুযোগ নিয়ে ফ্রান্সের রঙের কারখানাগুলি তাঁরই পদ্ধতিতে মভিন বানাতে লাগল। ফরাসি রাজকুমারী ইউজিনি সেই রঙের ক্যালিকো প্রিন্টের পোশাক পরে একে আরো বিখ্যাত করে দিলেন। ইউরোপের অন্যান্য দেশে, বিশেষতঃ জার্মানিতে রং নিয়ে অনেক বড়মাত্রায় গবেষণা শুরু হল। পার্কিন যেখানে হফম্যানের অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলেন সেই রয়্যাল কলেজ অফ কেমিষ্ট্রিতেও জৈব রসায়নবিদরা এ নিয়ে গবেষণা করছিলেন। ঐ কলেজেই পিটার গ্রিস প্রথম ডায়াজোনিয়াম যৌগ বানান যা থেকে পরে বিভিন্ন অ্যাজো ডাই তৈরি সম্ভব হয়। ম্যাজেন্টার কথা আগেই বলেছি। পার্কিনও তাঁর কারখানায় ম্যাজেন্টা বানাতেন। তাতে তিনি ব্যবহার করতেন পারদ- যৌগ, যা কারখানার কর্মীদের শারীরিক ক্ষতি করত। পার্কিনরা দু'ভাই ছিলেন ধর্মভীরু এবং তাঁদের কর্মীদের ব্যাপারে ভীষণ যত্নবান। তাঁরা ম্যাজেন্টা উৎপাদন বন্ধ করে দেন এই কারণে।

কিন্তু এর চেয়ে অনেক বড় আঘাত এল সম্পূর্ণ অন্যদিক থেকে। যে ভাগ্য সাথে ছিল তাঁর মভিন আবিষ্কারের পিছনে, সেই ভাগ্যই এবার মুখ ফেরাল। অথবা তাঁর নিজের এক ছোট্ট ভুল অনেক বড় হয়ে দেখা দিল।

ম্যাডার গাছের শিকড় থেকে যে লাল রং নিষ্কাশন করা হয়, কার্ল গ্রেবে বলে এক বিজ্ঞানী দেখলেন যে তার মধ্যে আছে অ্যালিজারিন আর সেটা হল এক কুইনোন

জাতীয় (কুইনিনের সঙ্গে যেন একে গুলিয়ে ফেলো না, এটা সম্পূর্ণ আলাদা জিনিষ। কুইনোন হল বেঞ্জিন রিঙের জারিত ফর্ম, দুটো কার্বনিল গ্রুপ- ওয়ালা যৌগ) যৌগ। কার্ল লিবারম্যান বলে এক জার্মান বিজ্ঞানীর সাথে কাজ করে তিনি এর থেকে অ্যান্থ্রাসিন বলে এক যৌগ বানালেন, যেটা কৃত্রিমভাবে আগেই বানানো হয়েছে।

সে সময় ৭০০০০ টন শিকড় থেকে ৭৫০ টন মত রং পাওয়া যেত। পার্কিন দুটো পদ্ধতিতে অ্যান্থ্রাসিন থেকে কৃত্রিম অ্যালিজারিন বানালেন ল্যাবরেটরিতে। কোনটাই বিশুদ্ধ অ্যালিজারিন নয়, কিন্তু তাতে কি! রং তৈরিতে দুটো পদ্ধতিই খুব কার্যকরী। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে পাওয়া যায় বেশি লাল আভার রং, আর প্রথম পদ্ধতিতে পাওয়া যায় তুলনামূলকভাবে বেশি জনপ্রিয় নীল আভার রং। এই নীল আভার রং দ্বিতীয় পদ্ধতিতে পাওয়া অশুদ্ধ অ্যালিজারিন মিশ্রকে রাসায়নিকভাবে আলাদা করেও পাওয়া সম্ভব। সেই আলাদা করার পদ্ধতিও ওঁরা আবিষ্কার করে ফেললেন। প্রথম পদ্ধতিতে পাওয়া কৃত্রিম অ্যালিজারিন ১৮৬৯ সালের ২০শে মে তিনি পাঠালেন গ্লাসগোর রবার্ট হগকে, যিনি রঙের একজন বিশেষজ্ঞ। পেটেন্টের জন্যে আবেদন করলেন তার মাসখানেক বাদে, ২৬শে জুন। আর দেখলেন তার ঠিক একদিন আগে, ২৫শে জুন গ্রেবে আর লিবারম্যান জার্মানির বি এ এস এফ কোম্পানির হয়ে প্রায় একই পদ্ধতির জন্যে পেটেন্টের আবেদন করে ফেলেছেন।

যদিও দুটো পেটেন্টই গ্রাহ্য হল, পার্কিনই তো আগে এটা করে ফেলেছিলেন। দারুণ দুঃখ হল তাঁর। কিন্তু ভেঙে না পড়ে তড়িঘড়ি তিনি দ্বিতীয় একটা পদ্ধতি বের করে ফেললেন, আর তার পেটেন্টের আবেদন করলেন মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যে, ১৭ই নভেম্বর। ১৮৬৯ সালে পার্কিন অ্যান্ড সন্স ১ টন অ্যালিজারিন বিক্রি করে। সেটা পরবর্তী চার বছরে বাড়তে বাড়তে ৪৩৫ টনে পৌঁছায়।

কিন্তু সময় যখন খারাপ যায়, তখন বিভিন্ন দিক থেকে সমস্যা আসে। ১৮৬৫ সালে তাদের বাবা মারা যাওয়ায় দু ভাইকে ব্যবসাপাতির ভবিষ্যৎ নিজেদেরকেই ঠিক করে নিতে হয়। ব্যবসা বাড়াতে হলে উৎপাদন বাড়াতে হবে, তার জন্যে চাই গ্রিনফোর্ড গ্রিন থেকে কারখানা অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া, আর প্রথম পদ্ধতি ব্যবহার করা, যেহেতু সেটা থেকে অ্যালিজারিন তৈরিতে খরচা কম। কিন্তু তার পেটেন্ট রয়েছে এক প্রতিযোগী কোম্পানির হাতে। তারা ছেড়ে কথা কইবে নাকি? যদিও ওদের সঙ্গে কথা বলে ঠিক হয়েছে যে ইংল্যান্ডে ঐ পদ্ধতি ব্যবহারের একচেটিয়া অধিকার থাকবে পার্কিনের হাতে, কিন্তু সুযোগসন্ধানী বি এ এস এফ তাদের অ্যালিজারিনের দাম এত কমিয়ে দিল যে কেউ বেশি দাম দিয়ে পার্কিনের জিনিস কিনতে চায় না। এদিকে দিনে দিনে কাঁচামাল অ্যান্থ্রাসিনের দাম বাড়তে লাগল। তাই ১৮৭৩ সালে যখন পার্কিন অ্যান্ড সন্স বিক্রি করল ৪৩৫ টন, বি এ এস এফের খাতায় তখন হাজার টনের বিক্রি।

পার্কিনের আরো কিছু কিছু সমস্যা ছিল। তিনি তো আদতে বিজ্ঞানী, খেলায় মেতে ব্যবসায়ী হয়েছেন। তাঁর মাথায় হাজার হাজার নতুন ভাবনা। সেসব নিয়ে গবেষণা করতে গেলে তো ছাত্র চাই, কিন্তু প্রফেসর হফম্যান ততদিনে জার্মানি ফিরে গেছেন, আর তার সাথে সাথে ইংল্যান্ডের কলেজগুলোতে জৈব রসায়নের গবেষণারও নাভিশ্বাস উঠেছে। ব্রিটিশ কোন ছাত্র এ বিষয়ে গবেষণা করতে চায় না। আর জার্মান ছাত্রদের দিয়ে যে কাজ করাবেন, ওরা সুযোগ পেলেই চাকরি নিয়ে ঢুকে যাবে কোন প্রতিযোগী জার্মান কোম্পানিতে। ফলে ছাত্র পাওয়া এক মহা সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো। এর সঙ্গে যোগ হল ফ্যাকটরি থেকে ছাড়া জলের প্রভাবে পরিবেশ দূষণের অভিযোগ, যা দেড়শো বছর পরে এখনো রঙের কারখানাগুলোর ক্ষেত্রে বিদ্যমান। আর হ্যাঁ, বিদেশী কোম্পানিগুলোর পেটেন্ট নিয়ে ঘন ঘন দরবার। ব্রিটিশ পেটেন্ট কানুন অন্য দেশের পেটেন্ট আইনের তুলনায় ছিল ঠুনকো, ফলে জার্মানরা তার ফায়দা নিতে লাগল।

শুধু তাই না। কিছু কিছু কেমিক্যাল কারখানায় আগুন লাগা আর বিস্ফোরণের খবর আসতে লাগল। সুচারু প্রতিরোধ ব্যবস্থা না থাকলে রসায়ণাগারে যা খুবই স্বাভাবিক। পার্কিন রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখতেন যে তাঁরও কারখানায় এমন হয়েছে। ধার্মিক মন কিছুতেই তাঁর কর্মীদের এই বিপজ্জনক অবস্থায় ফেলে দিতে সায় দিত না। তিনি ভাবতেন তাঁর পক্ষে ল্যাবরেটরিতে ফিরে যাওয়াই ভাল, কারখানা বা ব্যবসা চালানোর চেয়ে।

১৮৭৪ সালের পয়লা জানুয়ারি মাত্র এক লক্ষ পাঁচ হাজার পাউন্ডে তিনি পার্কিন অ্যান্ড সন্স বিক্রি করে দিলেন ব্রুক, সিম্পসন অ্যান্ড স্পিলার কোম্পানিকে। তার আগে ভাই টমাস বি এ এস এফের সঙ্গেও দরদস্তুর করেছিল, কিন্তু ওরা রাজি হয়নি। বিক্রির আট মাসের মধ্যেই নতুন মালিকানার অব্যবস্থাপনায় কোম্পানির বিক্রিবাটার দারুণ অবনতি ঘটে। নতুন মালিকরা পার্কিনদের বিরুদ্ধে জুয়াচুরির অভিযোগ এনেছিল, কিন্তু আদালতে তা ধোপে টেঁকে নি।

পার্কিন এবার ফিরে গেলেন সেইখানে, যেটা তাঁর একেবারে নিজস্ব জায়গা, রসায়নাগার।

এর মধ্যে রঙের ব্যবসার ফাঁকে ফাঁকে তিনি রং ছাড়াও অনেক কিছু আবিষ্কার করেছেন। ১৮৫৮ সালে তিনি আবিষ্কার করেন গ্লাইসিন, প্রথম অ্যামাইনো অ্যাসিড। দু বছর পর টার্টারিক অ্যাসিড আর এর সাথে ফিউমারিক- ম্যালেইক অ্যাসিডের সম্পর্ক। ১৮৬৮ সালে তিনি ল্যাবরেটরিতে তৈরি করেন কুমারিন, কৃত্রিমভাবে তৈরি করা প্রথম সুগন্ধি যৌগ, যা পারফিউমে ব্যবহার হয়। ঐ একই বছরে তিনি গ্লাইকোলিক অ্যাসিডের তৈরির পদ্ধতিও আবিষ্কার করেন।

ব্যবসা থেকে অবসর নিয়ে তিনি পুরোপুরি মৌলিক গবেষণায় ডুবে যান, এবং একের পর এক বিজ্ঞানভিত্তিক প্রবন্ধ ছাপতে থাকেন। ১৮৭৫ সালে তাঁর পদ্ধতিতে

বেঞ্জালডিহাইড থেকে সিনামিক অ্যাসিড বানানোর পদ্ধতি তাঁর নামে পার্কিন বিক্রিয়া বলে পরিচিত।

মাত্র আঠাশ বছর বয়সে তিনি ফেলো অফ দ্য রয়্যাল সোসাইটির সম্মান পান। পরবর্তীকালে তাঁর নামে চালু হয় রাসায়নিক শিল্পের সর্বোচ্চ পদক, পার্কিন মেডেল, যেটা তিনি নিজেই পান ১৯০৬ সালে। সেই একই বছর তিনি নাইট উপাধি পান ইংল্যান্ডের রাজপরিবার থেকে। পরের বছরই নিউমোনিয়া আর অ্যাপেন্ডিসাইটিসে তাঁর মৃত্যু হয়।

লুই পাস্তুর বলেছিলেন, পর্যবেক্ষণের জগতে ভাগ্য সেই মননকেই সাহায্য করে যা সাহায্যলাভের জন্যে প্রস্তুত। কৃত্রিম রঙের কারিগর উইলিয়াম পার্কিন সেই মননের এক অত্যুজ্জ্বল উদাহরণ। কৃত্রিম রঙের ইতিহাস যেন পার্কিনের জীবনেরই ইতিহাস।

কৃত্রিম কুইনাইন বানানোর পরিকল্পনা দিয়ে শুরু করেছিলেন তিনি। সে চেষ্টা তাঁর সফল হয়নি। পরবর্তীকালে অসংখ্য বিজ্ঞানী সেই চেষ্টা চালিয়ে গেছেন, কিন্তু সাফল্য আসতে লেগে যায় আরো প্রায় একশো বছর। ততদিনে রসায়নের অনেক থিওরি আবিষ্কার হয়ে গেছে, তবুও কাজটি সহজ ছিল না। ১৯৪৪ সালে আমেরিকান বিজ্ঞানী উডওয়ার্ড ল্যাবরেটরিতে কুইনাইন বানান। বহু ধাপে বানানো এই পদ্ধতির উন্নতিসাধন করেন অন্যান্য বিজ্ঞানীরা এরপর, কিন্তু আজও ব্যবসায়িক পদ্ধতি হিসাবে সিঙ্কোনা গাছের ছালই এর প্রধান কাঁচামাল।

কৃত্রিম রঙের আবিষ্কার ব্যবহারিক জৈব যৌগের গবেষণাকে এগিয়ে দেয় অনেক ধাপ। ওষুধপত্র ও অন্যান্য নিত্যব্যবহার্য জিনিসের আবিষ্কার হতে থাকে একের পর এক। জীবনবিজ্ঞান, যার মূলে আছে প্রাণী ও উদ্ভিদের বিভিন্ন ধরণের কোষ বা সেল ও কলা বা টিস্যু, অণুবীক্ষণ যন্ত্রে তাদের পার্থক্য করার জন্যে বিভিন্ন ধরণের কৃত্রিম রঙের ব্যবহার এই বিজ্ঞানের শাখাকে এগিয়ে দিতে সাহায্য করল।

কিন্তু সেসব অন্য গল্প। শোনাবো আর এক দিন।

ছবিঃ সংগৃহীত

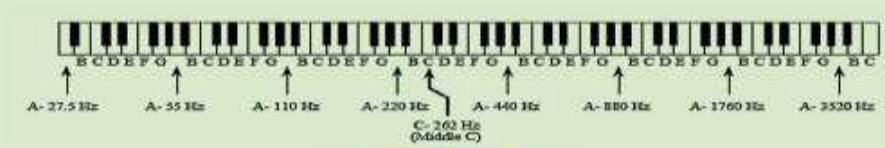

সুর ঢাক

প্রদীপ মুখোপাধ্যায়

ট্রেবল্ ক্লেফটাকে কেন জি-ক্লেফ বলে যদি খুঁজে বের করতে পার তাহলে বাকিগুলোর পরিচয় এমনিই পেয়ে যাবে। খোঁজার সুত্র কিন্তু ওই গয়নাটা আর লাইনের মধ্যেই লুকোনো আছে - বলেছিলাম আগেরবার।

গয়না বলতে বলেছিলাম এই 𝄞 - জি-ক্লেফ্ বা ট্রেবল্-ক্লেফ চিহ্নটার কথা। লক্ষ্য করে দেখ চিহ্নটার নীচের দিকে যে বৃত্তের মত অংশটা আছে সেটা নীচে দেওয়া স্বরলিপিতে স্টাফ্ -এর কোন স্বরের লাইনটাকে ধরে আছে - 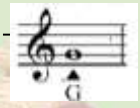

(গতবারের স্বরলিপিটাই নীচে আবার দিলাম-যারা সুত্রটা ধরতে পেরেছ তারা মিলিয়ে নিতে পারবে)।
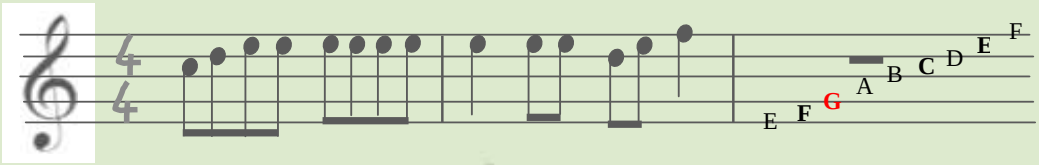
বারবার লাইনের ওপর স্বরের অবস্হান দেখে দেখে অভ্যেস করে নিলে আর এগুলোকে দেখে ভয় করবে না।

আমরা এতক্ষণ লাইনের ওপর আর দুটো লাইনের মাঝের জায়গাগুলোয় কোন্ কোন্ স্বরের জায়গা তাই দেখছিলাম। নীচের ছবিটায় দেখ প্রথম D আর শেষ G -এই দুটো স্বর কোথায় আছে।
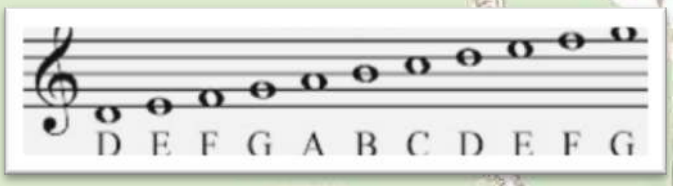
এই স্বরগুলো নীচের ফাইলটায় ডবল্-ক্লিক করে ডাউনলোড করলে যে কোন এম.পি-৩ প্লেয়ারে শোনা যাবে।

দুটোই লাইনের বাইরে তো?

তাহলে আরো দেখ - বিশেষ করে প্রথম C আর শেষের A, B, C - যেগুলো লাল রঙে দেখানো আছে -

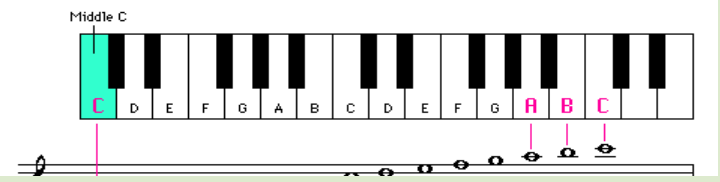

এই স্বরগুলো নীচের ঠিকানা থেকে ডাউনলোড করলে যে কোন এম.পি-৩ প্লেয়ারে শোনা যাবে।

http://www.mediafire.com/?svpnx0jv9o4v21e

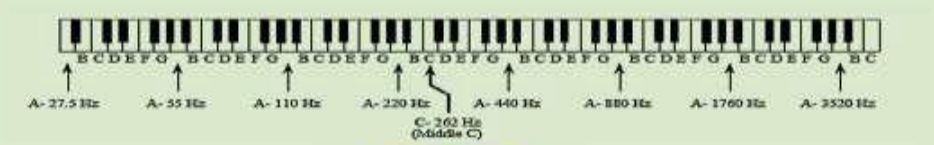

ওপরের এই ছবি দুটো থেকে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে লেজারের যে পাঁচটা লাইন, সেগুলোকে ওপরে বা নীচে আর না বাড়িয়ে শুধু স্বর-চিহ্নের মাঝখানে বা নীচে ছোট্ট করে লাইনের আভাস দিয়েই স্বরগুলোর অবস্থান বোঝানো হচ্ছে। তাই লেজারের ঠিক নিচে স্বর-চিহ্নের মাঝখানে একটা লাইন দেখলে আমরা বুঝি এটা mi ddl e-C, [লেজারের নীচ থেকে তৃতীয় ফাঁকের মধ্যের স্বরস্থান mi ddl e-C'র থেকে এক সপ্তক উঁচু/চড়া c; আবার লেজারের নীচ থেকে দ্বিতীয় ফাঁকে থাকে mi ddl e-C'র ঠিক ওপরের A], কিন্তু স্বরচিহ্নের পেট-টা যদি একটা লাইন দিয়ে কাটা থাকে তাহলে সেটা আরও এক সপ্তক উঁচু/চড়ার A।

তাহলে mi ddl e-C থেকে উঁচুর দিকের স্টাফ্-এ স্বরের অবস্থান দেখলে। এটাও নিশ্চয়ই বোঝা গেল যে mi ddl e-C থেকে নীচে বা খাদের দিকের স্বরগুলোর অবস্থান বোঝাতে অথবা mi ddl e-C থেকে দুই সপ্তকের বেশী উঁচু স্বরের অবস্থান বোঝাতে আমাদের এবার ক্রমাগত স্বরের ওপরে বা নীচে ছোট ছোট লাইন বাড়িয়ে চলতে হবে। কিন্তু যেহেতু সেটা খুব বেশী, মানে ধরো, বা এই রকম একটা অবস্থান। এখানে চট করে স্বরটা কি সেটা বোঝা একটু মুস্কিল। তাই খাদের বা mi ddl e-C'র নীচের সপ্তকের স্বরের জন্য ব্যবহার করা হয় F-ক্লেফ্-বা ব্যস(Bass)ক্লেফ্।

ব্যস(Bass)ক্লেফ্ দেখতে এইরকম -
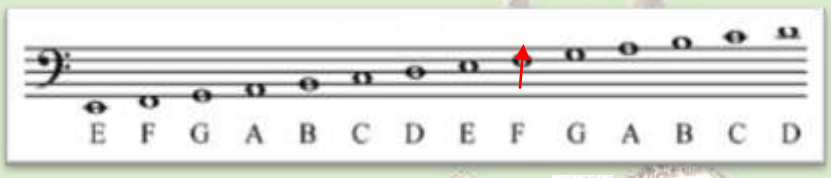
এই স্বরগুলো নীচের ঠিকানা থেকে ডাউনলোড করলে যে কোন এম.পি-৩ প্লেয়ারে শোনা যাবে।
http://www.mediafire.com/?960cbn798d9vab5

দেখলে নিশ্চয়ই যে এখানেও ওই গয়নার মত চিহ্ন-টা 'F' স্বরের লাইনটিকে ধরে আছে বিসর্গের মত দুটো বিন্দু দিয়ে - তাই ব্যস(Bass)ক্লেফ্ কে F-ক্লেফ্ ও বলে।

জি-ক্লেফ্ অনুযায়ী ভাবলে এখানে লাইনের ওপর আর ফাঁকের স্বরগুলো অন্যরকম লাগছে তো ? পারো তো জি আর এফ্ ক্লেফ্ দুটোকে মিলিয়ে দেখ কেমন মজা করে দুটো মিলে যাবে। মেলাতে না পারলে পরের বার দেখাব - কি আর করা!

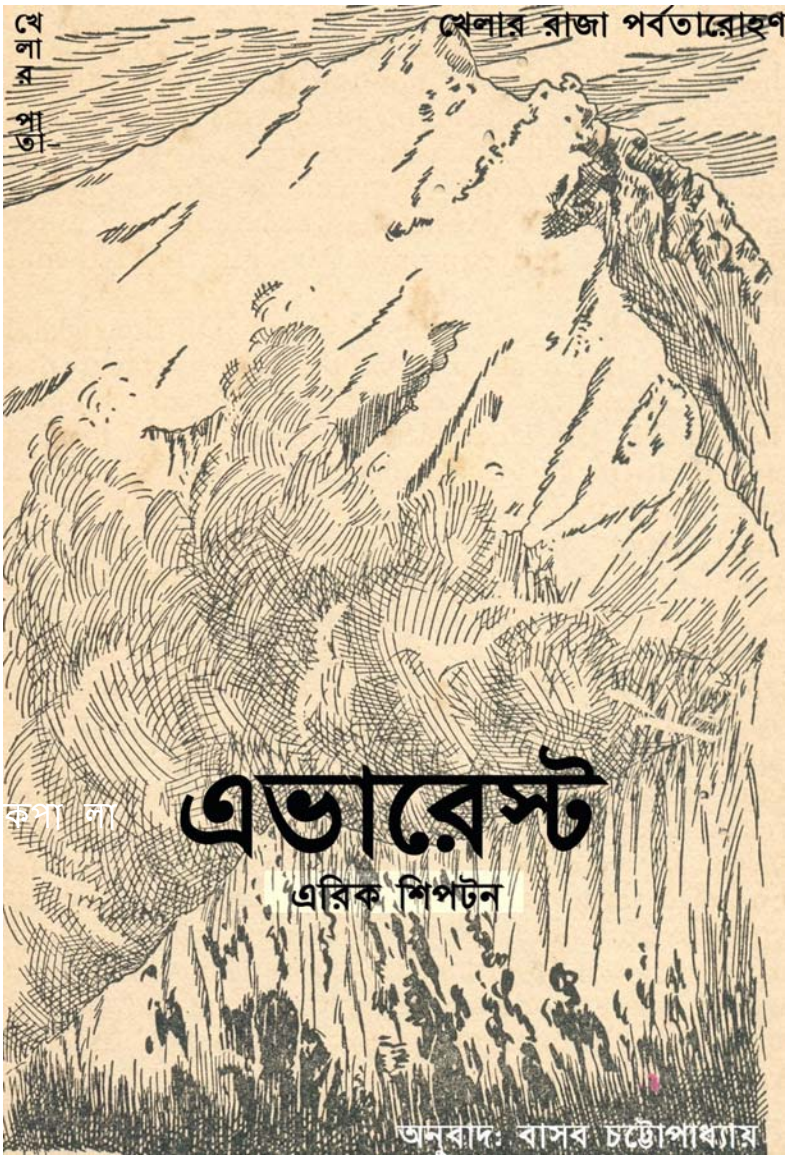

প্রথম পদক্ষেপ

১৯২১ সালের শেষাশেষি অসফল অভিযাত্রীরা ইংল্যান্ড ফিরে এল। সেই বছরই তিব্বত সরকারের কাছ থেকে পুণরায় এভারেস্ট অভিযানের ছাড়পত্র পাওয়া গেল। মনে করা হল—মে মাসের মাঝামাঝি থেকে জুনমাসের মধ্যবর্তী সময় এভারেস্ট অভিযানের পক্ষে অনুকূল।

জুনমাসে বর্ষার সময় স্যাঁতস্যাতে বায়ু দক্ষিণ দিক থেকে প্রবাহিত হওয়া সত্ত্বেও অভিযানের পক্ষে এই উচ্চতর আবহাওয়া আরামপ্রদ। কিন্তু কোন কারণে শৃঙ্গে টাটকা গুঁড়ো বরফের আস্তরণ পড়লে আরোহণ বিপজ্জনক হয়ে ওঠে।

বসন্তের শেষ থেকে বর্ষার মধ্যে সুন্দর আবহাওয়ার প্রত্যাশায় অভিযাত্রীদল রংবুক উপত্যকায় এপ্রিলের শেষে মূল শিবির স্থাপন করল। তার অর্থ মার্চের শেষে দার্জিলিং থেকে রওয়ানা হয়ে যেতে হবে। এবং সমস্ত সাজসরঞ্জাম ইংল্যান্ড থেকে ভারতবর্ষে জানুয়ারি মাসের শেষে পাঠানোর জন্য ব্যবস্থা নিতে হবেই। সুতরাং অভিযাত্রীদের হাতে আর কোন অবকাশ রইল না। শুরু হয়ে গেল অভিযানের তোড়জোড়।

এইবারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সিদ্ধান্ত নিতে হবে—দল নির্বাচন। আগের অভিযানের মতই এই অভিযানে আরোহণ যেহেতু প্রধান উদ্দেশ্য সেইহেতু দলের সদস্যদের অবশ্যই দক্ষ আরোহী হতে হবে। অগ্রসর হতে হবে সন্ধিৎসু মন নিয়ে।

এইসব কথা বিবেচিত করে দলের নেতা নির্বাচিত হলেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সি জি ব্রুস। দীর্ঘদিন গোর্খা রেজিমেন্টের অফিসার হয়ে হিমালয়ে কাটাবার ফলে নিজের দেশে এবং হিমালয়ের আদিবাসীদের কাছেও তাঁর প্রভূত খ্যাতি ছিল। এই কারণে বয়সে প্রবীণ হওয়া সত্ত্বেও সেনাবাহিনীর এই অফিসার তাঁর অভিজ্ঞতার জোরেই অভিযাত্রী দলের আদর্শ নেতা হিসেবে নির্বাচিত হলেন।

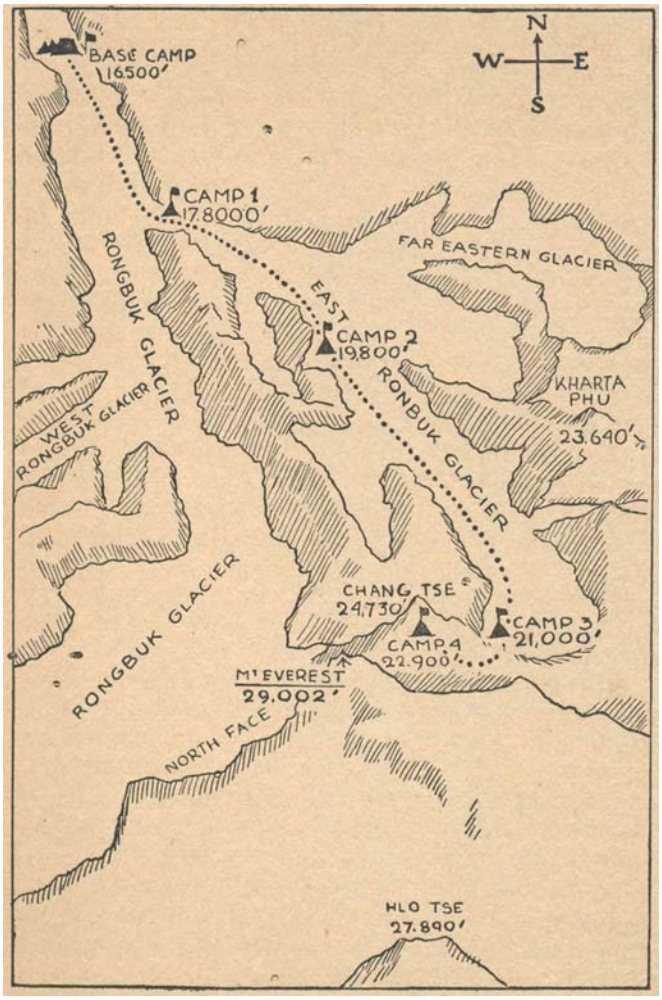

সবচেয়ে সৌভাগ্যের বিষয় ম্যালরি ও মরসিড পুনরায় এই অভিযানের সদস্য হলেন। কিন্তু বুলক পররাষ্ট্র দপ্তরের জরুরি কাজের জন্য এই অভিযানে যুক্ত হতে পারলেন না। এঁরা ছাড়াও এই অভিযানের আমন্ত্রিত অভিজ্ঞ পর্বতারোহী ড: টি জি লংস্টাফ শুধু অভিজ্ঞ চিকিৎসকই ছিলেন না, হিমালয় নিয়ে তাঁর দীর্ঘ গবেষণাও ছিল। আর দলে ছিলেন ই এল স্ট্রাট, ই এফ নর্টন, জি আই ফিঞ্চ, টি এইচ সমারভিল- এর মত অ্যালপাইন পর্বতারোহীরা।

এছাড়া অভিযাত্রীদলে ছিলেন জেনারেল ব্রুস- এর ভাইপো গোর্খা রেজিমেন্টের অফিসার কাঞ্চনজঙ্ঘার মত দুর্গম শৃঙ্গ অভিযানের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পর্বতারোহী সি জি ক্রফোর্ড।

নর্থ কল থেকে আরো উচ্চতায় অক্সিজেন ব্যবহারের সমস্ত উপকরণ মজুত থাকা সত্ত্বেও অভিযাত্রীদলে কেউ কেউ অক্সিজেন ব্যবহারের ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করল।

একদল যতপরনাস্তি কম যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে অভিযানের পক্ষপাতি। তাঁরা কৃত্রিম যন্ত্রপাতি ব্যবহারে আসা শৃঙ্গে অভযানের সাফল্যকে খাটো করে দেখতেন। কিন্তু অন্যমতাবলম্বীরা মনে করতেন, এভারেস্ট অভিযান কোন চমক প্রদর্শন করবার অভিযান নয়। অতি উচ্চতর আবহাওয়ায় আসা ব্যক্তির ফুসফুসের শক্তি প্রদর্শন

করতে কৃত্রিম অক্সিজেন ব্যতীত আরোহণের দ্বারা পর্বতারোহণের ন্যুনতম নীতিরই বিরোধীতা করে। তাঁরা একথাও জানান যে কৃত্রিম সরঞ্জাম ব্যতীত শব্দটি অর্থহীন। আইস অ্যাক্স, দড়ি ইত্যাদি কৃত্রিম সরঞ্জাম ব্যাতীত কি অভিযান সম্ভব! বড় সিলিন্ডারের পরিবর্তে ছোট পাত্রে অক্সিজেন ব্যবহার করলে অভিযাত্রীরা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। আধুনিক বিজ্ঞান বহনযোগ্য পাত্রে অক্সিজেন ব্যবহারের যে পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন, সেটি কি রক্ষণশীল আরোহীরা ব্যবহার করবেন না?

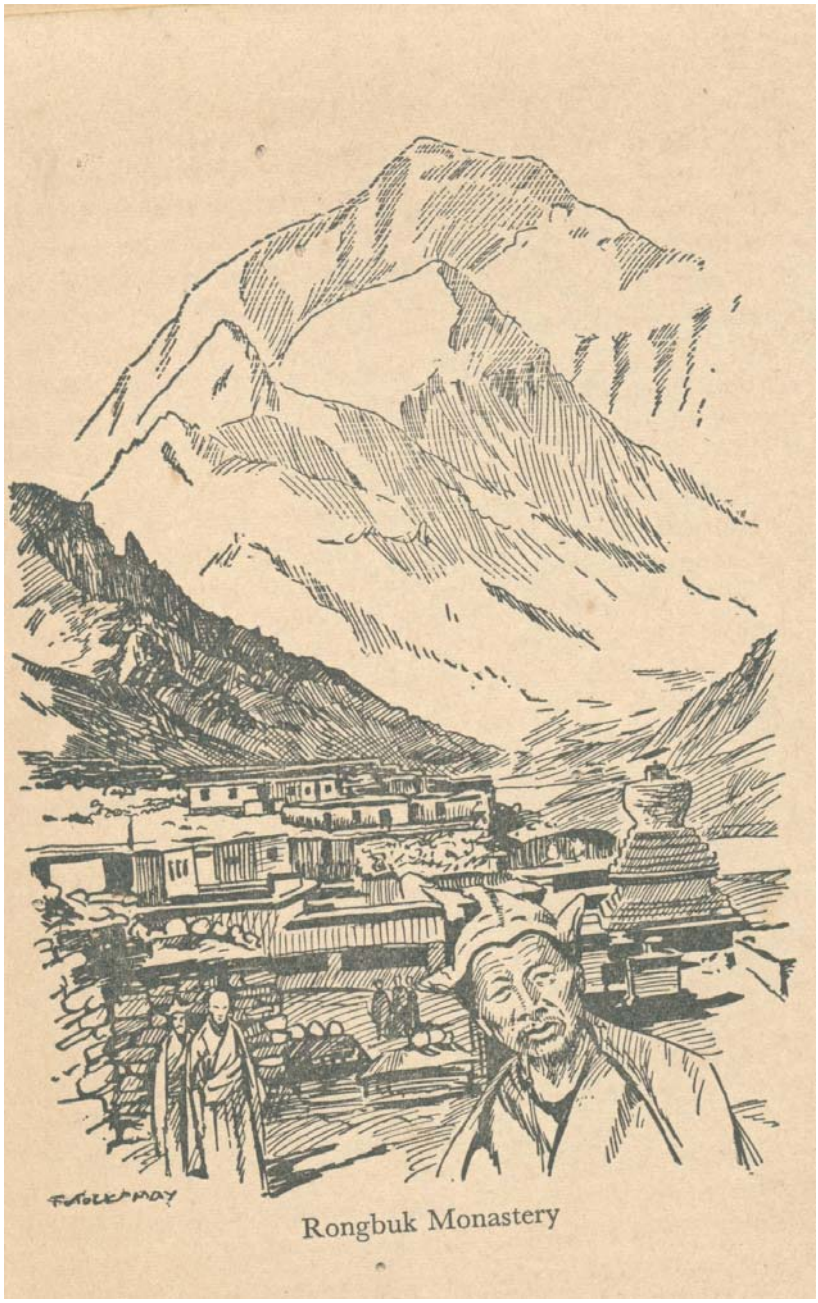

Rongbuk Monastery

দলটি ২৬ শে মার্চ দার্জিলিঙ থেকে রওয়ানা হয়ে মাসের শেষেই রংবুক মনাস্ট্রিতে পৌঁছলো। এবং গতবারের মতই তিব্বতের মাটি দিয়েই অভিযানের শুরু হল। এভারেস্ট থেকে ১৬ মাইল দূরের অভিযাত্রীরা লামাদের দ্বারা আপ্যায়িত হল। তাঁরা প্রশ্ন করলেন—কেন এই অভিযান?

ব্রুস জানাতে বাধ্য হলেন—কোন দুর্মূল্য খনিজ পদার্থের সন্ধানে তাঁরা এখানে আসেন নি। তাঁরা এসেছেন তীর্থযাত্রী হিসেবে দেবাদিদেব হিমালয়ের উচ্চতম চূড়ার স্পর্শ পেতে।

এপ্রিলের মাস শেষ হবার আগেই রংবুক হিমবাহের শুরুতেই মূল শিবির স্থাপন হল। অসংখ্য তাঁবু পড়ল নর্থ কলের রাস্তা বরাবর।

এভারেস্ট আরোহণ কী দুরূহ কাজ ছিল সে ব্যাপার ১৯২২ সালেই পর্বতারোহীরা অনুধাবন করেছিলেন। প্রচন্ড ঝোড়ো হাওয়া সত্ত্বেও নর্থ কলে ২৩০০০ ফুটের বেশি উচ্চতায় নিয়মিত খাদ্য ও আরোহণের সরঞ্জাম পৌঁছলেও দলের কাছে একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াল। ১৭০০০ ফিট উচ্চতায় পূর্ব রংবুক হিমবাহ শুরু হবার আগেই ক্যাম্প- ওয়ান স্থাপিত হল। সেখান থেকে হিমবাহ প্রায় চার মাইল অতিক্রম করার পর ১৯৮০০ ফুট উচ্চতায় স্থাপিত হল ক্যাম্প- টু। ক্যাম্প- থ্রি স্থাপিত হল ২১০০০ ফুট উচ্চতায়। সেখান থেকে নর্থ কল পুরোপুরি দেখা যায়।

এই ক্যাম্প থ্রি থেকে ম্যালরী এবং সমারভিল নর্থ কলের সেই খাড়াই গিরিপথের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন, গতবারের অভিযানে যে উচ্চতা পর্যন্ত তাঁরা পৌঁছতে পেরেছিলেন।

যে কোন তুষারাচ্ছাদিত পর্বত প্রতিবছর তার চরিত্র বদলায়, ১৯২১ সালে ম্যালরি যে নরম বরফাচ্ছাদিত গাত্র দিয়ে আরোহণ করেছিলেন, সেই গাত্র পরের বছর কঠিন বরফে ঢাকা।

ফলে নর্থ কল অতিক্রম করতে আরোহীরা অপ্রত্যাশিত বাধার সম্মুখীন হল। দুজন আরোহী ও একজন মালবাহক ঐ কঠিন বরফগাত্র আরোহণের সময় আইসিক্‌ল্‌স ভেঙে পড়ল। কিন্তু দড়ি বাঁধা থাকায় এইবারের মত তারা জীবন ফিরে পেল। ম্যালরি উপলব্ধি করলেন—অতিরিক্ত কোন মালবাহক নিয়ে এই খাড়াই পথ আরোহণ করে ক্যাম্প- ফোর স্থাপন করতে গেলে আরো বড় বিপদের সম্মুখীন হতে হবে।

ক্রমশ

সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো ঠগি মহম্মদের হাতের রুমাল বিদ্যুৎবেগে গিয়ে জড়িয়ে গেল ব্রিজলালের গলায়। তার পাশে অন্য এক ঠগির রুমাল পরেছে তার ছেলের গলাতে। একটা টুঁ শব্দ না করে দুটো মানুষ মাটিতে পড়ে গিয়ে ছটফট করছিলো একটু বাতাসের জন্য। দুই ভুত্তোটের হাতের রুমালের টান অবশ্য তাতে মোটেই ঢিলে হল না। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে শরীরদুটো স্থির হয়ে যেতে ভুত্তোটরা তাদের গলার রুমাল খুলে নিতেই অন্যরা ধরাধরি করে শরীরগুলো, আগে থেকে তৈরি করে রাখা কবরের দিকে নিয়ে চলে গেল।

“এবারে বাকিগুলোর ব্যবস্থা করো হে!” বাবা নিচু গলায় আদেশ দিলেন। বলতে না বলতেই একদল ঠগি নিঃশব্দে ছুটে গেল খানিক দূরের গাছতলার দিকে। সেখানে ব্রিজলালের দলের লোকজন রান্না চড়িয়েছে তখন। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তারাও সব শেষ।

“চল, শরীরগুলোর কীভাবে গতি হয় সেটা দেখাই,” বলতে বলতে বাবা আমার হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে চললো। আমাদের আড্ডার একপাশে একটা কয়েক ফুট গভীর শুকনো নালার মধ্যে একটা গভীর গর্ত খোঁড়া হয়েছে। তার পাশে পাশাপাশি আটটা শরীর রাখা।

“সবগুলো এসেছে?”

বাবার প্রশ্নের জবাবে গর্ত খুঁড়িয়ে লুগাইদের একজন মাথা ঝুঁকিয়ে বললো, “আজ্ঞে হ্যাঁ খোদাবন্দ।”

“তাহলে এবারে ভেতরে ফেলো।” আদেশ পেতেই একে একে দেহগুলোর পেটে একটা করে ফুটো করে তাদের গর্তে ফেলে ওপরে মাটি ফেলা শুরু হল। তারপর কবরের ওপরের মাটি সমান করে দিতে আটটা মানুষের আরে কোন চিহ্নও রইলো না।

সে রাতে আমার খুব মন খারাপ হয়েছিলো। ঘুম এসেছিলো অনেক রাতে। সকালে নামাজ পড়বার জন্য বাবার ডাকে ঘুম ভাঙলো। নামাজ পড়তে বসেও আমার চোখে কাল রাতের সেই বুড়ো আর তার ছেলের মুখদুটো ভাসছিলো। নামাজ শেষ হতেই সবাই মিলে ঘোড়ায় চড়ে জোরকদমে গণেশপুর ছেড়ে চললাম। খুনের এলাকা ছেড়ে যত তাড়াতাড়ি অনেক দূরে চলে যাওয়া যাবে ততই আমাদের পক্ষে নিরাপদ।

বেশ অনেকক্ষণ ছোটবার পর একটা ছোট বসতির কাছে পৌঁছে আমরা থামলাম। দলের একজন লোক গ্রামে গিয়ে এক টাকার গুড় কিনে আনলো। গুড় দিয়ে কী হবে সেটা আমার বোধগম্য হচ্ছিল না। বাবাকে জিজ্ঞেস করতে তিনি বললেন, "ব্যাপারটা ভালো করে দেখে,বুঝে নাও। একে বলে টুপুনি। প্রত্যেক শিকারের পরে আমাদের এটা করতেই হয়। নইলে অমঙ্গল হয়।"

বদ্রীনাথ ততক্ষণে একটা কম্বল পেতে তার ওপরে পশ্চিমমুখো হয়ে বসেছে। দলের সব সেরা ভুত্তোটরা এসে তাকে ঘিরে বসেছে। বদ্রীনাথের নির্দেশে কম্বলের কাছে মাটির ওপরে বাবা একটা ছোট্ট গর্ত করলেন প্রথমে। কম্বলের ওপরে রাখা হল বদ্রীনাথের পবিত্র গাঁইতি, গুড় আর একটুকরো রূপো। তার থেকে খানিক গুড় নিয়ে বাবা সেই গর্তের মধ্যে রাখলেন। তারপর আকাশের দিকে হাত তুলে বললেন, "জয় মা ভবানী। আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করো মা!" দলের বাকিরাও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে একই প্রার্থনা জানালো। তারপর গর্তের মধ্যে আর গাঁইতির গায়ে জলের ছিটে দিয়ে বাবা প্রসাদি গুড় সবার মধ্যে ভাগ করে দিলেন। শেষে একটা বড়ো দলা আমার হাতে দিতে আমি সেটা মুখে পুড়ে দিলাম। বাবা বললেন, "এই যে পবিত্র গুড় তুমি খেলে, এরপর আর ঠগিধর্ম ছাড়া তোমার পক্ষে সম্ভব হবেনা কোনদিন। এ গুড় যে খায় তার ওপরে এর প্রভাব থাকে সারাজীবন।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "তাই হয় নাকি?"

"হয়। হাজার হাজার উদাহরণ আছে। অন্যদের জিজ্ঞাসা করে দেখো, তারাও এই একই কথা বলবে তোমায়।"

আগের রাতের শিকারের পর আমার মনখারাপের ব্যাপারটা বাবার নজর এড়ায়নি। সেদিন সন্ধেবেলায় বাবা আমায় ডেকে খুব একচোট বকাঝকা করলেন তাই নিয়ে। বলেন, "এমন করলে চলবে কী করে? তুমি একা হাতে বাঘ মারতে

পারো, অথচ এই সামান্য একটা কাজ দেখে ঘাবড়ে যাবে তুমি সেটা তো বড় লজ্জার কথা! মনে রেখো তুমি ঠগির গুড় খেয়েছো।”

বাবার কথা শুনে হোসেন মাথা নেড়ে বলে, “সাহেবজাদাকে এমন করে বোল না ইসমাইল। নিজের কথা তোমার মনে নেই? প্রথমবারে তুমি এর থেকেও বেশি ঘাবড়ে গিয়েছিলে কিন্তু। সেবার গণেশকে তোমার ব্যাপারে বোঝাতে গিয়ে কম ঝামেলা হয়েছিলো আমার? সাহেবজাদা আর দু একটা শিকার দেখুক নিজে চোখে, তারপর দেখো কেমন বাঘের বাচ্চা তৈরি হয়,” বলতে বলতে আমার দিকে ঘুরে পিঠ চাপড়ে দিয়ে সে বলে , “ঘাবড়াও মৎ। তোমার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। বুড়ো হোসেনের চোখ কখনো ভুল করে না। ইনসাল্লা, বাপকেও একদিন ছাপিয়ে যাবে তুমি দেখে নিও। আর দুএকটা শিকার দেখো, তারপর নিজে হাতে একটা জান নাও, ব্যস। সব ঠিক হয়ে যাবে।”

“সে ঠিক আছে,” বাবা বললেন, “দেখো আমীর, আমার শুধু চিন্তা, আজ যে ভয়টা তুমি পেয়েছো সেটা যেন আর না বাড়ে। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে ভালোমানুষ হও, গরীবকে করুণা করো, ভিক্ষে দাও, সে সব ঠিক আছে। কিন্তু তুমি যে ঠগি, আল্লা তোমার শিকার বানিয়ে যাকে পাঠাবেন তাকে শেষ করাটা যে তোমার ধর্ম সেটা কখনো ভুললে চলবে না।”

আমি মাথা নেড়ে বললাম, “তোমার কথা আমার মনে থাকবে বাবা। আজকের পরে আর তোমাকে এমন কোন অভিযোগ করবার সুযোগ দেবোনা আমি। যেদিন তুমি বোলবে সেই দিনই আমি রুমাল তুলে নেবো হাতে, ” এই বলে প্রসঙ্গটা বদলাবার জন্য আমি ফের বললাম, “মহম্মদ কালকে রাতের শিকার ব্রিজলালের ব্যাপারে কিছু গল্প শোনাবে বলেছিলো। এইবারে আমরা সে গল্পটা শুনতে চাই।”

সঙ্গে সঙ্গে সবাই আমার সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলে, “হ্যাঁ, হ্যাঁ গল্প হোক। মহম্মদের মত গল্প আর কেউ বলতে পারে না।”

মুখে একটা জর্দাপান পুড়ে খানিক মুচমুচ করে চিবিয়ে বিরাট এক পিক ফেলে মহম্মদ সবার মাঝখানে এসে বসে তার গল্প শুরু করলোঃ

নাগপুরের বোরি গ্রামে আমার জন্ম। আমরা বহু পুরুষের ঠগি। ছোটবেলা থেকে বাপদাদার কীর্তিকলাপের গল্প শুনে আমি বড়ো হয়েছি। টাকাপয়সা আমাদের মন্দ ছিলো না। নাগপুরের রাজদরবারে মোটা টাকা দিয়ে গ্রামের প্যাটেলের পদটা কিনে নিয়েছিলেন আমার পূর্বপুরুষেরা। কিন্তু তাতে ঠগি হওয়া আটকায়নি তাদের। আমার দাদু কাশিম ছিলেন নামকরা ঠগি। তাঁর মৃত্যুর পর আমার বাবা তাঁর জায়গায় গ্রামের প্যাটেল হলেন আর সঙ্গে সঙ্গে ঠগি ব্যবসাও চালাতে লাগলেন জোরকদমে। কিন্তু তাঁর ভাগ্য অত ভালো ছিলো না। মনে পড়ে একদিন কয়েকটা সেপাই এসে পেশকারের পরওয়ানা দেখিয়ে বাবাকে ধরে নিয়ে গেল রাজার কাছে। বাবা অনেক করে বোঝালেন ,তাঁর কোন খাজনা বাকি নেই, কোন বেআইনি কাজ করেছেন এমন কোন প্রমাণও নেই। কিন্তু সেপাইরা তাতেও যখন কথা শুনলো না তখন বাবা তাদের ঘুষ দেবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাতেও কাজ হলো না কোন। শেষে আমি তাঁর সঙ্গে চললাম। আমার বয়েস তখন এই সাহেবজাদার মত। নাগপুরে পৌঁছতে আমাদের হাতে পায়ে বেড়ি দিয়ে সোজা জেলে ভরে দেয়া হল। পান, তামাক, পরিষ্কার কাপড়জামা কিছুই দেয়া হত না আমাদের। কারো সঙ্গে দেখাও করতে দেয়া হত না। এমনকি বাড়িতে আমার মায়ের কাছে একটা খবর দেয়ারও রাস্তা ছিলো না কোন। এমনি করে চার মাস কেটে গেল। বাবা বারবার জানবার চেষ্টা করছিলেন আমাদের নামে নালিশটা কী। অবশেষে ওই ব্রিজলাল, যাকে কাল আমি মারলাম, সে একদিন কয়েকটা সেপাই নিয়ে আমাদের জেলখানায় এল। বাবার সামনে দাঁড়িয়ে বললো, “প্যাটেলজি, কয়েকবছর আগে তোমাদের গ্রামের জয়সুখদাস বেণের পরিবারের ব্যাপারে তদন্ত করতে গিয়েছিলাম, তোমার মনে আছে? লোকটার বা তার পরিবারের

ঠিক কী হয়েছিলো সে ব্যাপারে সরকারকে কিছু বলবে? সেবার তুমি আমার সঙ্গে যা ব্যবহারটা করেছিলে সে আমি কখনো ভুলবো ভেবেছ?"

"ব্যাটা মুৎসুদ্দি, তোকে আমি কিছু বলবো ভেবেছিস? ফিরে গিয়ে কাশিম প্যাটেলের সঙ্গে কথা বলবার যোগ্য কোন লোককে পাঠা, তবে আমি ভেবে দেখব," বাবা জবাব দিলেন।

"না বলে কী করে থাকিস তুই আমি দেখছি," এই বলে শয়তানটা গরম ছাই ভরা একটা থলে বাবার মাথায় পরিয়ে দিয়ে পিঠে গুমগুম করে কিল মারতে লাগলো। একটু পরে বাবা মার খেতে খেতে যেই শ্বাস টেনেছে অমনি সেই ছাই গিয়ে নাকে মুখে ঢুকে প্রায় মরে যায় আর কি! কয়েকবার এইরকম করবার পর বাবা অজ্ঞান হয়ে যেতে শয়তানটা জেলখানা ছেড়ে চলে গেল। যাবার আগে কড়া নির্দেশ দিয়ে গেল, বাবাকে যেন একফোঁটা জলও না দেয়া হয়। সবাই চলে গেলে পড়ে সকালে আমাদের যে জলটা দেয়া হয়েছিলো তার থেকে পড়ে থাকা সামান্য জল নিয়ে বাবার চোখেমুখে দিয়ে তাঁর জ্ঞান ফেরালাম আমি। অবশিষ্ট জলটুকু খেয়ে বাবা কোনমতে উঠে বসলেন ফের।

জিজ্ঞাসা করলাম, "লোকটা তোমার সঙ্গে শত্রুটা করছে কেন বলো তো!"

বাবা বললেন, "শোন। কয়েকবছর আগে আমাদের গ্রামের সুদের কারবারী জয়সুখদাস মারা যায়। মারা যাবার আগে আমাকে ডেকে পাঠিয়ে আমার হাতে তার পরিবারের দায়িত্ব দিয়ে বলে, "এদের তুমি ওই নরপিশাচ ব্রিজলালের হাত থেকে রক্ষা কোরো। "

জানা গেল কয়েক বছর আগে নাগপুরের দরবারে সবার সামনে জয়সুখদাসকে ব্রিজলাল বিনা কারণে ভীষণ অপমান করে আর চোর বলে গালাগাল দেয়ায় জয়সুখদাস তাকে জুতো ছুঁড়ে মেরেছিলো। সেই অপমানের কথা ব্রিজলাল ভোলে নি। তার পর থেকে সে ক্রমাগত চেষ্টা করে গেছে কীভাবে জয়সুখদাসের সে সর্বনাশ করবে। তাই মরার সময় জয়সুখদাসের ভয় হয়েছে এবার হয়তো তার পরিবারের ওপর বদলা নেবে ব্রিজলাল।

"জয়সুখদাস মারা গেলে তার জমানো সমস্ত সোনাদানা আর সুদে খাটানো যতোটা টাকাপয়সা তোলা যায় সেসব তুলে নিয়ে তার বৌবাচ্চাকে আমি আমার দলের একটা লোকের পাহারায় তাদের দেশ মারওয়ার- এ পাঠিয়ে দিলাম। এর এক

সপ্তাহ বাদে ব্রিজলাল জয়সুখদাসের সব সম্পত্তি ক্রোক করে তার পরিবারকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাবার জন্য পাইক পেয়াদা নিয়ে এসে হাজির হল। আমি তাকে কোন খবর দিতেই রাজি হলাম না। তাতে রেগে গিয়ে আমায় ন ভূতো ন ভবিষ্যতি গালাগাল শুরু করল ব্রিজলাল। আমি তখন তাকে জুতোপেটা করে গ্রাম থেকে বের করে দিলাম। পাড়ার ছেলেপিলেরা তার পেছন পেছন তার গায়ে কাদা ছিটোতে ছিটোতে চলল।

"এর পর ব্রিজলাল আর আমার সঙ্গে কোন যোগাযোগ করেনি বটে, কিন্তু আমি জানতাম নাগপুরের রাজদরবারে আমার একজন শত্রু হয়েছে। কারণ, পাড়াপড়শির সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ হলে যদি দরবারে কোন নালিশ দিতাম, তাহলে তার কোন সুবিচার হতনা এর পর থেকে। শেষমেষ রেগে গিয়ে একদিন আমি দরবারে সুবিচারের দাবি করে লোক পাঠালাম। কিন্তু সুবিচার দূরস্থান, সেদিন ব্রিজলাল সভায় দাঁড়িয়ে আমার নামে ফের যা নয় তাই বললো। তার তখন রাজসভায় বেজায় ক্ষমতা।

"সেই থেকে গত পাঁচ বছর ধরে আমি ভয়ে ভয়ে আছি , বুঝলে? নাগপুরের দরবারে আমার যে বন্ধুবান্ধব আছে তারা আমায় সাবধান করে দিয়েছিলো যে আমি খুন হয়ে যেতে পারি। তা সে সাবধান তো আমি হয়েইছিলাম, কিন্তু এবারে এ লোকটা নতুন কোন চাল দিয়ে আমাদের একেবারে কবজা করে ফেলেছে। এখন আল্লাই ভরোসা।"

ক্রমশ

ছবিঃ মৌসুমী

ভৌতিক র‍্যাগিং

জানাচ্ছেঃ মহাশ্বেতা

শীতের মরসুমে এখানে ওখানে হরেকরকম বইমেলা গড়ে উঠছিল। ছোটখাটো থেকে বিশাল বড় বড় বইমেলা, গলি থেকে বড় রাস্তা – এরকম অনেক বইমেলাই আয়োজিত হয়েছে এই হাড়- কাঁপানো শীতে। আর আমরাও বেশ কিছু নতুন বই কিনতে ও পড়ে উঠতে পেরেছি এই সময়টাতে। এইরকমই একটা বইমেলায় "ভৌতিক র‍্যাগিং" বইটা চোখে পড়ল। একে কমিক্সের বই তায় আবার ভূতটুত নিয়ে কারবার, দেখামাত্র কেনা হয়ে গেল। রাতে লেপ মুড়ি দিয়ে বইটা এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেললাম। ছ'খানা গা- শিরশিরে ভৌতিক গল্প নিয়ে কমিক্স্। গল্পগুলোর কিছু হেমেন্দ্রকুমার রায় ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মত লেখকদের কাজ আর কিছু বইটার সম্পাদক ও অলংকারক বিজন কর্মকারের নিজের লেখা গল্প। কিন্তু

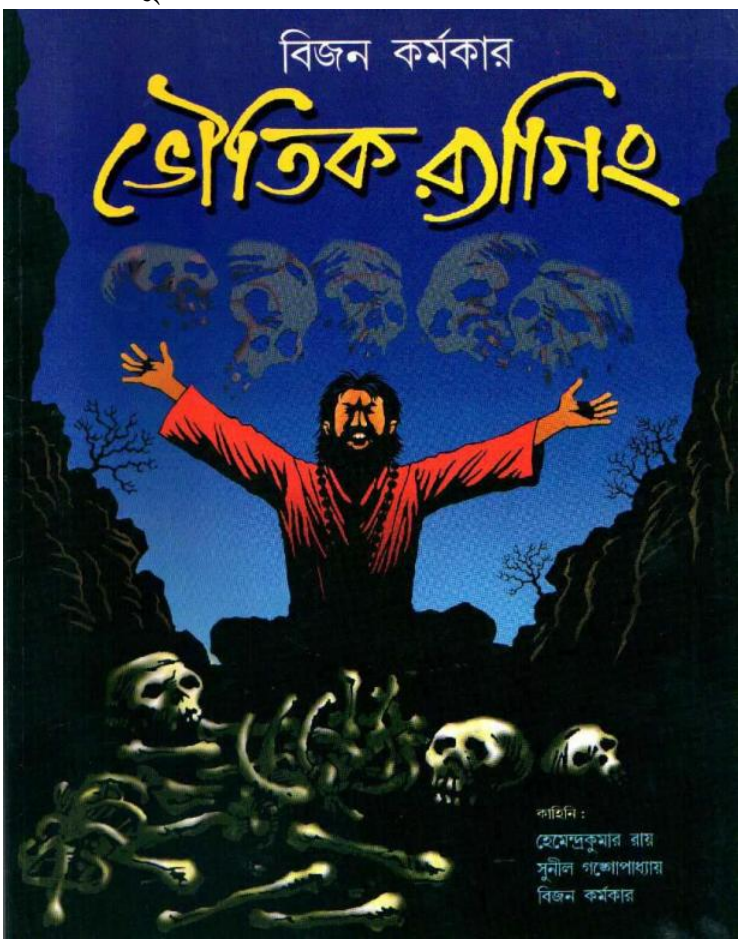

সব কটাই বেশ গা ছমছমে। আমার নিজের সবচেয়ে ভাল লেগেছে "নরকের ডাক" কমিক্স্টি। শুনেই কেমন একটা ভয় ভয় লাগে, তাই না? শীতের রাতে লেপের তলায় বসে পড়ার জন্য একেবারে আদর্শ বই, কিন্তু বসন্তকালে পড়ার পক্ষেও খুব একটা খারাপ নয়। অতএব, তোমরা বইটা জোগাড় করে পড়ে ফেল আর জয়ঢাককে জানিও কেমন লাগল,

বইয়ের নাম- ভৌতিক র‍্যাগিং

লেখা- হেমেন্দ্রকুমার রায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বিজন কর্মকার

অলংকরণ- বিজন কর্মকার, প্রকাশনী- নিউ বেঙ্গল প্রেস, দাম - ৫০.০০ টাকা

লোককথা

মানুষ কীভাবে এল

মহাশ্বেতা

অনেকদিন আগের কথা। সমুদ্রপাড়ের ঝলমলে বালিতে তখনও মানুষের পায়ের দাগ পড়েনি, ‘কপি’ গ্রামে তখন আগুনও জ্বালানো হত না, আর রঙিন পাখিরা অয়াবাগ পাহাড়ের ওপর দিয়ে উড়ে গেলে তাদের ধরে খাঁচায় পোড়ার কেউ ছিল না। পৃথিবীও তখন মানুষের অস্তিত্বের কথা জানতো না। শুধু জঙ্গলের ঠিক মধ্যিখানে একটুখানি ফাঁকা জায়গায় দু’জন মানুষ ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও মানুষ ছিল না। সেই ফাঁকা জায়গায় ছিল একটা বাঁশের কুঁড়ে ঘর। সেখানে থাকতো দুই ভাই, আকেকানে আর কুমানকানে। তারাই ছিল পৃথিবীতে প্রথম মানুষ।

একা- একাই তাদের দিন কেটে যেত। একে অপরের সঙ্গে ছাড়া আর কারো সাথে কথা বলার সুযোগ ছিল না তাদের। বাড়িতে বাবা, মা, বৌ, ছেলে, মেয়ে কেউ ছিল না। জীবনধারণের জন্য অনেক কষ্টও তাই করতে হত তাদের। আগুন জ্বালাতে পারতো না তারা তাই শীতের দিনে খুব কষ্ট পেত। বলার জন্য কোন গল্পও জানতো না দুই ভাই। কিন্তু সবচেয়ে কষ্টদায়ক ছিল তাদের সেই একাকিত্ব।

একদিন আকেকানের জঙ্গলে গিয়ে খাবার নিয়ে আসার কথা।

“পারলে বাদাম নিয়ে আসিস, আকেকানে,” কুমানকানে চিৎকার করে তাকে বলল, “কদিন রেখে দিতে পারব। শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমাকে আর জঙ্গলে যেতে হবে না।”

“আলসে কোথাকার!” আকেকানে ঝুলি হাতে গজগজ করতে করতে জঙ্গলে ঢুকে গেল।

সেদিন তার ছিল কপালটাই খারাপ। ঘন জঙ্গলে ফলমূল খুঁজতে খুঁজতে আকেকানে কয়েক ঘন্টার মধ্যে জঙ্গলের একটা অচেনা এলাকায় চলে এল। সেখানে সে আগে কখনও আসেনি। ভাল ফলটল কিছুই পায়নি আকেকানে। ঝুলিতে শুধু কয়েকটা আজেবাজে শিকড়বাকড় ছাড়া আর কিছু পুরতে পারেনি সে। একটু ক্লান্তও হয়ে পড়েছিল সে। হাঁটতে হাঁটতে শেষ পর্যন্ত একটা ছোট্ট নদীর ধারে এসে পৌঁছোল সে। সেখানে থেকে আঁজলা ভরে জল খেয়ে পরিষ্কার জায়গা দেখে বসে পড়ল সে। খানিক এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে কিছু দূরে একটা বাদাম গাছ। থোকা থোকা বাদাম ফলে রয়েছে গাছটায়। দেখেই জিভে জল এল আকেকানের। দৌড়ে গিয়ে গাছটা বেয়ে উঠে পড়ল সে। কিছুক্ষণ বাদামগুলোকে টিপে টিপে পরখ করে দেখে নিল। সদ্য পাকতে আরম্ভ করছিল সেগুলো। এইসময়ই বাদাম খেতে সবচেয়ে ভাল হয়। মুঠো মুঠো বাদাম ছিঁড়ে গায়ে জড়ানো ঝুলির ভেতর ভরতে লাগল আকেকানে। বাদাম দেখে কুমানকানে কত খুশি হবে এই ভেবে মুখে তার অ্যাত্তোবড় একটা হাসি ফুটে উঠেছিল।

গাছ থেকে নেমে আবার নদীর ধারে বসে পড়ল আকেকানে। ঝুলি থেকে একটা একটা করে বাদাম বের করে খেতে লাগল সে। সেগুলো ছিল রসালো ও সুস্বাদু। খেয়ে প্রাণ জুড়িয়ে গেল আকেকানের। ঠিক তক্ষুণি একটা আশ্চর্য জিনিস ঘটে

গেল। নদীর ওপার থেকে স্পষ্ট মানুষের গলায় হাসি ও কথাবার্তার আওয়াজ আকেকানের কানে এল।

“কুমানকানে! ও আবার আমার পিছু নিল কেন?” এই ভেবে আকেকানে আরও মন দিয়ে আওয়াজটা শুনতে লাগল। কিন্তু ওরকম মিষ্টি হাসি ও সরু গলা তো কুমানকানের হতেই পারে না। তার গলা এর চেয়ে অনেক ভারী আর গম্ভীর।

“তাহলে কি কোন জন্তু? কিন্তু কী ধরণের জন্তু ওইরকম আওয়াজ করে? এমন তো কোনদিন শুনিনি।“ আকেকানে মাথা চুলকোতে চুলকোতে ভাবল। ঠিক সেই সময় হঠাৎ নদীর ওপারের ঝোপঝাড় ঠেলে বেরিয়ে এল একটা মেয়ে। পিছনের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে হাসছিল সে। তার কিছুক্ষণ পরেই তার মত দেখতেই আরেকটা মেয়ে বেরিয়ে এল সেই জায়গাটা থেকে। তারা দু’জনেই খিলখিল করে হাসছিল। তাদের দেখামাত্র আকেকানে এক ছুটে বাদাম গাছের পেছনে লুকিয়ে পড়ল।

মেয়েদুটো কিছুক্ষণ হাসতে হাসতে এদিক ওদিক হুটোপাটি করে বেড়ালো, কখনো কখনো নদীর থেকে আঁজলা ভরে জল তুলে একজন আরেকজনের গায়ে ছিটিয়ে দিতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে হাঁফিয়ে উঠে দুজন নদীর ধারে বসে পড়ল। প্রথমে তো আকেকানে তাদের দেখে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে ভয়ে কাঁপছিল। তার কাঁপুনিতে গাছের গুঁড়ি আর ডাল ভর্তি পাতাও কাঁপতে লেগেছিল। কিন্তু খানিক বাদে, নতুন ধরণের এই জন্তুগুলোকে তেমন ভয়ঙ্কর না দেখে গুটি গুটি পায়ে গাছের আড়াল থেকে বেড়িয়ে এল আকেকানে। মেয়েদুটোর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়েছিল সে। কুমানকানে ছাড়া আর কোন মানুষ সে কখনো দেখেনি তার জীবদ্দশায়। তাই ভীষণ অবাক হয়ে তাদের দেখছিল আকেকানে। এরা কারা? ঠিক তার মতই দেখতে কিন্তু তবুও কত আলাদা। গলাটা কি অন্যরকম। ইস! কুমানকানে এখানে থাকলে সেও দেখতে পেত এই আশ্চর্য জন্তুদের। তক্ষুণি তার মাথায় একটা বুদ্ধি এল। এদের একটাকে ধরে নিয়ে গেলে হয় না? কুমানকানে ভীষণ অবাক হয়ে যাবে। আর তাছাড়া একা থেকে থেকে তাদের আর ভালো লাগছিল না। আর একজন কেউ এসে থাকলে ভালই লাগবে, আর কাজেও সাহায্য করতে পারবে।

মেয়েদুটো কিছুক্ষণ পরে খাবার খুঁজতে লেগে গেল। একটা মেয়ে ঝোপঝাড়ের পেছনে উধাও হয়ে গেল আর অন্যটা বাদাম গাছটা দেখে সেটার দিকে পা বাড়াল। আকেকানে দেখল এই সুযোগ। এখনই এটাকে নিয়ে কেটে পড়তে হবে। অন্য

জন্তুটা এসে গেলে দু'জনের সাথে আর পেরে উঠবে না সে। জন্তুটা একটু কাছে এগিয়ে আসতেই খপ করে আকেকানে তার হাতটা ধরে ফেলল আকেকানে। ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটা। আকেকানে নিজেও তাতে ভয় পেয়ে গিয়ে বলল, "আমি তোমায় মারব না! তুমি আমার সাথে আমার বাড়িতে চল। আমি আমার ভাইকে দেখাবো যে আমাদের মত আরও জন্তু রয়েছে জঙ্গলে। তুমি ভয় পেয়ো না!" কিন্তু এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েটা হঠাৎ তার অন্য হাতটা একটু নাড়ালো আর ওমনি হুস করে একটা আওয়াজ হল, আকেকানের চোখের সামনে অনেক রঙের একটা খেলা হয়ে গেল। রঙের খেলা শেষ হতে সে হাতের দিকে চেয়ে দেখে কোথায় মেয়ে, সে চেপে ধরে আছে একটা তাগড়া গোখরো সাপকে। সাপটা ফোঁস ফোঁস করতে করতে এক কামড় লাগালো আকেকানের কাঁধে। ঝর ঝর করে রক্ত ঝরতে লাগল সেখান থেকে। আকেকানে সাপটাকে ছেড়ে দিয়ে কাঁধের ক্ষতটাকে চেপে ধরল। কিন্তু রক্ত আর থামে না।

মনে মনে আকেকানে ভাবল, "এ তো দেখছি জাদু জানে। একে ধরতে মুশকিল হবে দেখছি। কিন্তু আমিও ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নই। কুমানকানেকে আমি এই অদ্ভুত জন্তুটাকে দেখাবই!"

সাপটা তাকে কামড়াতে আবার তেড়ে আসছিল তখন সে আবার সেটাকে খপ করে ধরে ফেলল। আবার তার চোখের সামনে রঙের খেলা হতে লাগল আর সাপটা এবার বদলে হয়ে গেল একটা এই মোটা কুমির। কুমিরটা ভয়াল ভাবে তাকে দাঁত মেলে কামড়ে ধরতে যাচ্ছিল। কোনরকমে আকেকানে সেটাকে ঠেলে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু কুমিরটাকে সে ছেড়ে দিল না একেবারে। বেশ কিছুক্ষণ এরকম লড়াইয়ের পর আবার সেই রঙের খেলা ফিরে এল। এবার একটু বেশিক্ষণ চলল খেলাটা। তারপর আকেকানে খেয়াল করল যে এতক্ষণ যে কুমিরটার সাথে তার হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছিল সেটা হাওয়া হয়ে গেছে। এদিক ওদিক তাকিয়ে সে খুঁজতে লাগল সেটাকে। কিন্তু নদীতে বা কোথাও সেটাকে সে দেখতে পেল না। কিন্তু এদিক ওদিক খুঁজতে খুঁজতে বাদাম গাছের মাথায় সে একটা কাসকাস (বাদর জাতীয় জন্তু) দেখতে পেল। আপন মনে বাদাম খাচ্ছিল সে। কিন্তু এক ঝলক দেখেই আকেকানে বুঝতে পারল এটাই সেই জাদু জানা অদ্ভুত জন্তু। গাছের গায়ে তরতর করে উঠে গিয়ে সেটাকে ধরতে গেল। কাসকাসও ছুট লাগালো, কিন্তু এবার সে আর পালাতে পারল না। আকেকানে তার লেজটাকে চেপে ধরল আর টাল

সামলাতে না পেরে কাসকাসকে সঙ্গে নিয়েই গাছ থেকে পড়ে গেল। মাটিতে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল আকেকানে।

কিছুক্ষণ পর জ্ঞান ফিরল আকেকানের। চোখ খুলে দেখে সেই মেয়েটা তার মুখে জল ছেটাচ্ছে। তার বোন তার পাশে দাঁড়িয়ে কৌতূহলী চোখে আকেকানের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সে উঠে বসতেই তারা একযোগে জিজ্ঞেস করল তাকে, "তুমি কে? কোত্থেকে এসেছো? আমাদের ওইরকম বিরক্ত কেন করছিলে বল তো?"

আকেকানে বলল, "আমি আজ পর্যন্ত তোমাদের মত কোন জন্তু এই জঙ্গলে দেখিনি। আমার ভাই কুমানকানেকে দেখাবার জন্যই আমি তোমাদের নিয়ে যেতে চাইছিলাম। কিন্তু তোমরা এত সব অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা করলে!"

মেয়েদুটো তার কথা শুনে খিল খিল করে হেসে উঠল। তারপর বলল, "তোমার একজন ভাই আছে বুঝি? সেও কি তোমার মতই দেখতে? আমরাও আমাদের মত দেখতে কাউকে এই এলাকায় দেখিনি কখনো। আমরা তোমার সাথে তোমার বাড়িতে যেতে পারি। আমাদেরও আর একা থাকতে হবে না আর তোমাদের কাজে সাহায্যও করতে পারব।"

আকেকানে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল, "তোমাদের সাথে আরও কেউ আছে নাকি?"

আকেকানে যে মেয়েটাকে ধরেছিল সেই উত্তর দিল, "না। শুধু আমি আর আমার বোন। তুমি কিন্তু খুব ভালো লড়ো। আমার জাদুকেও হারিয়ে দিলে! আমরা তোমার সাথে যাবো। তাহলে আমাদের আর কোন ভয় থাকবে না।"

আকেকানে হেসে বলল, "ঠিক আছে। আমার ভাই কুমানকানে তোমাদের দেখলে যা অবাক হবে না!"

এই বলে তারা জঙ্গলের পথ ধরে রওনা দিল। সন্ধ্যার আগে আগেই তারা আকেকানের বাঁশের কুঁড়ে ঘরে পৌঁছে গেল। কুমানকানে দরজার সামনে বসে বসে জিরোচ্ছিল। হঠাৎ অচেনা গলায় হাসি ও কথাবার্তার আওয়াজ শুনে চমকে উঠল সে। তারপর দুই বোনকে আসতে দেখে ভয় পেয়ে দৌঁড়ে গিয়ে ঝোপের পেছনে লুকিয়ে পড়ল সে। কিন্তু আকেকানেকে তাদের পিছু পিছু আসতে দেখে তার কৌতূহল হল।

সে আসতে আসতে ঝোপের পিছন থেকে বেড়িয়ে এল। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই সে, আকেকানে ও সেই দুই বোন গল্প করতে লাগল।

তারপর থেকে তাদের ছোট্ট সংসার আরও সুখের হয়ে উঠল। দিনের বেলা মেয়েরা বাড়ির কাজ করত আর দুই ভাই খাবার খুঁজে আনত, আর রাতে একসাথে খাওয়া দাওয়া গল্পসল্প, হাসিঠাট্টা হত। তারপর তাদের ছেলেমেয়ে হল। আর এইরকম ভাবেই গড়ে উঠল গ্রাম, গ্রাম থেকে দেশ, ও দেশ থেকে মানুষ ছড়িয়ে পড়ল সারা পৃথিবী জুড়ে। এইরকমভাবে পৃথিবীতে প্রথম মানুষ এল।

পাপুয়া নিউ গিনির লোককথা।
***উৎসঃ** ক্রিস্টোফার সমারভিল- এর 'সাউথ সি স্টোরিজ'*

ছবিঃ মৌসুমী

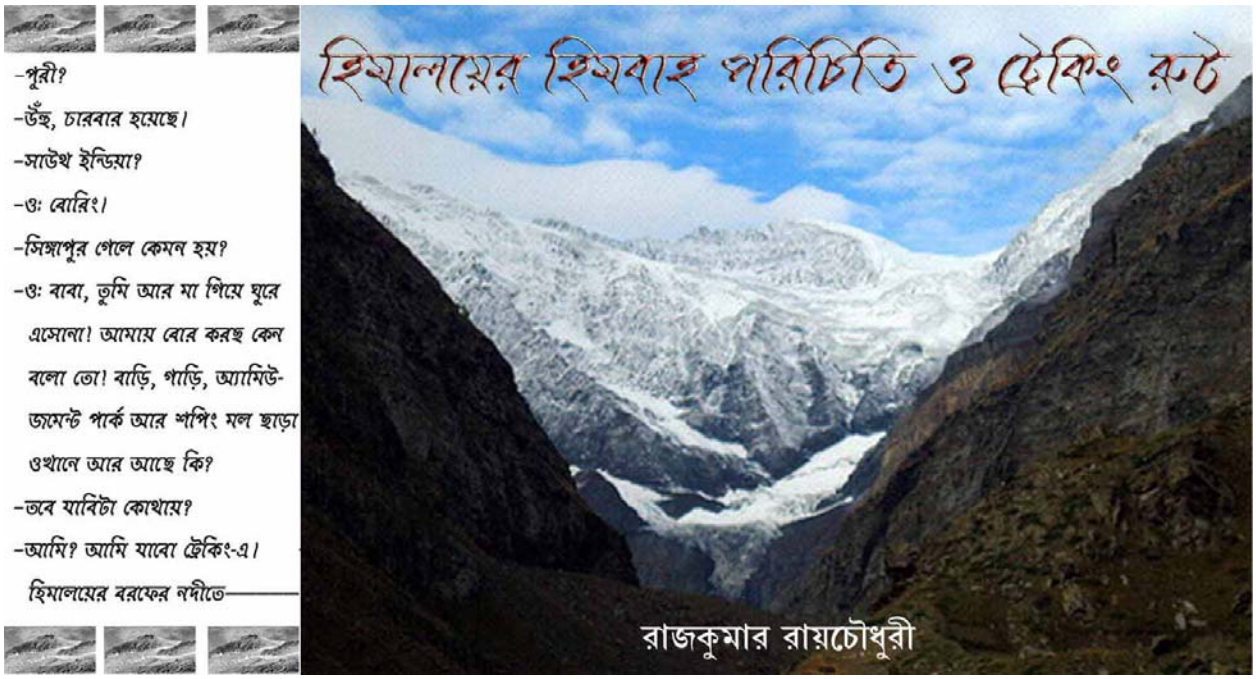

মিলাম হিমবাহঃ-

কুমায়ুন গাড়োয়ান অঞ্চলের দ্বিতীয় বৃহত্তম হিমবাহ হল মিলাম হিমবাহ। গঙ্গোত্রীর পরই এর স্থান। এটি লঙ্গিচুডিনাল হিমবাহ এবং দৈর্ঘ্যে প্রায় ২০ কিমি। নটি উপহিমবাহ মিলামে এসে পড়েছে। এটির অবস্থান প্রায় সমস্ত গোরীগঙ্গা উপত্যকা জুড়ে। এর স্নাউটের উচ্চতা ৩৮৭২ মি। মিলাম হিমবাহের রাস্তা গেছে ত্রিশূল ও হরদেওই এর কাছ দিয়ে। প্রাচীনযুগে এটি তিব্বতের যাবার একটি রাস্তা ছিল। মিলাম গ্রাম হিমালয়ের সর্বোচ্চ গ্রামগুলির মধ্যে একটি। প্রাচীন যুগে তিব্বতের ট্রেড রুটের এটি ছিল শেষ জনবসতি।

ট্রেকিং রুট - বেস ক্যাম্পঃ মুনসিয়ারী

	উচ্চতা (মি)	দূরত্ব (কিমি)	রাস্তা
কাঠগোদাম - মুনসিয়ারী	২২৯০ মি	৩২৫ কিমি	হাঁটা
মুনসিয়ারী - লিলাম	১৮১০ মি	১২ কিমি	হাঁটা
লিলাম - বুগডিয়ার	২৫৬১ মি	১৩ কিমি	হাঁটা
বুগডিয়ার - রিলকোট	৩২০০ মি	১২ কিমি	হাঁটা
রিলকোট - মিলাম গ্রাম	৩৩৪০ মি	১৭ কিমি	হাঁটা
মিলাম গ্রাম - মিলাম হিমবাহ	৩৮৭২ মি	৪ কিমি	হাঁটা

চিত্র ৯ - মিলাম হিমাবাহের ট্রেকিং রুট

কাঠগোদাম থেকে বাসে বা গাড়িতে পিথোরাগড় আসুন। পিথোরাগড়ে একদিন থেকে এর অমূল্য ঐতিহাসিক মন্দিরগুলি দেখতে পারেন। নেপাল ও তিব্বতের মাঝে এই অঞ্চলটি এখনো মানস সরোবরের যাত্রার পথে একটি স্টেশন। পিথোরাগড় থেকে বাস পাবেন মুনসিয়ারী আসার। যদি মুনসিয়ারী থেকে সেলাপানি যাবার বাস বা জিপ পান তবে লিলামে যাওয়ার জন্য কম হাঁটতে হবে। লিলাম অবধি সহজ রাস্তা। লিলামে হবে প্রথম দিনের বিশ্রাম স্থান। পরের দিন কিছুটা উৎরাই এবং বেশির ভাগ চড়াই পথে পৌঁছন বুগডিয়ারে, এখানে থাকতে পারেন। বুগডিয়ার থেকে মোটামুটি ৬৫০ মি চড়াই ভেঙে আসুন রিলকোটে। দু জায়গাতেই ইন্দো-টিবেট বর্ডার পুলিশের এর ক্যাম্প আছে। এখানে ক্যাম্প করতে পারেন। রিলকোট থেকে একদিনে মিলাম গ্রাম যেতে না পারলে মার্তোলী বা বিলজু গ্রামে রাত কাটাতে পারেন। মার্তোলী গ্রামের বাড়িঘর তিব্বতের ধাঁচের। অর্থাৎ একতলায় থাকে গরুছাগল, দোতলায় লোক। যারা মুক্তিনাথ যাবার পথে কাগবেনীতে থেকেছেন তাঁরা এরকম বাড়িঘর দেখেছেন। মার্তোলীতে রাত কাটিয়ে পরদিন পৌঁছবেন মিলাম সাড়ে চার কিমি মত রাস্তা পেরিয়ে। মিলাম গ্রাম থেকে হিমবাহ দেখে একদিনে ফিরে আসা যায় মিলাম গ্রামে। যাঁদের পর্বতারোহণের প্রশিক্ষণ আছে তাঁরা মিলাম হিমবাহ হয়ে উনতাধুরা গিরিপথ (৫৩৭৮ মি) অতিক্রম করে যোশীমঠে পৌঁছতে পরেন। তবে যথেষ্ট দুর্গম এই পথ।

রালাম হিমবাহ

রালাম হিমবাহঃ- মুনসিয়ারী তহসিলের অন্তর্ভুক্ত রালাম হিমবাহের উপত্যকা রালাম উপত্যকা বলে খ্যাত। এই অঞ্চলে তিনটি প্রধান হিমবাহ রালামে এসে মিশেছে। এরা হল রালাম, কালাবান্দ ও সুতেলা। কালাবান্দের দৈর্ঘ্য ১০ কিমি। এ অঞ্চলের আর একটি হিমবাহ হল সংকল্প হিমবাহ। এস এম মাথুরের মতে কালাবান্দ ও ইয়াংবেন (দৈর্ঘ্য ৯ কিমি) মিলিত হয়েছে সংকল্প হিমবাহে। সংকল্প হিমবাহের স্নাউটের উচ্চতা ৪৩০০ মি।

ট্রেকিং রুট - বেস ক্যাম্পঃ মুনসিয়ারী

	উচ্চতা (মি)	দূরত্ব (কিমি)	রাস্তা
কাঠগোদাম - মুনসিয়ারী	২২৯০ মি	৩২৫ কিমি	বাস / গাড়ি
মুনসিয়ারী - লিলাম	১৮১০ মি	১২ কিমি	হাঁটা
লিলাম - বুগডিয়ার	২৫৬১ মি	১৩ কিমি	হাঁটা
বুগডিয়ার - রিলকোট	৩২০০ মি	১২ কিমি	হাঁটা
রিলকোট - মারতোলি	৩৭২০ মি	৬ কিমি	হাঁটা
মারতোলী - সুমদু	৩০৭০ মি	১০ কিমি	হাঁটা
সুমদু - রালামগ্রাম	৩৭০০ মি	১১ কিমি	হাঁটা
রালাম - সপুর্দ্বার	৩০১৫ মি	১৬ কিমি	হাঁটা
সপুর্দ্বার - পাল্টু	২১০০ মি	১০ কিমি	হাঁটা

লিলাম হিমবাহের ট্রেকিং রুট ধরে মারতোলি গ্রাম পর্যন্ত আসুন। মারতোলি থেকে সুমদু

সোজা পথ। গৌরীগঙ্গা গিরিসংকটে নেমে সুমদু গ্রামে তাঁবু খাটান। পরদিন বেশ ভাল চড়াই। সুমদু থেকে গৌরীগঙ্গা গিরিখাতে উচ্চতা (৪৬৬৬ মি) বেশ কষ্ট সাধ্য মনে হবে কিন্তু পথের অসাধারণ নৈসর্গিক দৃশ দেখে মনে হবে এত শ্রম বৃথা যায় নি। খুব কাছ থেকে দেখবেন রাজারমভার তুষার শৃঙ্গ (৬৮৪৫ মি)। এছাড়া রয়েছে চৌধারা, সুতিল্লা এবং আরো অনেক তুষার শৃঙ্গ, আবার পশ্চিমে সমস্ত নন্দাদেবী স্যাংচুয়ারি স্পষ্ট দৃশ্যমান। বিরাট গঙ্গা গিরিখাত থেকে ৫ কিমি উৎরাই পথের পর পড়বে রালাম গ্রাম। বিশ্রাম হবে এখানেই। পরদিন জঙ্গলের মধ্যে চলা। ক্রমাগত উৎরাই এর পথ। ১০ কিমি পরে পাবেন সর্পুদ্বার গুহা। বিশাল এই গুহায় সেদিন রাত্রিবাস। পরের

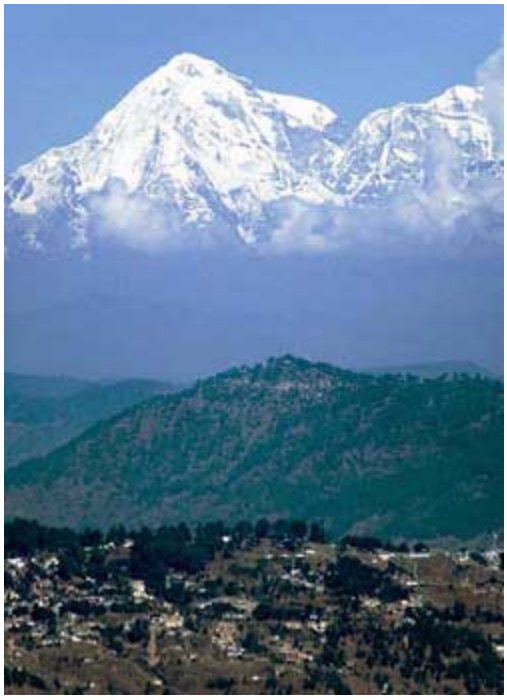

দিন সর্পুদ্বার থেকে পাল্টু চড়াই উৎরাই এর পথ যদিও উৎরাই বেশি। ১০ কিমি চলে পৌঁছন পাল্টু গ্রাম। এখানে তাঁবু খাটান পরেরদিন গৌরীগঙ্গা গিরিখাত ধরে সুরিনগড়ে নেমে আসুন। এরপর চড়াই পথে ডামুর। ডামুর থেকে মুনসিয়ারী বাসে বা জিপে চলে আসতে পারেন। মুনসিয়ারী থেকে মোট দশ দিনের পথ।

পাচু হিমবাহ

পাচু হিমবাহ নন্দাদেবী স্যাংচুয়ারিব অন্তর্গত। মিলাম হিমবাহ অভিযানে যাঁরা যাবেন তাঁরা একই যাত্রায় পাচু হিমবাহ দেখে আসতে পারেন। নন্দাদেবীর উত্তর ঢালে পাচু হিমবাহের অবস্থান।

ট্রেকিং রুট - বেস ক্যাম্প : মুনসিয়ারী

	উচ্চতা (মি)	দূরত্ব (কিমি)	রাস্তা
কাঠগোদাম - মুনসিয়ারী	২২৯০ মি	২৯৬ কিমি	বাস
মুনসিয়ারী - লিলাম	১৮৫০ মি	৭ কিমি	হাঁটা
লিলাম - বুগডিয়ার	৩২০০ মি	১২ কিমি	হাঁটা
রিলকোট - ঘাংঘার	৩৩১৯ মি	১৩ কিমি	হাঁটা
ঘাংঘার - পাচু হিমবাহ	৩৮৮০ মি	৭ কিমি	হাঁটা

মুনসিয়ারী আসার পথে চৌকরীতে একদিন কাটাতে পারেন। চা বাগান ও তুষার শৃঙ্গের নয়নাভিরাম দৃশ্য চৌকরীর মুখ্য আকর্ষণ। মুনসিয়ারী থেকে রিলকোট অবধি পথের জন্য মিলামের ট্রেকিং রুট দেখুন।

রিলকোট থেকে ঘাংগার ১৩ কিমি। এখান থেকে মার্তোলী শৃঙ্গের দৃশ্য দেখে মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই। ঘাংগার একটি প্রাচীন গ্রাম। পুরানো মন্দিরের জন্য খ্যাত। ঘাংগারে একরাত কাটান। পরদিন পাচু হিমবাহের উদ্দেশ্যে রওনা হন। বেশ চড়াই। রডোডেনড্রনও বার্চের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ট্রেকিং রুট। পাচুর স্নাউটের কাছে তাঁবু ফেলুন। এখান থেকে নন্দাদেবী একেবারে হাতের কাছে মনে হবে।

ছবিঃ সংগৃহীত

বিশ্বের জানালা

সুইডেন

উমা ভট্টাচার্য

নিচের ছবিদুটোর মধ্যে প্রথম ছবিটি কীসের বলতো ? অরোরা বরিয়ালিস এর নাম শুনেছ নিশ্চয়ই, সুমেরু বৃত্তের ওপরের দিকের দেশগুলিতে ছমাস ব্যাপী রাতের সময়ে আকাশে আয়নমণ্ডলে বিদ্যুতক্ষরণের ফলে এই আকাশজোড়া আলোর নাচ দেখা যায়। এ হল সুইডেনের আকাশে দেখা যাওয়া অরোরার ছবি। পাশে রয়েছে সুইডেনের মানচিত্র।

সুইডেনের পোশাকি নাম হল “কিংডম অফ সুইডেন”। উত্তর ইউরোপের একবারে শেষ দিকে স্ক্যান্ডিনেভিয়া উপদ্বীপের একটি দেশ। এখানে গরমকালে রাত্রে আকাশে মধ্য রাত্রেও সূর্য দেখা যায়। আবার একে “ভাইকিংদের দেশ”ও বলে, কেননা বিভিন্ন গল্প কাহিনী থেকে জানা যায় জলদস্যু ভাইকিংরা এই স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলি থেকেই বিশাল বিশাল দুইদিকে মুখওয়ালা লম্বা নৌকা নিয়ে পূর্ব পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকের দেশগুলিতে চড়াও হত, কখনও লুঠতরাজ করত, কখনও ব্যবসা করত, আবার নতুন দেশে বসতিও স্থাপন করত।

সুইডেনের পূর্বদিকে আছে বালটিক সাগর ও ফিনল্যান্ড, পশ্চিমদিকে ও উত্তরদিকে আছে নরওয়ে। ৫৫ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ থেকে ৭০ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশের

মধ্যে সুইডেনের অবস্থান। বর্তমানে এখানে গণতান্ত্রিক সরকার আছে আবার রাজাও আছেন। এর রাজধানী স্টকহোম অতি উন্নত সুন্দর শহর। রাজধানী শহরটি জলবেষ্টিত, এখানে প্রতি বছর "জলউৎসব" অনুষ্ঠিত হয়। ৪৪৬,৯৬৪ বর্গ কিঃমিঃ আয়তনবিশিষ্ট সুইডেনের জনসংখ্যা ৯.৪ লাখ ও রাজধানী স্টকহোমের জনসংখ্যা ৭,১১,০০০। উত্তর দক্ষিণে দেশটির দৈর্ঘ্য ১৫৭৫ কিঃমিঃ (প্রায়)ও পুর্ব- পশিচমে মাত্র ৫০০ কিঃমিঃ মত। দেশের অর্থনীতি অতি উন্নত। ২০১০ সালের বিশ্ব অর্থনীতিক ফোরামের হিসেব অনুযায়ী সুইডেন বিশ্বের ২ নম্বর ধনী দেশ ও বিশ্বের ৭ নম্বর সুখী দেশ।

পরিসরে সুইডেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের ৩য় বৃহত্তম দেশ। পুরো সুইডেন ৩টি প্রধান অঞ্চলে বিভক্ত— গোটল্যান্ড, সভিয়াল্যান্ড, ও নরল্যান্ড। অনুপম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, পাহাড়পর্বত , সারাদেশ জুড়ে জালের মত বিস্তৃত অগুণতি নদনদী, অসংখ্য বিশাল আকৃতির হ্রদ,সমুদ্রের তীর ধরে সাজানো অগুণতি দ্বীপ , বিস্তীর্ণ সবুজ বনভুমি ,উপত্যকা নিয়ে এক বৈচিত্রময় সুন্দরী দেশ সুইডেন। ৯৭,৫০০ টি হ্রদই আছে দেশে। পাহাড়গুলি বহু পুরনো, কোটি কোটি বছর ধরে আবহাওয়ার বহু ধকল সয়ে পাহাড়গুলি ক্ষয়ে গেছে, উচ্চতা খুবই কম, খানিকটা গোলাকার, সবগুলিরই মাথা শৃঙ্গবিহীন,সমতল। সর্ব উচ্চ পাহাড়টি ৬৯২৬ ফুট উঁচু। দেশের মোট আয়তনের প্রায় ৫৭% অঞ্চল জুড়ে আছে বনভুমি।

দেশটির পাশ দিয়ে আটলান্টিক মহাসাগরীয় উষ্ণ সমুদ্রস্রোত প্রবাহিত হওয়াতে জলবায়ু মৃদু প্রকৃতির। দক্ষিণ আলাস্কার সঙ্গে একই অক্ষরেখায় অবস্থিত হলেও উষ্ণ সমুদ্রস্রোতের প্রভাবে রাজধানী স্টকহোমের গড় উষ্ণতা জুলাই মাসেও ১৮ ডিগ্রির মত থাকে। পশ্চিম দিকের পাহাড়গুলির কল্যানে মেরু অঞ্চলের তীব্র শুষ্ক, শীতল হাওয়ার হাত থেকে দেশটি বাঁচে। গ্রীষ্ম ও শীত দুটি ঋতুই মনোরম ।

খেলাধুলার মধ্যে প্রধান টেনিস, ট্রেকিং, গলফ, র‍্যাফটিং, নৌকাবাইচ, কায়াক দৌড়, উইন্ড সারফিং, শিকার, মাছধরা প্রধান। সরকার শীত ও গ্রীষ্মকাল জুড়ে সরকার বিনোদনের নানা ব্যবস্থা করে। রাজধানী শহরেই আছে প্রায় ৭০টি মঞ্চ যেখানে সারা বছর জুড়েই নাচ,গান, থিয়েটার, অপেরা, মূকাভিনয় প্রভৃতি নানা বিষয় অনুষ্ঠিত হয়। সারা দেশে প্রায় ৬০ টি মিউজিয়াম ও অসংখ্য আর্ট গ্যালারি আছে। এছাড়াও রয়েছে অনেক বিরাট বিরাট অ্যাকুয়ারিয়াম, চিড়িয়াখানা, সাফারি,ও আমিউজমেন্ট পার্ক।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য কয়েকটি ন্যাশনাল পার্কও আছে উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলে। সেখানে বিস্তীর্ণ অঞ্চল সংরক্ষিত। পর্যটকরা যেতে পারেন কিন্তু শিকার করা বারণ, এছাড়া এসব জায়গায় শিল্প গড়াও বারণ। এই দেশটিতে বহু বিচিত্ররকমের পাখিও আছে।

খাওয়া দাওয়া এদের অতি সাধারণ কিন্তু স্বাস্থ্যকর। মশলাসমৃদ্ধ খাবার এরা খায় না। খাদ্যতালিকায় থাকে নানারকম রুটি, কেউ নিমন্ত্রিত এলে অন্তত সাত রকমের রুটি এরা পরিবেশন করে। মুচমুচে ও নরম রুটি ছাড়াও খাদ্যতালিকায় থাকে দুগ্ধজাত দ্রব্য, বেরি,আঁটিফ্লু(স্টোন ফ্রুট),গোমাংস, শুকরের মাংস, সি-ফুড, মাছ, সেদ্ধ আলু ও ফলের রস । শিল্প ও বাণিজ্যে এরা খুবই এগিয়ে আছে। এত কম লোকসংখ্যা নিয়েও সুইডেন বিশ্ববাণিজ্য ক্ষেত্রে ২%- এর বেশি ব্যবসা করছে। ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের পর থেকে

এরা ভোগ্যসামগ্রী আমদানির পরিবর্তে রপ্তানি বাড়িয়েছে। ২০১০ সালের হিসাব অনুযায়ী এদের মাথাপিছু জাতীয় উৎপাদন ৩৯,১০০ ডলার। এর থেকে প্রমাণ হয় কত সমৃদ্ধ এই দেশটি।

সুইডেনের বর্তমান রাজা ও রানি

সুইডেনে রাজাও আছেন, আবার পার্লামেন্টও আছে। বর্তমান রাজার নাম ষোড়শ গুস্তাভ, যিনি ১৯৭৩ সালে বংশের উত্তরাধিকারী হিসাবে সিংহাসনে বসেন। এই রাজবংশ ১৯১৮ সাল থেকে এদেশে রাজত্ব করছে। রাজা হচ্ছেন "হেড অফ দি স্টেট"। এদের পার্লামেন্টের নাম "রিক্সডগ", রাজধানী স্টকহোমে অবস্থিত। ৩৪০ জন এম.পি আছেন, আর আছেন প্রধানমন্ত্রী , যিনি "স্টেট মিনিস্টার" নামে পরিচিত। ১৮ বছরে পৌঁছান সকল নাগরিকই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারে। মিউনিসিপ্যালিটিগুলি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বিদ্যালয়, অগ্নিনিরোধক ব্যবস্থা, জলের ব্যবস্থা, নিকাশী ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট ও বিদ্যুৎ- এর বিষয়গুলি দেখাশুনা করে।

দেশের ৮৮% মানুষ লুথেরান চার্চ বা জাতীয় গির্জার অধীন। ১৫২০ সালের আগে সুইডেনের মানুষ ছিল রোমান ক্যাথলিক । মার্টিন লুথারের ধর্ম সংস্কারের পর এখন এরা প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মাবলম্বী। সুইডেনে বড়দিন উৎসব পালিত হয় ক্রিসমাস ডে- র দিন সন্ধ্যায়। সান্তাক্লজ নিজে বাড়িতে এসে শিশুদের হাতে উপহার দিয়ে যায়, সান্তা রূপকথার গল্পের মত ঘরের ধোঁয়া বেড়োবার চিমনি দিয়ে ঢোকেনা, সরাসরি সদর দরজা দিয়েই উপহার নিয়ে আসে। এদের আর এক সুন্দর উৎসব হল "সান্তা লুসিয়া", যেটি ১৩ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। এর অর্থ "একটি আলোক উৎস থেকে আলোকের বিকিরণ"। সঙ্গে এই উৎসবের একটি ছবি দেখ। এটি একটি মৌলিক সুইডিশ উৎসব, এই উৎসব

গোঠেনবার্গ (সুইডেন একটি পুরনো শহর) থেকে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। একজন শক্তসমর্থ স্ত্রীলোক দুধসাদা পোশাক পরে মাথায় করে "আলোকবর্তিকা" বয়ে নিয়ে চলে, দেখে মনে হয় তাঁর মাথার চারপাশে "জ্যোতির ছটা",ঠিক শিশু যিশুর মত। আজকাল এই উৎসব স্কুলে, নার্সারি স্কুলে ও মেয়েদের অনেক কাজের জায়গায় পালন করা হয়। সকলের মধ্যে খাবার ও পানীয় বিতরণ করা হয়। এই উৎসব গিনেস বুকেও স্থান করে নিয়েছে।

সুইডেনেও আমাদের মত ২৪ ঘণ্টাতেই দিন,তবে এরা দুপুর বারোটা বা রাত বারোটা র পরের সময় বোঝাতে এরা এ.এম বা পি. এম ব্যবহার করেনা, এরা আমদের দেশের রেলের টাইম টেবিলের মত দিনের ১২ টাকে বলে ১২টা এর পরের সময়গুলোকে বলে ১৩টা , ১৪টা, ১৫টা ইত্যাদি।

একটা মজার ব্যাপার হল এরাও আমাদের—বাঙালিদের মতই ঠাকুমা, দিদিমা এদের বোঝাতে আলাদা শব্দ ব্যবহার করে, ইংরেজদের মত গ্র্যান্ডফাদার, গ্র্যান্ডমাদার বলে সবাইকে বোঝায় না। বাবাকে বলে 'ফার', মাকে বলে 'মোর', ঠাকুরদাকে বলে 'ফারফার', ঠাকুমাকে বলে 'ফারমোর', আর দাদামশায় কে বলে 'মোরফার', দিদিমাকে বলে 'মোরমোর' ।

এক আশ্চর্য দৃশ্য যা সুইডেনে দেখা যায় তা হল 'মধ্যরাতের সূর্য', আর 'অরোরা বোরিয়ালিস' যার কথা আগেই বলেছি। এ ছাড়া সুইডেন আবার দুর্ধর্ষ 'ভাইকিং'-দের দেশ বলে খ্যাত। আসলে এরা ছিল উত্তর মেরু অঞ্চল ও তার নিকটস্থ স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশের কিছু অভিযাত্রী, যোদ্ধা, বণিক, আবার কিছু দস্যু যারা নতুন

থাকার জায়গা ও সমৃদ্ধির খোঁজে পাল তোলা লম্বা লম্বা নৌকা নিয়ে জলপথে দেশে দেশে পাড়ি জমাত, কেউ বা বসতি স্থাপন করত, কেউ বা ব্যবসা বিস্তার করত, কেউ বা বিদেশে কোনও রাজার অধীনে যোদ্ধার কাজও করত। তাবে বেশির ভাগই লুটতরাজ ও অত্যাচার করত ।খ্রিষ্টিয় ৮ম থেকে ১১শ শতাব্দি অবধি এরা ইউরোপ, এশিয়া উত্তর আতলান্তিকের দ্বীপপুঞ্জগুলিতে দাপিয়ে বেড়াত। তারপর ক্রমে এরা বসতি স্থাপন করে থিতু হয় । সঙ্গে ভাইকিং যোদ্ধা ও তাদের নৌকার ছবি দিলাম।

আরও কিছু কথা—*আবিষ্কারের দুনিয়াতেও সুইডেন অনেকটাই এগিয়ে । নোবেল পুরস্কারের প্রবর্তক স্যার আলফ্রেড নোবেল এই দেশেরই লোক। তিনি ছিলেন একাধারে কেমিস্ট, ইঞ্জিনিয়ার,ও আবিষ্কারক—তিনি ডিনামাইট আবিষ্কার করেন। এছাড়াও এদেশেই আবিষ্কার হয়েছে টেট্রাপ্যাক, বলবিয়ারিং, প্রপেলার,জিপার, সেফটি ম্যাচ ও টার্বোইঞ্জিন।*

ছবিঃ সংগৃহীত

সেই মেয়েরা

সেলমা লেগারলফ

উমা ভট্টাচার্য

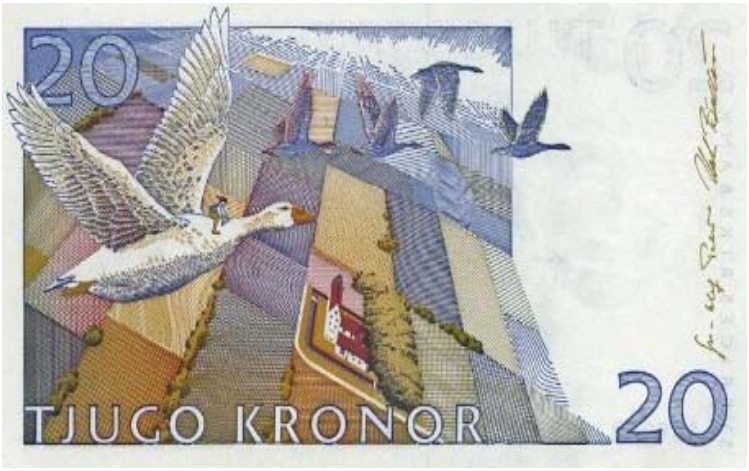

ওপরের ছবি দুটি দেখ। দু নম্বর ছবিটিতে যাঁকে দেখা যাচ্ছে তিনি হলেন বিশ্বের প্রথম মহিলা সাহিত্যিক যিনি সাহিত্যে নোবেল পুরষ্কার পান ১৯০৯ সালে, এবং তাঁর দেশ সুইডেনের তিনিই প্রথম নোবেল পুরষ্কার প্রাপক। আর অন্য ছবিটি হল সুইডেনে প্রচলিত ২০ ক্রোনারের একটি নোট, যেটির একপিঠে আছে তাঁর লেখা এক মজাদার রূপকথার তাঁর নিজের আঁকা চিত্ররূপ, যেখানে দেখা যাচ্ছে নীচে গ্রামের দৃশ্য আর উপরে আকাশ পথে কিছু রাজহাঁস উড়ে চলেছে, যাদের একটির পিঠে বসে আছে বামনের মত আকারের একটি ছেলে । এই বিখ্যাত সাহিত্যিক হলেন সুইডেনের সেলমা লেগারলফ। নোটটির অপর পিঠেও আছে তাঁরই ছবি।সুইডেনের সরকার তাঁর এই বিখ্যাত লেখাটির চিত্ররূপ ও তাঁর ছবি দুটোই তাঁদের দেশের কাগজি মুদ্রায় ছাপিয়ে তাঁকে সম্মানিত করেছেন। তাঁর বিখ্যাত এই শিশু রূপকথাটির নাম হল “দি ওয়ান্ডারফুল অ্যাডভেঞ্চারস অফ নীলস”। ১৯৮০ সালে এই গল্পটি অবলম্বনে একটি অনুপম অ্যানিমেশন টেলিভিশন সিরিজ তৈরি হয়েছিল। সঙ্গে তার ছবি দিলাম।

সেলমা লেগারলফ ১৮৫৮ সালে সুইডেনের ভার্মাল্যান্ডের মারবাক্কা নামে একটি ছোট্ট শহরে জন্মগ্রহণ করেন। বড় হয়ে ওঠেন বাবা ও ঠাকুমার কাছে। ঠাকুমার মুখে শোনা রূপকথা, স্থানীয় লোককথা, দেশের ইতিহাস,পুরানের কাহিনী শুনতে শুনতে বড় হয়ে ওঠা সেলমার মনে এক কল্পনার জগত আপনিই তৈরি হয়ে যায়, যার প্রকাশ হতে থাকে তাঁর বিভিন্ন লেখায়। তাঁর লেখার মধ্যে ফুটে ওঠে দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা ,দেশের ভূগোল ও ইতিহাসের কথা-- সবই রূপকথার মোড়কে, সরল , সহজ ও চিত্তাকর্ষক ভাবে। তাঁর বিচিত্র রকমের মজাদার লেখার জন্য ১৯০৯ সালে নোবেল পুরষ্কারে ভূষিত হবার পর ১৯১১ সালে তিনি বিখ্যাত সুইডিশ অ্যাকাডেমির কর্মসমিতিতে নির্বাচিত হন, যা এক বিশেষ সম্মান , কারণ তিনিই প্রথম মহিলা যিনি এই সম্মানের অধিকারী হন।

“দি ওয়ান্ডারফুল অ্যাডভেঞ্চার অফ নিলস’’ রূপকথার মোড়কে লেখা নিলস হোলগারসনস নামে সুইডেনের এক গ্রামের চাষির ছেলের দুষ্টুমি, ও এক দুর্দান্ত

অ্যাডভেঞ্চারের গল্প। চাষির ছেলে নিলস ছিল খুব দুষ্টু। সে ছিল পশুপাখি, মানুষ সকলের প্রতি নিষ্ঠুর নির্দয়, আলসে,পড়াশোনায় অমনোযোগী, স্বার্থপর একটি ছেলে।

তার নিষ্ঠুরতার জন্য এক অপদেবতা তাকে খর্বাকৃতি করে বুড়ো আঙুলের মত ছোট করে দেয় । তখন মনের দুঃখে একা একা ঘুরতে ঘুরতে সকলের চোখের আড়ালে সে নিজেদের খামার বাড়িতে চলে আসে। সেখানে সে দেখতে পেল তাদের খামারের খোঁড়া রাজহাঁসটিকে, যাকে সে আনেক সময়ই নানা অছিলায় বিরক্ত করেও মজা পেত। সে দেখল হাঁস 'আক্কা' তখন অনেক বুনো ও পরিযায়ী পাখিদের সঙ্গে দেশের সুদুর উত্তরে ল্যাপল্যান্ডের দিকে উড়ে যাবার তোড়জোড় করছে, বামন হয়ে গিয়ে সে তখন পশুপাখির ভাষা বুঝতে পারছিল। যেই না হাঁসের মতলব বুঝতে পারা অমনি নিলস এক লাফে হাঁসের পিঠে লাফিয়ে উঠে বসল। আর অমনি পাখির দলের সাথে "আক্কা" নামের হাঁসটি উড়তে শুরু করল। বুনো পরিযায়ী পাখির দলের সঙ্গে নিলসও উড়তে লাগল হাঁসের পিঠে চড়ে। যেতে যেতে কত গ্রাম, ফসলভরা জমি, সবুজ প্রান্তর, বনভূমি, নদনদী, হ্রদ, নদীর চর, উত্তরের সাগরের তীর, পাহাড়পর্বত, লোকালয়, মানুষজন, তাদের বিচিত্র জীবনযাত্রা, আকাশ থেকে দেখতে দেখতে চলল। কত জায়গা সে দেখল তার হিসেব নেই, মাঝে মাঝে খাবার

সংগ্রহ করতে ও রাত কাটাতে তাদের থামতে হচ্ছিল। তখন তারা মাটিতে নেমে আসছিল। মাটিতে নেমে কখন কখনও তারা বিপদেও পড়ছিল। কখনও সে বিপদে পড়লে পাখিরা তাকে সাহায্য করছিলো, কখনও পাখিরা তাকে বিপদের সম্ভাবনায় আগাম সতর্ক করছিল। আস্তে আস্তে সে পাখিদেরও সাহায্য করতে লাগলো , উপর থেকে দেশকে দেখে তার ভালো লাগতে লাগল। সেইসব মুহূর্তগুলো পাখির দলের

মধ্যে কাটাতে কাটাতে নিলস ধীরে ধীরে স্বার্থপরতা ভুলতে লাগল, দুষ্টুমি ভুলে শান্ত হতে শুরু করল, দায়িত্বশীল হয়ে উঠল, মানুষ, পশুপাখি সবাইকে ভালবাসতে শিখল, সর্বোপরি প্রকৃতিকে ভালবাসতে শিখল। দুষ্টু নীলস শান্ত, ভালো ছেলে হয়ে উঠল।

গল্পটি পড়ে তোমাদের বাংলায় লেখা অবনীন্দ্রনাথের " বুড়ো আংলা" আর সেই গল্পের নায়ক হৃদয়ের কথা মনে পড়ছে কি! নিলসের গল্পে লেখিকা শিশুশিক্ষার উপযোগী করে দেশের ভূমিরূপ, জনজীবন ,ভূগোল, ইতিহাস সবই রূপকথার মোড়কে মজাদার ভাবে পরিবেশন করেছেন ।

১৯০১ সালে "সুইডিশ জাতীয় শিক্ষক সংগঠন" দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের মধ্যে জাতীয় ইতিহাস ও ভূগোল বিষয়ে উৎসাহ জাগাবার জন্য তাঁকে একটি বই লিখতে বলে। তারপর তিনি প্রায় সারা দেশ ঘুরে বেড়ান ও বই লেখার রসদ যোগাড় করতে শুরু করেন। তার ফলে লেখা হয় এই মূল্যবান বইটি। ১৯০৬ সালে বইটি ছাপা হয়। পৃথিবীর বহু ভাষায় অনুদিত হয়েছে এই বইটি। ১৯০৯ সালে নোবেল পুরষ্কার পান সেলমা। আর ১৯১৪ সালে নিজেই বসেন সুইডিশ নোবেল আকাদেমির (এই সংস্থা নোবেল পুরষ্কার দেয়) সদস্যপদে।

এছাড়াও তিনি আরও অনেক বই লিখেছেন। সব বইয়েই আছে তাঁর দেশের কথা, দেশের মানুষের কথা, চাষিদের কথা, মানুষের কষ্টের কথা, মানুষের অন্ধ বিশ্বাসের কথা। দেশকে নিয়েই তাঁর সব চিন্তা। শুধু বইয়ে এসব লিখেই তিনি কাজ শেষ করেননি। দেশের কাজেও অংশ নিয়েছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি শান্তিবাদির ভুমিকা নিয়েছিলেন। বিভিন্ন সময়ে শান্তির পক্ষে, মহিলাদের বিভিন্ন সুযোগসুবিধা ও অধিকার আদায়ের পক্ষে আন্দোলন করেছেন। ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি একজন সক্রিয় দেশপ্রেমীর মত কাজ করে যান। তিনি নাৎসি জার্মানির কাজের বিরুদ্ধে , নিজের বিপদ বুঝেও শান্তিকামী মানুষদের সাহায্য করতে থাকেন। নিজ দেশ সুইডেনের ভিসা যোগাড় করে জার্মানিতে বিপদগ্রস্ত জার্মান বুদ্ধিজীবী ও শিল্পীদের কনসেনট্রেশন ক্যাম্প থেকে গোপনে মুক্ত করে জার্মানি থেকে পালিয়ে নিরাপদ স্থানে যেতে সাহায্য করেন। এছাড়াও ১৯৩৯ সালে রাশিয়া, সুইডেনের প্রতিবেশী দেশ ফিনল্যান্ড আক্রমণ করলে এই আক্রমণের প্রতিবাদ করেন জোরালো ভাষায়। সেইসঙ্গে ফিনল্যান্ড কে আর্থিক সাহায্য দানের জন্য নিজের নোবেল পুরষ্কারের সোনার পদকটি ফিনল্যান্ড কে দান করেন।

মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণের ফলে কয়েকদিন অসুস্থ থাকার পর ১৯৪০ সালের ১৬ ই মার্চ এই মহীয়সীর জীবনাবসান হয়। তাঁর অন্যান্য লেখা তোমরা বড় হয়ে পড়বে নিশ্চয়ই, তবে নীলসের অ্যাডভেঞ্চারের গল্পটি তোমরা পড়ে নিও। বইটি ভেল্মা হাওয়ার্ড ইংরাজিতে অনুবাদ করেন ও ১৯৪৭ সালে “প্যান্থিওন বুকস” বইটি প্রকাশ করে।

আমাদের বাংলাদেশের “বুড়ো আংলা’’ হৃদয়ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৃষ্টি নিলস- এর মতই দুঃসাহসী এক দুষ্টু ছেলের গল্প।

রিদয়- এর হাঁসটি ছিল বাংলাদেশের ঘরোয়া দেবী "সুবচনী"- র খোঁড়া হাঁস, যে হাঁসটি হৃদয়ের মা সুবচনীর ব্রত করতে পুষেছিলেন। এই হাঁসের পিঠে চড়েই আমাদের রিদয় আকাশপথে সারা বাংলাদেশ ভ্রমণ করতে করতে আলুবাড়ি ,বাখরগঞ্জ, পাবনা, ঢাকা, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি,আসাম,টুং- সোনাদা- ঘুম,খাসিয়া- গারো জয়ন্তিয়া পাহাড়, যোগী- গোফা,সব পার হয়ে চলে গেছে মানস সরোবরের দিকে। এই আকাশভ্রমণ করতে গিয়েই সে দেখেছে সুজলা, সুফলা বাংলাদেশকে, আর পথে ধবলগিরির রক(পাথর)এর উপর বসে রামছাগল,ভালুক, শেয়াল আর পাখিদের শুনিয়েছে মার কাছে শোনা বিশ্বকর্মার পৃথিবী গড়ার গল্প, ইন্দ্র- শিব সতীর উপাখ্যান।

এই ভ্রমণ করতে করতেই রিদয়ের হৃদয় পাল্টেছে। সে ভালো ছেলে হয়ে গেছে। অবনীন্দ্রনাথ এই গল্পটা লিখেছিলেন লেগারলফের লেখা শিশুকাহিনীটির আদলে। ১৯৪২ সালে বইটির প্রথম মুদ্রণে লেখা ছিল যে অবনীন্দ্রনাথ সেলমা লেগারলফ এর লেখা নিলস এর গল্পটি থেকে প্রেরণা পেয়েছিলেন। তবে 'বুড়ো আংলা' তিনি লিখেছিলেন সম্পূর্ণ নিজের কল্পনার রঙে। দুটি বইই দেশকে জানার মত করে লেখা ভ্রমণকাহিনী ,এবং যে সে ভাবে ভ্রমণ নয়, হাঁসের পিঠে চেপে একেবারে আকাশপথে ঘোরাফেরা! নীলসের গল্পে পাই সুইডেনের বিবরণ আর বুড়ো- আংলায় পাই আমাদের চিরসবুজ, নদীনালা, বনগিরিপর্বত সমন্বিত বিচিত্র এই বাংলাদেশের বর্ণনা। পাই বাংলার বিচিত্র পাখিদের কথা, গ্রামীণ লোকালয়ের বর্ণনা, গাছপালার বর্ণনা, পূজাপার্বণের কথা,দেবদেবীদের কথা, বাংলার প্রচলিত ছড়া পাঁচালিও পাই, আর পাই আকাশ থেকে বিশাল দাবার ছকের (হৃদয়ের কথায় রাবণের দাবার ছক) মত দেখতে দিগন্তবিস্তৃত ক্ষেতখামারের বর্ণনা, যা একেবারেই আমাদের নিজস্ব। অবনীন্দ্রনাথের লেখা এই ভাষাচিত্রে বাংলাদেশের যে বর্ণনা পাই কোথাও এর তুলনা মেলা ভার।

লেখার শেষে একটা মজার খবর দিইঃ

আকাশ পথে দেশভ্রমণ এর কাহিনী আমাদের দেশেই প্রথম লেখা হয়েছিল, আজ থেকে প্রায় ১৫০০ বছর আগে ,আর এক মহাকবির কল্পনার রঙে। তিনি হলেন মহাকবি কালিদাস, যিনি তাঁর "মেঘদূত" কাব্যগ্রন্থে মৌসুমি মেঘকে দূত করে পাঠিয়েছিলেন। মেঘকে তিনি যাত্রাপথের রাস্তাঘাট, নদী পর্বত, পথের দৃশ্যাবলীর যে বর্ণনা দিয়ে পথ চিনিয়েছিলেন , মেঘ ভ্রমণ পথে যা দেখেছিল সেই সবকিছুর বিবরণ থেকে এই মধ্য ও পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের নিখুঁত বর্ণনা ও ভৌগলিক বিবরণ পাওয়া যায়। আশ্চর্য ব্যাপার, তাই নয়? কারণ লেগারলফ কিংবা অবনীন্দ্রনাথ তো এরোপ্লেনের যুগের মানুষ। কিন্তু কালিদাস আকাশ থেকে দেখা পৃথিবীর বিবরণ লিখেছিলেন দেড় হাজার বছর আগে। কেমন করে? কে জানে! পৃথিবীতে তো কতই রহস্যময় ব্যাপার আছে। এ- ও সেই রকম এক রহস্যের কথা।

ছবিঃ সংগৃহীত।